চারুচন্দ্র

(উপন্যাস ।)

শ্রীবিধুভূষণ বসু প্রণীত ।

১২৯ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীনলিনীন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা

প্রকাশিত ।

কলিকাতা,

নং ভীমঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন প্রেস হইতে

ইউ, সি বসু এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত ।

১৩০৭ সাল ।

(রাজসংস্করণ) মূল্য ১৷০ ।] [মূল্য ১৲ এক টাকা ।

উৎসর্গ।

মম

চিরানুকূল

সোদর প্রতিম

বন্ধু

শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের

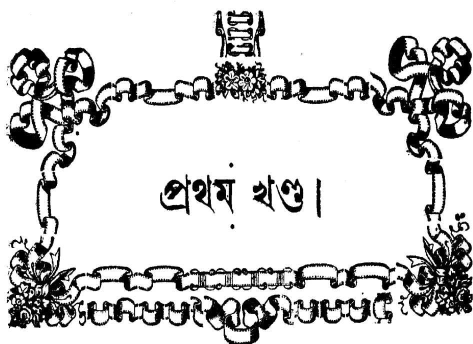
করকমলে

গ্রন্থখানি

সাদরে উৎসর্গীকৃত

হইল।

গ্রন্থকার।


প্রথম খণ্ড।

উপক্রমণিকা।

নির্ম্মলজ্যোৎস্নাময়ী শারদীয়া রজনীতে, বৃক্ষ লতা পরিবেষ্টিত সুশোভিত প্রমোদোদ্যানে, স্বচ্ছ-সরোবর-তীরে প্রফুল্ল-মূর্ত্তি দুইটী স্ত্রী পুরুষ পরস্পর প্রেমালাপ করিতেছিল। স্ত্রীটী বালিকা, বয়স চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক হইবে না। পুরুষটী বিংশতি বর্ষীয় যুবক। যুবক বাম বাহু দ্বারা প্রেয়সীকণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। রমণীও স্বামীর বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদিয়া অতি কষ্টে হাস্যসংবরণ করিতেছিল। যুবক হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেখদেখি, ঐ কামিনীগাছটী ফুল-ভূষণে কেমন সাজিয়াছে! তুমিও তোমার অলঙ্কারগুলি পরিলে ঐরূপ সুন্দর হইতে!"

রমণী বলিল, "আমি অমন সুন্দর হইতে চাহি না। কামিনী-গাছফুল সাজে সাজিলেই হাজার হাজার ভ্রমর উড়িয়া তার উপর বাসা করে। আমিত ভ্রমরের পাল ভুলাইতে চাহি না; গয়না পরিব কেন?

যুবক। ভ্রমরের পাল ভুলাইতে না চাও একটী ভ্রমরকেত ভুলাইতে চাও।

স্ত্রী। সেটীত আপনিই ভুলিয়া আছে। গয়নার দরকার কি।

পুরুষ। তুমি গয়না পরিলে আমি বড় সুখী হই। তুমি একদিনও পরনা কেন?

স্ত্রী। আমি পরিব না। গয়না পরিতে আমার লজ্জা করে।

পুরুষ। তবে ওগুলি রাখিয়া কি হইবে? তোমার সতীন হইলে তাকে দিও।

স্ত্রী। সতীন! সতীনের মুখেত মুড় দিতে হয়! তা আমি গয়না দিব? আচ্ছা তা দিব। আগে সতীন হ'ক। কবে হবে? রম্ভা না তিলোত্তমা?

পুরুষ। আচ্ছা! তুমি গয়নাগুলি রাখিয়া কি করিবে, পরিবে নাত?

স্ত্রী। আমার ছেলে হ'লে বিয়ে দিয়ে বউ আনিব। তাকে পরাইয়া দেখিব।

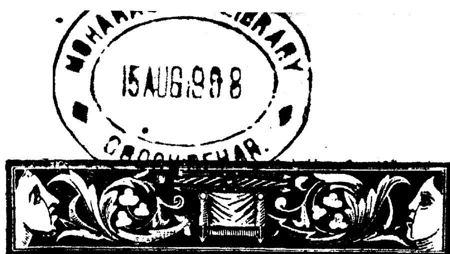
এই বলিয়া বালিকা হাসিয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল। মুখ ঢাকিয়াও হাসিতে লাগিল; হাসি আর থামাইতে পারে না,—যেন বড় রহস্যের কথা বলিয়াছে।

যুবক জোর করিয়া পত্নীর মুখখানি তুলিয়া চুম্বন করিল। বালিকা তাহার হাত ছাড়াইয়া দৌড়িয়া কিছু দূরে গেল।

সরোবরে তীরের কাছে একটী কুমুদ ফুটিয়াছিল। যুবক হাত বাড়াইয়া সেইটী তুলিতে গেল। অমনি বালিকা ছুটিয়া আসিয়া হাত ধরিয়া বলিল, "ছি ছি! নিষ্ঠুর কর কি? দেখনা উপরে চন্দ্র কেমন আনন্দে হাসিতেছে। এমন সময় কুমুদটী তুলিয়া লইলে তার কি দশা হইবে?"

আবার যুবক বালিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বনের পর চুম্বন করিল। বালিকা চক্ষু বুজিয়া আবার স্বামীর কোলে অবশ ভাবে পড়িয়া রহিল।

পুরুষের নাম চারুচন্দ্র; স্ত্রীলোকটীর নাম প্রভাবতী, ইহারা যে গ্রামে বাসকরে, তাহার নাম দেবগ্রাম। ইহারা প্রায় প্রত্যহই ইহাদের উদ্যানে বসিয়া এমন আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে।



চারুচন্দ্র ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার চারি বৎসর পরে একদিন অতি প্রত্যূষে চারুচন্দ্র রায় তাঁহার বৈঠকখানায় নীরবে উপবিষ্ট আছেন। পার্শ্বে গড়গড়ার উপর সুগন্ধি তামাকু প্রস্তুত রহিয়াছে ; চারুচন্দ্রের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই ; গম্ভীরবদনে যেন কি চিন্তা করিতেছিলেন। কতক্ষণ পরে ভৃত্য রামকৃষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার এত যত্নের সাজা তামাক অনর্থক পুড়িয়া যাইতেছে ; বাবু তাহাতে মনোযোগ করিতেছেন না। বুঝি এখনও তাঁহার ঘুমের ঝিম আছে। তাই রামকৃষ্ণ বাবুর চৈতন্য সম্পাদন জন্য ডাকিয়া বলিল, "বাবু! তামাক সাজা, দেখ্‌তে পাও নাই ?"

চারুবাবুর যেন ঘুম ভাঙ্গিল ; ব্যস্ত হইয়া গড়গড়ার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "হাঁ, তামাক এনেছ, রামাখুড়ো" ?

রামকৃষ্ণ চারুবাবুর পিতার আমলের চাকর, তাঁহার পিতার বয়সী লোক! চারুবাবুকে সে শৈশব হইতে কোলে পিঠে করিয়া প্রতিপালন করিয়াছে। চারুচন্দ্র কর্ত্তা হইলেও রামকৃষ্ণকে বিশেষ সম্মান করেন; তাহাকে "রামাখুড়া" বলিয়া ডাকেন। বালককালে চারুচন্দ্রের পিতার মৃত্যু হইয়াছে; এ যাবৎ রামকৃষ্ণ সমস্ত বিষয় কর্ম্ম আপন কার্য্যের ন্যায় দেখিয়া শুনিয়া করিতেছে। চারুচন্দ্রকে সে পুত্রাধিক ভালবাসিত। এখনও সে পিতার ন্যায় চারুচন্দ্রের অনেক আব্দার কুলাইয়া থাকে। আজ কদিন ধরিয়া সে চারুবাবুর একটু একটু ভাবান্তর দেখিয়া আসিতেছে; কারণ কিছু বুঝিতে পারিতেছে না। রামকৃষ্ণ বিশেষ স্নেহের সহিত বলিল, "বাবা! আজ কদিন তুমি কেমন হইয়াছ; সকল সময়েই তোমাকে অন্যমনস্ক দেখি কেন?"

চারুচন্দ্র তামাক টানিতে টানিতে গম্ভীরস্বরে বলিলেন "চিরদিন কারও সমান যায় না, রামাখুড়ো।"

রাম। একথা কেন? তোমার এমন কি অসুখ হইল যে, তুমি এমন কথা বল্‌ছো?

চারুবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আলবোলার নল ত্যাগ করিলেন। পরে রামকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "এতদিন আমি কোনও অসুখ ভোগ করি নাই। সুখ-দুঃখ বোধ-শক্তি আমার এতদিন ছিল না। কিন্তু এখন আর সুখ ভোগ করিবার সময় আমার নাই। আমি বংশের কুলাঙ্গার জন্মিয়াছি। আমা হইতে পিতৃ-পিতামহের গৌরব নষ্ট হইল। আমার এই বাড়ীতে, দেল, দোল, দুর্গোৎসব, ব্রত, নিয়ম, কত কি হইয়াছে; আমার পিতা পিতামহের অন্নে কত অনাথ

অন্যথার জীবনরক্ষা হইয়াছে। কিন্তু দুদিন পরে আমারি অন্নের পথ বন্ধ হইবে। দেবেন্দ্র চৌধুরী নালিশ করিয়াছে; বিষয় সম্পত্তি রক্ষার আর উপায় কি? অন্যান্য মহাজনেরাও এখন আর বিলম্ব করিবে না। করিবেই বা কেন? আমি কি দেখাইয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া রাখিব? এত ঋণ পরিশোধ করিব, এরূপ ক্ষমতা আমার কোথায়? বাৎসরিক যাহা আয়, তাহাতে সংসার খরচ বাদে সমস্ত সুদও পোষায় না। এখন দেখিতেছি, মাথা রাখিবার স্থানও রহিল না।

চারুবাবুর কথায় রামকৃষ্ণ অন্তরে বেদনা পাইল। সে এতদিন চারুচন্দ্রকে নিতান্ত বালক ভাবিয়া আসিতেছে। তাহার ধারণায়, চারুচন্দ্রের বিষয় কর্ম্ম দেখিবার বয়স এখনও হয় নাই। চারুচন্দ্রও এতদিন ওসব কথার আলোচনা কখনও করেন নাই। এপর্য্যন্ত তিনি খেলিয়া বেড়াইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়াই সময় কাটাইয়াছেন। আজ তাঁহার কথাগুলি শুনিয়া রামকৃষ্ণ একটু ভাবিল। পরে বলিল, "বাবা! সেজন্য তোমার দুঃখ করার আবশ্যক নাই। তুমি নিজে ঋণ কর নাই; ঋণ তোমার পিতার। অকালে যদি তোমার পিতার কাল না হইত, তবে, অবশ্য, এ ঋণ থাকিত না। এখন সে জন্য চিন্তা করিয়া তুমি কি করিবে? একান্ত না হয়, পৈতৃক সম্পত্তির কিছু ছাড়িয়া দিয়া পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিও। সেজন্য এ ছেলে বয়সে এরূপ চিন্তা করিয়া, শরীরটা মাটি করবে কেন?"

চারু। সে এক উপায় বটে, কিন্তু তাহা কি আর কর্ত্তব্য? আমি এখন আর ছেলে মানুষ নই। পিতৃপিতামহের সম্পত্তি বেচিয়া খাইলে লোকে আমাকে কি বলিবে? আর ঋণ পরিশোধ

না হয় করিলাম, পরে জীবনোপায় কিসে হইবে? এবং আমার এরূপভাবে বাটীতে বসিয়া থাকা উচিত নয়। যাহাতে দুপয়সা উপায় করিতে পারি সে চেষ্টা দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার পিতা যে জমিদার বাড়ীতে চাকরী করিতেন, সেখানে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। আমি সেখানে গিয়া চেষ্টা করিলে কোন একটা উপায় হইতে পারে। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার মত কি?

রামকৃষ্ণ একটু মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমার মত? আমার মতে কি আসে যায়?"

চারু। তুমি যদি বাড়ীর সমস্ত ভার লইতে স্বীকার কর, তবে, আমি বিদেশে গিয়া দুই এক বৎসর থাকিয়া আসি। তুমি বাড়ীতে থাকিলে, আমি বাড়ীর বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিব।

রাম। তুমি এখন কোথায় যেতে চাও?

চারু। আপাততঃ কলিকাতায়; সেই জমিদার বাড়ী। "কলিকাতা"! এই কথাটী রামকৃষ্ণ একটু দীর্ঘস্বরে বলিয়া চুপ করিল। তাহার কাছে যেন ভাল লাগিল না। কলিকাতার নাম শুনিয়া তাহার শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল। তাহার ধারণায় কলিকাতা অতি ভয়ানক স্থান; সে স্থানের হাওয়া লাগিলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। অনেক বড় লোক তাঁহাদের পুত্রদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা তাহাদিগকে আর ফিরিয়া পান নাই। অধিকাংশই ধর্ম্মত্যাগ করিয়া সাহেব সাজিয়া মাতাল হইয়াছে, কেহবা মেম্ বিবাহ করিয়াছে। ছেলেকে কলিকাতায় পাঠান অপেক্ষা যমের বাড়ী পাঠান ভাল, রামকৃষ্ণের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। বাস্তবিক

তখনকার কলিকাতা, (বর্ত্তমান সময়ের প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে) বড় ভয়ানক স্থান ছিল। শতবৎসর রাষ্ট্রবিপ্লবের পর ভারত-সাম্রাজ্য একরূপ, শাসন সম্বন্ধে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বদেশেই রাষ্ট্রবিপ্লবের পর ধর্ম্মবিপ্লব দেখা যায়। ভারতে তখন ঘোর ধর্ম্মবিপ্লব চলিতেছিল। রাজ-সাহায্য প্রাপ্ত মিশনরীগণ তখন ভারতের তেত্রিশকোটি দেবতার উচ্ছেদ সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; আর্যাভূমি ভারতবর্ষ যখন খৃষ্ট-সেবক শ্বেতাঙ্গের পদানত, তখন ভারত সন্তানগণ খৃষ্টের পদানত হইবে না কেন? এই ধারণায় তাহারা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া প্রতারণা, প্রলোভন, অপহরণ প্রভৃতি কোন অপকর্ম্ম করিতে পরাঙ্মুখ ছিল না। অন্যদিকে কয়জন মহামনস্বী ভারত-সন্তান হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারার্থ বদ্ধপরিকর। এই ঘোর বিপ্লবে পড়িয়া অনেক অপরিপক্কমনা বঙ্গীয়যুবককুল নির্ণয় করিতে অক্ষম হইয়া একেবারে অকূলে পড়িয়াছেন। ভারতের নূতন রাজধানী কলিকাতা; তথায়ই এই মহাবিপ্লব প্রবল-ভাবে প্রবাহিত। রামকৃষ্ণ এতটা বুঝুক্ না বুঝুক্, অনেক চিন্তা করিয়া, অবশেষে বলিল, "তুমি এক বংশের একা,—কলিকাতায় যাইবে?" নিরক্ষর ভৃত্য রামকৃষ্ণের একথাটার বড়একটা মূল্য নাই ভাবিয়া চারুচন্দ্র একটু হাসিলেন। পরে বলিলেন,—"কলিকাতায় যাইব, তার একবংশের একা তাতে কি? সেস্থানে গেলেইত আর লোক ম'রে যায় না।"

রামকৃষ্ণ একটু মাথা নাড়িল। তাহার অমার্জ্জিত সরল বুদ্ধিতে যতদূর চিন্তা করা সম্ভব, চিন্তা করিতে লাগিল। একে কলিকাতা এরূপ ভীষণ স্থল; সেস্থানে নাকি কত পিশাচী ডাকিনী মানুষ ভুলাইয়া উদরসাৎ করে। চারুচন্দ্র ছেলেমানুষ; কোনও

দিন কষ্টের বার্ত্তা জানে না। সংসারে মানুষ চিনিয়া চলিতে এখনও শিখে নাই। এ অবস্থায় তাহার কলিকাতায় যাওয়া অমঙ্গল বই মঙ্গলের কারণ নয়। রামকৃষ্ণের বুদ্ধির বিশেষ দোষ, সে তরলমতি যুবক চরিত্রে একটুও বিশ্বাস করিত না। প্রভু-পুত্র চারুচন্দ্রকে সে পুত্রাধিক ভালবাসিত, কিন্তু তাহার চরিত্রের দৃঢ়তার প্রতি রামকৃষ্ণের তত বিশ্বাস ছিল না। হয়ত ইহাতে কোনও উদার-চেতা পাঠক, সংকীর্ণমনা বলিয়া রামকৃষ্ণের নিন্দা করিতে পারেন; কিন্তু আমরা তাহাকে বহুদর্শী অভিজ্ঞ পুরুষ বলিয়া প্রশংসা করিব। রামকৃষ্ণ আরও ভাবিল, প্রবাসে এমন কোনও আত্মীয় স্বজন নাই যে চারুচন্দ্রের তত্ত্বাবধান করে, সেখানে ক্ষুধার সময় দুটী অন্ন তাহাকে দেয় এমন জন কে রহিল? বিদেশে কে তাহাকে স্নেহ করিবে, দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে কে তাহাকে সান্ত্বনা করিবে? তাহার মনমত করিয়া তামাক সাজিয়া দিবে, কাপড় কোঁচাইয়া দিবে? রামকৃষ্ণ সাতপাঁচ ভাবিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িল। মনের কথা প্রকাশ করিয়া চারুচন্দ্রকে বলে, এমন ভাষাজ্ঞান তার নাই। তাহার কান্না আসিল। কোনও কথা বলিল না। চারুচন্দ্রের মুখেরদিকে চাহিয়া রহিল। চারুচন্দ্র বলিলেন, 'তবে কি তোমার মত হয় না?'

রামকৃষ্ণ অনায়াসে বলিল "না"।

চারু। তবে কি উপায়ে চলিবে? কোথায় দাঁড়াইব?

বড় বিষম সমস্যা, গুরুতর প্রশ্ন। রামকৃষ্ণ আবার ভাবিল; তাহার চক্ষু দিয়া দুই এক ফোঁটা জল পড়িল। কিছু ভাবিয়া বলিল, 'কত টাকার দরকার?'

চারু। আপাততঃ পাঁচ হাজার টাকা হইলে ঋণ শোধ হ'তে পারে।

পাঁচ হাজার! আজীবন দুইমুদ্রা বেতন লইয়া যে পরের দাসত্ব করিতেছে, তাহার কাছে পাঁচ হাজার টাকা! রামকৃষ্ণ চতুর্দ্দিক আঁধার দেখিল। তাহার মনে মনে যেন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, দেবগ্রামের রায় গোষ্ঠীর সর্ব্বনাশ হইল। মনে মনে পরমেশ্বরকে ডাকিল। পরে বলিল, 'যদি একান্ত যাইবে, তবে আমাকে সঙ্গে লইবে।'

চারু। তাহা হইলে ভাল হইত বটে। কিন্তু তুমি বাড়ীতে না থাকিলে বাড়ীতে কে থাকিবে? এমন বিশ্বাসীলোক কোথায় পাইব? তুমি বাড়ীতে থাকিলে আমি বাড়ীর বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিব।

রামকৃষ্ণের কোনও পরামর্শ ই টিকিল না। অগত্যা সে সে দিন কার্য্যোদ্দেশে স্থানান্তরে চলিয়া গেল। চারুচন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনে বাহির হইলেন।





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।



বাসন্তী-শুক্লাষ্টমীর সুবিমল অর্দ্ধচন্দ্র মেঘ-বিমুক্ত-নীলাকাশে গৌরবে ডগমগ করিতেছে। জগৎ নির্ম্মল চন্দ্রিকাময় সুবর্ণসাগরে সাঁতার খেলিতেছে। গগনময় জ্যোৎস্না মধ্যে নক্ষত্ররাজি অদৃশ্য; ক্বচিৎ দুই একটী হীনপ্রভ হইয়া পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে। মহানের সমীপে ইতর আত্মগোপন করে। রাত্রি অধিক হয় নাই। শ্রমজীবীর শ্রান্তিদূর হইয়াছে, এখনও নিদ্রার ক্রোড় আশ্রয় করে নাই। জননীর গৃহকর্ম্ম শেষ হইয়াছে, অবসর পাইয়া শিশুসন্তান কোলে করিয়া চুম্বন করিতেছেন। প্রণয়ী কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর পাইয়া, প্রেমিকার অন্দর সুশোভিত করিতেছেন। কৃষক দিবসের শ্রম দূর করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে; কেরাণী বাবুরা কলম ছাড়িয়া চক্ষু মুদিয়া হুক্কা টানিতেছেন। চিন্তানাহত যুবকবৃন্দ সহচর পরিবেষ্টিত হইয়া দ্যূত ক্রীড়ায় মনোনিবেশ করিয়াছে। এখনও জগৎ শতকণ্ঠে শব্দায়মান। কিন্তু দেবগ্রামের রায় বাড়ীটী আজ নীরব,—প্রবল ঝটিকার পূর্ব্বে ঘনঘটাচ্ছন্ন জগতের ন্যায় নিস্তব্ধ। নীরব, সবে এই প্রথম। পূর্ব্বদিবস এমন সময়ে ঐ গৃহ ক্রীড়াশক্ত-যুবকদলের উচ্চ হাস্তরবে প্রতিধ্বনিত ছিল। আজ অকস্মাৎ ভাবান্তরিত। সহচরবৃন্দ সন্ধ্যা

বেলায় ক্রীড়ার্থ আসিয়াছিলেন, চারুবাবু অসুখ করিয়াছে বলিয়া ক্রীড়ায় যোগ দেন নাই। তাঁহারা ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া গিয়াছেন।

চারুচন্দ্র একাকী ধীরে ধীরে ছাদের উপর ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার প্রতিপদ বিক্ষেপ, প্রতি অঙ্গ সঞ্চালন, প্রতি ভাব পরিবর্ত্তন অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য-পরিব্যঞ্জক। তিনি ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, শূন্যনয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। ঊর্দ্ধে নীলাকাশে অর্দ্ধচন্দ্রের সুবিমল হাসি, নিম্নে জ্যোৎস্না পরিস্নাতা বসুমতীর এহেন স্নিগ্ধ প্রভা! চতুর্দ্দিকে মৃদুল সান্ধ্যসমীরে নব কিসলয়-সুশোভিত বৃক্ষ-রাজির মৃদুপত্র সঞ্চালন; প্রফুল্ল বাসন্তী কুসুমসমূহের সুস্নিগ্ধ সৌরভ, কিছুই যেন চারুচন্দ্রের মনোমধ্যে স্থান পাইতেছে না। তিনি আজ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তাঁহার চিন্তা এই নূতন। সত্য বটে তিনি বাল্যে পিতৃহীন হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কখনও অভাব দুঃখ সহ্য করিতে হয় নাই। বর্ত্তমানে তাঁহার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে না হইলে, তাঁহাকে আরও দুই চারিবৎসর কোনও চিন্তা করিতে হইত না। কিন্তু মনুষ্যের দুঃখ বৃদ্ধিই জ্ঞান বিস্তৃতির ফল। চারুচন্দ্র চিন্তা করিতেছেন, এখন কি হইবে? এরূপ অলসভাবে বাড়ীতে বসিয়া থাকিলে, পরিণামে অন্নাভাবে মরিতে হইবে। আবার কিরূপেই বা প্রবাসে থাকিব? কিরূপে দীর্ঘকাল আত্মীয় বন্ধুর মুখ না দেখিয়া বিদেশে কালযাপন করিব? সরলা প্রভারই বা কি দশা হইবে? সে যে দুদণ্ড আমাকে না দেখিলে জগৎ শূন্য দেখে, এত দিন না দেখিয়া কি প্রাণে বাঁচিবে? মাতা বৃদ্ধা, আমিই তাঁহার সম্বল; আমি চক্ষুর অন্তরাল হইলে তিনি কাঁদিয়া আকুল হন? কিরূপে

তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইব। আর যে দুগ্ধপোষ্য শিশুটী; ওর মুখ দেখিলে আমি যেন সকল ভুলিয়া যাই; প্রাণাধিককে এতকাল না দেখিয়া কি করিয়া থাকিব? কলিকাতায় গিয়া কাহার কাছে দাঁড়াইব? সে নাকি অতি ভয়ানক স্থান, সর্ব্বত্রই দস্যু ডাকাতের ভয়। সে স্থানেত আমার আপন জন কেহ নাই যে আমার তত্ত্বাবধান করিবে! কিন্তু উপায় কি! এরূপ নিষ্কর্ম্মা ভাবে রমণীর অঞ্চল ধরিয়া গৃহে বসিয়া থাকিলে ক'দিন চলিবে। মায়া মোহ ছিন্ন করাই পুরুষত্ব। কত লোক চিরতরে স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া উদাসীন হইয়া বনবাস আশ্রয় করিতেছে, আমি কিছুদিনের জন্য বিদেশে থাকিতে পারিব না? আমি কি এতই কাপুরুষ?

চারুচন্দ্রের চিন্তার পার নাই। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যে কলিকাতায় এখন আমরা আমোদ প্রমোদের জন্য বেড়াইতে যাই, সেই কলিকাতায় যাইতে, চারুচন্দ্রের এত চিন্তা কেন? কিন্তু তখনকার কলিকাতা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। চারুচন্দ্রের বাসস্থান পূর্ব্ববঙ্গে। তখন এদেশ কলিকাতার এত নিকট ছিল না। হয় পদব্রজে না হয় নৌকা পথে যাইতে হইত। স্থল-দস্যু ও জল-দস্যুর অভাব ছিল না। তার পর চারুচন্দ্র ধনীর আবদারে ছেলে; কোনও দিন গৃহের বাহির হন নাই। বিদেশে পরের কাছে মাতা পত্নী ছাড়িয়া দীর্ঘকাল বাস করিতে হইবে এই চিন্তাতেই চারুচন্দ্র চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতেছেন। ভাবিতে ভাবিতে তিনি শূন্য-নয়নে আকাশ পানে চাহিয়া বসিয়া পড়িলেন। রাত্রি ভোজনের সময় হইয়াছে, তাহা ভুলিয়া গেলেন।

তখন সেই বিমল-চন্দ্রিকা-ধবলিত প্রাসাদ-শিখরের অপরাংশে সঙ্ঘনীভূত-কৌমুদী-রাশি-গঠিত একখানি রমণী-প্রতিমা সমুদ্ভাসিত

হইল। গগনে চাঁদের উদয়, ভূতলেও চাঁদের উদয়; দুই চাঁদে দেখাদেখি হইল। কে অধিক সুন্দর? গগন সুধাকরের জগন্ময় কিরণজালে জগৎ আলোকিত, সুশোভিত; আর এ ভূতল-সুধাকরের স্বল্প রশ্মিতে যদি কিছু সুশোভিত হইয়া থাকে, তবে সে কেবলমাত্র এই প্রাসাদতল। গগন-শশীর কিরণে অন্ধকার দূরীভূত হয়। "রূপে গৃহ আলো করে" এই কবি-প্রবাদ থাকিলেও এ চাঁদ কোনও নিভৃত অন্ধকার কক্ষে রাখিলে, সে স্থানে বসিয়া চক্ষুঃ-সাহায্যে কোনও কাজ হইতে পারে না। তবে মাধুর্য্যে ভূতল-চাঁদের জয়। গগন-শশী তাহার অসীম সুধারাশি চারিদিকে ছড়াইয়া কিছু বাহাদুরী লাভের ইচ্ছুক; আর এ ভূতল-শশীর সুধারাশি যাহাতে কোন দিকে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে, তাহাই তাহার একান্ত চেষ্টা। তাহার ইচ্ছা সে গোপনে ফুটে। রাজোদ্যানজাত গোলাপ অপেক্ষা অনেক সুরসিক বনজাত নিভৃত ক্ষুদ্র কুসুমের গৌরব করিয়া থাকেন। নিষ্কলঙ্ক রমণী-চন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন সুধারাশি ফুটিয়া পড়িতেছে। অধরে হাসি, নয়নে হাসি, ভ্রূযুগলে হাসি, চলনে, অঙ্গভঙ্গীতে হাসির ছটা খেলিতেছে। রমণীর ক্রোড়দেশে একটী হাস্যময় শিশুচাঁদ।

প্রাসাদের উপর উঠিয়াই প্রভাবতীর খল্ খল্ শব্দে হাসিয়া উঠিতে ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু জোর করিয়া সে হাসি চাপিয়া রাখিল। আস্তে আস্তে চারুচন্দ্রের নিকট গেল; চারুচন্দ্র কিছুই জানিতে পারিলেন না। পূর্ব্ববৎ ঊর্দ্ধনয়নে জড়ের ন্যায় বসিয়া আছেন। প্রভাবতী ভাবিল চারুচন্দ্র ভান করিতেছেন। প্রভাবতী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, 'আমি কিছুতেই ডাকিয়া কথা বলিব না; এমন করিয়া তুমি কবে জিতিয়াছ!'

পুত্র কোলে করিয়া প্রভাবতী কিছু সময় চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু কতক্ষণ পারা যায়? পোড়া হাসি যে চাপিয়া রাখা দুষ্কর! প্রভা অনেক চেষ্টা করিয়া, মুখ-গহ্বরে কাপড় গুজিয়া, উদ্বেলিত হাস্য-লহরী অধর-সৈকতে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সে জোয়ারের তরঙ্গ চাপিয়া রাখা বড় দায় হইল। অধর-পথে বাধা পাইয়া হাস্যতরঙ্গ সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃত হইয়া মাধুর্য্যময়ীকে অধিকতর মাধুর্য্যময়ী করিয়া তুলিল। আরও কিছুকাল এইরূপ ভাবে থাকিয়া প্রভাবতী ক্রোড়স্থ পুত্রমুখ-চুম্বনচ্ছলে শব্দ করিল। তখনও চারুচন্দ্র গ্রাহ্য করিলেন না! বটে, এত অভিমান! তবু চাঁদের মুখ পানে চাহিয়া? প্রভা চাঁদের দিকে চাহিয়া কলহের স্বরে বলিল, "দেখ্ পোড়ার মুখ চাঁদ! তোমার এত সাহস? আমার সতিন হ'তে এসেছ? জাননা আমি সতিন দেখিলে নাক কান না কেটে ছাড়ি না।"

এবার চারুচন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিল। মুখ ফিরাইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভার মুখ দেখিয়া, কি করিতেছিলেন তাহা ভুলিয়া গেলেন। অল্প হাসিয়া বলিলেন "কি ব'লছ? দেখনা চাঁদটী কেমন সুন্দর!"

প্রভা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তাই বুঝি ওর দিক্ হ'তে চোক ফেরে না। চাঁদকে বিয়ে কর্‌বে নাকি? তুমি ত সুন্দর বড় ভালবাস। আমায় গয়না পরিয়ে সুন্দর করিতে চাও। চাঁদ ধরে দেব, বিয়ে ক'রবে?" বলিয়াই প্রভা খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া মুখে কাপড় দিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া পড়িল।

চারুচন্দ্র বলিলেন, "যে যাকে দেখ্‌তে চায়, সে বুঝি তাকে বিয়ে করে? চাঁদকে কে না দেখে?"

প্রভা। আমি নয়।

চারু। তবে জ্যোৎস্না-রাত্রে ছাদের উপরে ব'স্‌তে এত ভাল-বাস কেন?

প্রভা। চাঁদ দেখ্‌তে নয়। কবে আমায় চাঁদের পানে চেয়ে থাক্‌তে দেখেছ?

চারু। তুমি অন্ধকার রাত্রিতে ছাদে আস্‌তে চাওনা কেন?

প্রভা। অন্ধকার রাত্রিতে প্রদীপ জ্বেলে ঘরে ব'সে চাঁদ দেখি। আকাশের চাঁদ আমার প্রদীপ, যেদিন জ্বলে সেদিন আর ঘরের তেল পোড়াই না। ওইত চাঁদ হাসছে, আমার চক্ষু কোনদিকে?

প্রভা চারুচন্দ্রের মুখপানেই চাহিয়া ছিল। এ কথাটী বলিয়া মাথা গুজিয়া মাটির পানে চাহিল। চারুচন্দ্র আদরে প্রভার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, মুহূর্ত্তের জন্ম তাহার অন্তরের চিন্তা-রাশি বাত্যা-সংযোগে ধূলিরাশির ন্যায় উড়িয়া গেল। প্রভা পুত্রটীকে স্বামীর কোলে রাখিয়া, নিজে তাহার বক্ষোপরি মস্তক হেলাইয়া চাপিয়া চাপিয়া, রহিয়া রহিয়া নীরবে হাসিতে লাগিল। প্রভাবতী চির-দিন হাস্যময়ী; চিরদিন কৌতুকপ্রিয়া। তাহার পিতৃগৃহে আপন বলিয়া স্নেহ করিবার কেহ ছিল না; বাল্যে, জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে, পিতৃগৃহ ছাড়িয়া শ্বশুর-গৃহে আসিয়াছে। কিন্তু অতীত কি ভবিষ্যতের প্রতি চাহিয়া দুঃখ করিবার দূরদৃষ্টি প্রভাবতীর ছিলনা। সে বর্ত্তমানে নিমগ্ন,—তাহার সংসার বর্ত্তমান লইয়া। বালিকার কাছে এ সংসার,—তুমি, আমি, শত হতভাগা যাহাকে অসহ্য-দাবা-নল-দগ্ধ ভীষণ অরণ্য বলিয়া সর্ব্বদা তাহা হইতে মুক্তি-লাভের কামনা করিতেছি, সে সংসার সরলা প্রভাবতীর কাছে আরাম-

স্থল, শান্তির লীলাক্ষেত্র, প্রমোদের কুসুমোদ্যান। সে এই সংসারে থাকিয়া, ব্যাধি-বিচ্ছেদ-রহিত দেব-নিকেতন স্বর্গের সহিত মর্ত্ত্যের পার্থক্য বুঝিতে পারে না। তাহার হাসিতে বাধা নাই; প্রভা কেবল হাসিতেছে! স্বামীকে আহারার্থ ডাকিতে আসিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু চারুচন্দ্র!—চারুচন্দ্রের হাসি গিয়াছে, ঘন মেঘে সৌদামিনী-চমকবৎ, পলকে ভাসিয়া পলকে নিবিয়াছে। চিন্তিত-হৃদয়ে সুখ আলেয়ার আলো। চারুচন্দ্রই স্বীয় কিরণে প্রভা-কুমুদ-কলিকাটী ফুটাইয়া হাসাইয়াছেন; কিন্তু এখন তাঁহাকে মেঘে ঢাকিয়াছে। প্রভা ফুল, মেঘে তাহার হাসি ঢাকে না। প্রভা কেবল হাসিতেছে। চারুচন্দ্রের মুখ-মণ্ডল কালিমাময় গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। চক্ষু দুইটী ছল্ ছল্ করিতেছে। বক্ষঃস্থল কম্পিত হইতেছে। প্রভাবতী কিছুই বুঝিল না। তত অনুধাবন-শক্তি তাহার ছিল না। চির দিন যে হাস্য-কৌতুক-প্রফুল্ল-মুখচ্ছবি তাহার মানসপটে অঙ্কিত রহিয়াছে, আজিও সে চারুচন্দ্রের সেই মুখচ্ছবি দর্শন করিতেছে; কাল-প্রতিঘাতে সে মুখে যে কালিমা-রেখা পড়িয়াছে, সুশোভন স্বচ্ছ সরোবরে যে পঙ্কস্তর সঞ্চিত হইতেছে, বহির্ভাসমান চঞ্চল-শৈবাল-দল বালিকা প্রভাবতী তাহার কি বুঝিবে? সে জানে সুখ, জানে প্রণয়; দুঃখ বিচ্ছেদ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সুখ ক্ষণ স্থায়ী, একথাটী প্রভাকে কেহ বলিয়া দেয় নাই। বাস্তবিক, এই ধারণাই সুখ। গুণবান হইলে সুখ নাই, রূপবান হইলে সুখ নাই, রাজা হইলে সুখ নাই, জগজ্জয়ী হইলে সুখ নাই;—যদি মনে থাকে, জন্মিলে মরণ আছে, ভাবের পরিবর্ত্তন আ-

কিন্তু মনুষ্য-মনে কদিন এ বিশ্বাস না হইয়া থাকিতে পারে? আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশ্ব, তুমি অবশ্যই বলিবে, সংসারে সুখ নাই। প্রভা এখনও সুখসাগরে সাঁতার দিতেছে; মুহূর্ত্ত দাঁড়াও, দেখিবে এখনই সেই সুখসাগর উত্তালতরঙ্গময় দুঃখ-সাগরে পরিণত হইবে; প্রবল-বাত্যা বিক্ষোভিত তরঙ্গ-মধ্যে প্রভা কূল দেখিতে পাইবে না।

চারুচন্দ্র একটু গম্ভীর-স্বরে বলিলেন "প্রভা! আমাদের সুখের পথে বুঝি কণ্টক পড়িল।"

"সেকি"! প্রভা চারুচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল। প্রথমে ভাবিল, চারুচন্দ্র রঙ্গ করিতেছেন। কিন্তু তিনিত অমন সুরে রঙ্গ করেন না। মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, চারুচন্দ্রের চক্ষে জল, মুখখানি ভাবান্তরিত। প্রভার কাছে রোদন বড় একটা কষ্টের বলিয়া ধারণা ছিল না। প্রভা অনেক সময়ে কাঁদিত, কিন্তু তাতে তার সুখের তেমন কিছু হানি হইত না। প্রভা মাঝে মাঝে পিতৃ-ভূমি দেখিতে যাইত; সে স্থান হইতে আসিবার সময়ে কাঁদিত; কিন্তু চারুবাবু যাই তাহার অশ্রু-নিসিক্ত কপোলে সস্নেহ-চুম্বন করি-তেন, প্রভা কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া ফেলিত। প্রভা স্বামীর উপর অভিমান করিয়া কতবার কাঁদিয়াছে; কিন্তু পরক্ষণেই স্বামীর ব্যঙ্গোক্তিতে হাসিয়া ফেলিয়াছে। সে তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর সহিত বচসা করিয়া মধ্যে মধ্যে কাঁদিত, কিন্তু যেই তিনি মা বলিয়া আদর করিয়া কোলে লইতেন, অমনি সে অশ্রু আনন্দাশ্রুতে পরি-ণত হইত। ইহার অধিক দুঃখ-বার্ত্তা প্রভা জানিত না। ভাবিল, চারুচন্দ্র বুঝি মায়ের সঙ্গে বচসা করিয়া আসিয়াছেন। আমিত কোনও অন্যায় কাজ করি নাই, যে আমার উপর রাগ করিবেন?

কিন্তু "সুখের পথে কণ্টক পড়িল!" সে কি কথা! চারুচন্দ্র এমন সুর পাইলেন কোথায়? প্রভা বিশেষ কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "খেতে চল। ভাত নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে।"

চারুচন্দ্র গম্ভীর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন। ছেলেটী গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল; তাহাকে কোলে লইয়া, প্রভার হাত খানি আপন হাতে রাখিয়া বলিলেন, "প্রভা! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর; আজ গুটি কতক কথা বলিব।"

বাস্তবিক, চারুচন্দ্রের সুরের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রভা একটু গম্ভীর ভাবে বলিল, "আচ্ছা! বল।"

চারুচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "দেখ আর আমার এরূপ সুখের কোলে শুইয়া থাকা ভাল নয়। এমন ভাবে আর কদিন চলিবে? দুদিন পরে পেটের অন্নও জুটিবে না। পরের ঋণে সমস্ত ডুবিয়া গেল। এখনও সময় থাকৃতে চেষ্টা করা ভাল। আর কিছুদিন পরে দাঁড়াইবার স্থান টুকুও থাকিবে না।"

প্রভা কতক বুঝিল, তাহার হাসি নিভিল। কিন্তু একথা বুঝিল না, তাহাদের সুখ ফুরায় কিসে। তাহার স্বামী দায়ের জন্য চিন্তা করিতেছেন; পরের ঋণে তাঁহার বাড়ী ঘর, বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যাইবে সেই ভয় করিতেছেন। তাহাতে তাহাদের সুখ ফুরায় কিসে? মণিমুক্তা, হীরাজহরত তাহাদের সুখের উপাদান নহে। এ সুখ ভোগ করিতে গালিচা মকমলের চিত্রিত আস্তরণ, অথবা সুকারুখচিত বহুমূল্য রত্নাসনের প্রয়োজন নাই। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ভোজনের অভাবে এ সুখের অবসান হইতে পারে না। বাড়ী যাইবে, ঘর যাইবে, কুটীরে না হয় বৃক্ষ তলে থাকিব; কিন্তু এ সুখ ফুরাইবে কিসে? প্রভা কিছু

বুঝিতে না পারিয়া একটু ভাবিয়া বলিল, যাহা হয় হবে, তার এখন ভাবিয়া কি হইবে?

চারু। প্রভা, সকল সময়ে বালিকার মত ভাবিলে চলে না। এখন হইতে না ভাবিলে, পরিণামে কি আর ভাবনার পার থাকিবে? যা'ক্, তোমায় যাহা বলিতে চাহিয়াছি তাই বলি। আমি শীঘ্রই বাড়ী হইতে স্থানান্তরে যাইব; একটী চাকরীর চেষ্টা করিব। যদি দুপয়সা রোজগার করিতে পারি, তবে একরূপ পথ করিতে পারিব। রামাখুড়োর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছি। সে বাড়ী থাকিলে তোমাদের কোনও কষ্ট হইবে না।

প্রভা ব্যগ্রভাবে বলিল, "কোথা যাবে।"

চারু। কলিকাতা।

"কলিকাতা!" প্রভার কণ্ঠরোধ হইল। মাথার উপর আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। চতুর্দ্দিক হইতে ঘোর অন্ধকাররাশি আসিয়া বালিকার আলোকময় হৃদয় সহসা আবরিত করিল। প্রভা বুঝিল, সুখ ফুরায়। কোমল-লতিকা হৃদয়গ্রন্থির দৃঢ় বন্ধনে যে তরু-আশ্রয় করিয়াছে, সহসা প্রবল ঝটিকা আসিয়া সেই তরু-দেহ কাঁপাইয়া দিল; লতিকা গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল। কতক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে, কোলের পুত্রটীকে আরও কোলে টানিয়া লইয়া, স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন উপায় পাইল না। বালিকার মত বলিল, "না তুমি কলিকাতায় যাইও না।"

চারু। কলিকাতা ভারতের রাজধানী, আজ কাল অর্থের ভাণ্ডার; সে স্থানে গেলে চাকরী পাইবার সম্ভব।

প্রভা। বরং না খাইয়া মরিব, তবু কলিকাতার চাকরী চাই না।

চারু। কেন প্রভা।

প্রভা। কলিকাতা যাদুর কারখানা। আমার পিসীমার ভাসুরপুত্র গিয়াছিল; বড় চাকরীও পাইয়াছিল। কিন্তু শেষে দেশ ছাড়িয়া সাহেব হইয়া গিয়াছে। সেখানে যে যায়, তাকেই নাকি সাহেবে যাদু করে।

চারুচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'তুমি ওঝা আনিয়া কবচ বান্ধিয়া দিও; তা হলে আর ভুলাতে পার্‌বে না।'

প্রভাও হাসিল; চারুচন্দ্র হাসিলেই, তাহার হাসি আসে। চারুচন্দ্রের হাসি দেখিয়া ভাবিল গোল চুকিয়া গিয়াছে। কিন্তু চারুচন্দ্র তখনও বলিলেন, "যাই হ'ক, প্রভা আমায় যেতে হবে। একবার না হয় কলিকাতাটা দেখে আসি।"

আবার সেই কথা,—আবার প্রভা ভাবিল। ভাবিয়া ভাবিয়া, গম্ভীর হইল। তারপর হঠাৎ প্রফুল্ল হইল। যেন তাহার ভরসা হইল সব গোল চুকিবে। বিশেষ আশ্বস্ত চিত্তে বলিল, "আচ্ছা, টাকা পেলেত আর কলিকাতায় যাবে না।"

চারু। হ্যাঁ, এত টাকা এখন কোথায়?

প্রভা। কত টাকা?—আমার যে গহনাগুলি আছে, তাতে চার হাজার টাকা হইতে পারে। তা ছাড়া কাপড় চোপড় বাক্স পেটরায়ও হাজার টাকা হইতে পারে। আপততঃ সেই গুলি বিক্রয় করে, দায় শোধ দাও। এতে না কুলায়, সম্পত্তির কতকাংশ ছাড়িয়া দাও। তারপর যা হয় দেখা যাবে।

চারুচন্দ্র আবার একটু হাসিয়া সরলা পত্নীর উৎকণ্ঠিত হৃদয় আশ্বস্ত করিলেন। এত দুঃখ, এত মর্ম্মবেদনার মধ্যেও সরলার সরল উত্তরে চারুচন্দ্র হাসিলেন। চারুচন্দ্র যথার্থ বুঝিলেন, সর্ব্বস্ব

হারাইয়া ভিখারী হইলেও প্রভা কাছে থাকিলে কোনও দুঃখে তাহাকে কাতর করিতে পারে না। কিন্তু প্রভার কথাটা সঙ্গত বোধ করিলেন না। বলিলেন, "প্রভা! তোমার মত পতিপরায়ণা পত্নীর উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ। কিন্তু তাঁহা আমার পক্ষে সঙ্গত নয়। যে পুরুষ পত্নীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, অথবা পিতৃপুরুষের স্থাপ্যধন নষ্ট করে, সে অধম, কাপুরুষ; দেবতারা তাহার প্রতি রুষ্ট! লক্ষ্মী তাহার প্রতি বিরূপ। তোমার স্বামী কি তাই করিয়া জগতের অপদার্থ ঘৃণিত হইয়া থাকিবে! প্রভা! এ সংসার সুধু লীলার স্থান নয়; সাধুরা ইহাকে কার্য্য-ক্ষেত্র বলেন। এ সংসারে আসিয়া, ইতর পশু পক্ষীও কাজ করিয়া খায়। কার্য্যই মনুষ্যত্ব। যে কাজ না করে, তাহাতে আর এক গাছি তৃণেও পার্থক্য নাই। ভাবিয়া দেখ, ঋণের দায়ে এখনই আমাকে মহাজনেরা তাগিদ করিতেছে, কিছু দিন পরে অপমান করিবে। এ অবস্থায় বাঁচিয়া ফল কি?"

প্রভা কোনও উত্তর করিল না। চারুচন্দ্রের ন্যায়ের উপর অশিক্ষিতা অন্দরবাসিনী বালিকা আর কি উত্তর করিবে? প্রভার কান্না আসিল। স্বামীর সঙ্গে কথায় আটিতে না পারিলে সে কাঁদি-য়াই জয় করিত; আজও কাঁদিল; নীরবে,—নীরবে সেই বিস্তীর্ণ প্রফুল্লেন্দীবর নয়ন যুগল হইতে,—যে নয়ন মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে কটাক্ষময় চঞ্চল শফরীতুল্য ভাসিতেছিল,—সেই অকস্মাৎস্থির উন্মেষিত নয়ন যুগল হইতে নীরবে, ধারার উপর ধারা গড়াইয়া পড়িল। শিশু ভবচন্দ্র মায়ের মুখের দিকে চাহিল; সে কিছু বুঝিল না; কিন্তু স্তন্য পান করিতেও সাহস পাইল না।

চারুচন্দ্র প্রভাকে অনেক বুঝাইলেন, প্রভা যেন ঘোর ঘূর্ণাবর্ত্তে

পড়িয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়াছে। কতক্ষণ পরে বলিল, "কলিকাতায় গেলে কি চাকরী হবে?"

চারু। হ্যাঁ! খুব সম্ভব।

প্রভা। আর কোথাও চাকরী নাই। দেবগাঁর কাছারিতে চেষ্টা কর না কেন?

চারু। কলিকাতা না হইলে এখন সেরূপ টাঁকা কোথাও মিলে না।

প্রভা চুপ করিয়া চোকের জল ফেলিতে লাগিল। চারুচন্দ্র বলিলেন, "ছি! এত কাতর হইতেছ কেন?"

প্রভা। বড় ভয় হয়।

চারু। ভয় কি পাগলি! আমিত আর সোণা রূপা নয় যে হারিয়ে যাব।

প্রভা। কলিকাতার লোকে যে পুরুষ চুরি করে।

চারু। আমার মনের উপর তোমার বিশ্বাস আছে?

প্রভা বড় অপ্রতিভ হইল। ছি! কি করিতেছি! স্বামী ভাবিতেছেন, তাঁহার ভালবাসায় সন্দেহ করিতেছি। প্রভা ও কথা ঢাকিবার চেষ্টায় বলিল, "থাক্ ওকথা! চল, ভাত নষ্ট হয়ে যায়। মা বোধ হয়, এখনও পাকের ঘরে বসে আছেন।"

চারুচন্দ্র উঠিলেন। প্রভা ভবচন্দ্রকে কোলে লইয়া উঠিল। শিশু তখন সাহস পাইয়া স্তন্য পান করিবার চেষ্টা করিল। প্রভা অনর্থক তাহাকে ধমকাইয়া বলিল, "রস্! হত ভাগা! আপদ কোথাকার?"





তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনেক ভাবনাচিন্তা পরামর্শের পর চারুচন্দ্রের কলিকাতা যাওয়াই স্থির হইল। শুভদিন দেখিয়া দুই মাসের পাথেয় লইয়া যাত্রা করিলেন। নৌকাপথে যাইতে হইবে,—এখনকার ন্যায় তখন পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কলিকাতায় যাওয়ার পথ নিতান্ত সহজ ও নিরাপদ ছিল না। পথে দস্যুডাকাতের ভয় আছে, সেজন্য দুইজন বলবান্ লাঠিয়াল সঙ্গে লইলেন।

মাতা তারাসুন্দরী সুর ধরিয়া কাঁদিলেন; শুভ-যাত্রার সময়ে কাঁদিলে পুত্রের অমঙ্গল হইবে, এই ভয়ে চারুচন্দ্রের যাত্রার পূর্ব্বে অনেক কষ্টে রোদন চাপিয়া রাখিয়াছিলেন; চারুচন্দ্র নয়নের বাহির হইলেই সে রুদ্ধস্রোত প্রবলবেগে নিঃসারিত হইল। তারাসুন্দরীর অদৃষ্ট ভাল নয়। তিনি প্রথম যৌবনে একটী পুত্র ও একটী কন্যা মাত্র লইয়া বিধবা হইয়াছেন। বিধবা হইবার দুই বৎসর পরে কন্যাটী হারাইয়াছেন; একমাত্র পুত্র চারুচন্দ্রই তারাসুন্দরীর জীবনাকাশের ধ্রুবতারা। বালককাল হইতে এ পর্য্যন্ত তিনি পুত্রকে নয়নের অন্তরাল করেন নাই; সেই জন্যই বাল্যে চারুচন্দ্রের সুন্দর রূপ লেখাপড়া শিক্ষা হয় নাই।

তারাসুন্দরীর স্বামী সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন; বিষয়ে বার্ষিক হাজার টাকা আয় হইত। চাকরী করিয়াও দুই হাজার টাকা উপায় করিতেন। কিন্তু তিনি বড় ব্যয়শীল ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে চার হাজার টাকার ঋণ রাখিয়া যান। সেই ঋণের জন্যই চারুচন্দ্রকে আজ দেশত্যাগী হইতে হইতেছে। তারাসুন্দরী বড় লোকের মত, এ যাবৎ পুত্রকে প্রতিপালন করিয়াছেন। পিতৃহীন বলিয়া, চারুচন্দ্রের কোন বাসনাই কোনদিন অপূর্ণ থাকে নাই। পুত্রের ষোল বৎসর বয়সের সময় তিনি, দশ ঘর দেখিয়া শুনিয়া মনের মত সুন্দরী, সুলক্ষণা বধূ আনিয়া পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। পুত্র, পুত্রবধূ লইয়া, তিনি যৌবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া, বড় সুখশান্তিতে ছিলেন। সহসা তাঁহার হৃদয়াকাশে দুঃখের মেঘ সঞ্চিত হইল। তারাসুন্দরী আপন অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার দিয়া, অতীতের শোক বর্ত্তমানে মিশাইয়া সুর তুলিয়া কাঁদিলেন।

প্রভা সুর ধরিতে পারিল না; কেবল চক্ষু মুছিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে দুবার মুছে তবু যেন যায় না। বুক যেন ফাটিয়া যায়; নির্জ্জনে গিয়া ফুফিয়া ফুফিয়া একটু কাঁদিয়া লইল। ইচ্ছা করিতে লাগিল, শাশুড়ীর সঙ্গে গলা মিশাইয়া তেমনি করিয়া কাঁদে; লজ্জায় তাহা পারিল না।

এইরূপে দিন কাটিয়া গেল। প্রভার খাইতে ইচ্ছা নাই; কিন্তু ভৃত্য রামকৃষ্ণ কেন উপবাস করিবে? চক্ষু মুছিতে মুছিতে সে পাকশালায় গেল। তখন রামকৃষ্ণ আসিয়া বলিল, "বউ মা! আমার ভাত রাঁধিও না। আমার খাইতে ইচ্ছা নাই।" তবে প্রভা ভাত রাঁধিবে কাহার জন্য? ভবচন্দ্রকে।; খাওয়াইয়া সকাল রাত্রিতেই গিয়া শুইল।

রামকৃষ্ণও সকাল সকাল তামাক আগুণ লইয়া বাহিরের বৈঠকখানায় গিয়া শুইল। শুইয়া কিছুক্ষণ পরে গান ধরিল। আজ আর সে সখী-সংবাদ, কুঞ্জলীলা, গোষ্ঠলীলা গাইল না। রামকৃষ্ণ রামপ্রসাদী ধরিল,—

মা, আমায় ঘুরাবি কত ?
কলুর চ'ক ঢাকা বলদের মত।
ভবের গাছে জুড়ে আমায় পাক দিতেছ অবিরত।

তারাসুন্দরী বধূর কাছে শুইয়াছিলেন। সুর ধরিয়া কাঁদিয়া তাহাকে অধিকতর বিকলা করিতে পারিতেছেন না। চুপে চুপে চক্ষু মুছিতেছেন। প্রভাও চুপে চুপে চক্ষু মুছিতেছে। কাহারও ঘুম নাই। শেষ-রাত্রিতে প্রভার একটু তন্দ্রা আসিল। এত চিন্তার পর, নিদ্রায় কি সুখ হয় ? প্রভা স্বপ্ন দেখিল, যেন সে স্বামীর সঙ্গে বাগানে বেড়াইতেছে। চারি পার্শ্বে বৃক্ষ সকল কত ফুল ফলে সুশোভিত রহিয়াছে। মধুর মৃদুলবাতাসে, মধুর গন্ধ ছুটিতেছে। স্বামীর সঙ্গে প্রভা কত হাসিতেছে। তারপর দেখিতে পাইল, কিছু দূরে কতকগুলি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। সেগুলি বড় আশ্চর্য্য ফুল ;—তাহার গাছ নাই, শূন্যে ফুটিয়া রহিয়াছে। চারুচন্দ্র দেখিতে পাইয়া, সেই ফুলগুলি তুলিতে সেই দিকে চলিলেন। প্রভা বারণ করিল, তিনি শুনিলেন না। সেই ফুলগুলির কাছে গিয়া চারুচন্দ্র যেন একটী ভ্রমর হইলেন। ভ্রমর হইয়া একটী ফুলে উড়িয়া বসিলেন ; নিষ্ঠুর ফুলটী তখনই যেন তাহার পাপড়িগুলি গুটাইয়া ভ্রমরটী লুকাইয়া ফেলিল। প্রভা কাঁদিয়া উঠিল। তখন যেন আকাশ হইতে একজন দেব-কন্যা নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "ভয় কি ! তোমার ভ্রমর আমি ধরিয়া দিব।" প্রভা কাঁদিতে

কাঁদিতে যেন বলিল, "ভ্রমর মানুষ হইবেত?" দেবী হাসিয়া বলিলেন, "আমি ভ্রমর মানুষ করিতে জানি।"

তখন ভবচন্দ্র কাঁদিয়া উঠিল। প্রভাবতীর স্বপ্ন ভাঙ্গিল। চক্ষু মেলিয়া দেখে, ঊষার আলোক দেখা দিয়াছে। ভয়ে ভয়ে মা দুর্গার নাম স্মরণ করিয়া, স্বপ্ন-বিষয় ভাবিতে ভাবিতে, প্রভা পুত্রটীকে কোলে লইয়া শয্যা হইতে উঠিল।





চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দেড় মাস পরে সংবাদ আসিল, চারুচন্দ্রের চাকরী হইয়াছে। তাঁহার পিতা যে জমীদার-সরকারে চাকরী করিতেন, সেই জমীদার কলিকাতায় আসিয়া আড়ত করিয়াছেন। চারুচন্দ্র সেই আড়তে চাকরী পাইয়াছেন; বেতন পঞ্চাশ টাকা।

সংবাদ শুনিয়া রামকৃষ্ণ আহ্লাদিত হইল; তারাসুন্দরী দুর্গা-নাম স্মরণ করিলেন; প্রভাবতী অধিকতর বিষণ্ণ হইল। স্বামীর চাকরী হইয়াছে শুনিয়া প্রভাবতী বিষণ্ণ হইল, ইহাতে অনেক বুদ্ধিমতী গৃহিণী হয়ত তাহার নিন্দা করিবেন। তা কি করিব?—আমরা যাহা সত্য, তাহাই লিখিলাম। প্রভার ধারণা ছিল, স্বামী বিদেশে যাইতেছেন, যাউন; সুবিধামত চাকরী না পাইলেই ফিরিয়া আসিবেন। তারপর বিদেশের কষ্ট একবার বুঝিয়া আসিলে আর বিদেশে যাইতে চাহিবেন না। তখন গয়না বেচিয়া ঋণ শোধ করিয়া, কুটীর বাঁধিয়া বাস করিব। এখন দেখিল, তাহার সে বিশ্বাস টিকিল না; চারুচন্দ্র ফিরিলেন না। আর কত কাল পরে দেখা হইবে।

তাহার পর প্রভা রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিল, "কতকাল পরে দায় শোধ হইবে?"

রামকৃষ্ণ বলিল, "কেবল চাকরী হইল। চার পাঁচ হাজার টাকার ঋণ। দুই তিন বৎসর পরে শোধ হইতে পারে।"

দুই তিন বৎসর! না তাহারও বেশী। দুই তিন বৎসর বলিলে, পাঁচ ছয় বৎসর ধরিতে হয়? সে কি? তিনি যে বলিয়া গিয়াছেন, ঋণ-শোধ না হইলে দেশে ফিরিবেন না। প্রভা দক্ষিণ হস্তের দুটী অঙ্গুলিদ্বারা অধর স্পর্শ করিয়া শূন্য-নয়নে উর্দ্ধদিকে কতক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর নিভৃতে গিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হায়রে সংসার! এত অল্প সময়ের মধ্যে তোমার এত পরিবর্ত্তন? এই যে তুমি সুখের সাগর ছিলে; অসংখ্য হাস্য-তরঙ্গ তুলিতেছিলে! পলকে ভীষণ মরুভূমিতে পরিণত হইলে। তোমার সকলই অগ্নিময় হইল। প্রভার সুখের সংসার আঁধার হইল। জগতে দুঃখ বলিয়া কোনও পদার্থ ছিল, প্রভা তাহা জানিত না। সুখের পার্শ্বে দুঃখ, আলোকের পার্শ্বে আঁধার, প্রভা তাহা বুঝিল। তাহার বহুকালগত পিতামাতার কথা মনে পড়িল, শৈশবের সঙ্গিনীদিগের কথা মনে পড়িল; বাল্যের লীলা-স্থল মাতৃ-ভূমি মনে পড়িল। সে সব কথা সে একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন সে ভাবিল "যদি পিতৃকুলে কেহ থাকিত, তবে এ সময়ে তাহার কাছে গিয়া প্রাণ জুড়াইতাম।"

শৈশব গিয়াছিল, ছেলের মা হইয়াছিল, তবু প্রভা বালিকাই ছিল। মাসের মধ্যে সে বালিকা-ভাব ঘুচিয়া গেল। চঞ্চল-ভাব গম্ভীর হইল। বর্ত্তমানাবদ্ধ ক্ষুদ্র-বুদ্ধি প্রসারিত হইয়া অতীত-ভবিষ্যতের প্রতি নিপতিত হইল। যে সৌরভ-গর্ব্বোন্মত্ত প্রফুল্ল কুসুম ধীর-সমীরে হেলিয়া দুলিয়া জগৎ আমোদিত করিতেছিল, তাহাতে কীট স্পর্শিয়াছে। প্রভার ফুলের বাগান, কুঞ্জের কোকিল, শরতের চাঁদ কোথায় লুকাইয়াছে। সে এখন কত চিন্তা করে। চিন্তা করিতে তাকে কে শিখাইল?—মানুষকে চিন্তা করিতে কেহ

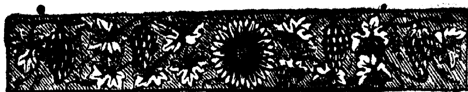
শিখায় না; মানুষ কাহারও আদেশে বা পরামর্শে চিন্তা করিতে শিখে না। ভাবুকের ভাব-প্রকাশে মানব পর-হৃদয়ের ভাব গ্রহণ করিতে পারে; রসিকের অনুকরণ করিয়া নীরস-প্রাণ সরস হইতে পারে; ক্রমাগত কাব্য-কল্পনার অনুশীলন করিয়া মানুষ কল্পনা গঠিতে পারে; কিন্তু কোনও উপদেশে বা কাহারও অনুকরণে মানুষ চিন্তা করিতে শিখেনা। অবস্থাই চিন্তার শিক্ষয়িত্রী। যখন চিন্তা করিবার অবস্থা ঘটিবে, তখন সুবোধ হউক নির্ব্বোধ হউক, বিদ্বান্ হউক নিরক্ষর হউক, রাজা হউক ভিখারী হউক, চিন্তা করিতেই হইবে। প্রভা চিন্তা করে, "আর কবে দেখা হইবে? সত্যই কি ঋণ পরিশোধ না হইলে দেশে ফিরিবেন না? এতকাল কি বাঁচিব? তিনি এতকাল আমাকে না দেখিয়া কি থাকিতে পারিবেন? না, অবশ্যই আমাকে দেখিতে আসিবেন। সেখানে তিনি না জানি কত কষ্টেই আছেন? আমার শ্বাশুড়ী আছেন, রামকৃষ্ণ আছে, পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন আছে। সে স্থানে তাঁহার কে আছে? অসুখ বিসুখ হইলে কে দেখিবে?"

আবার কখনও ভাবে, "আমি এত ভাবি কেন? কতলোকের স্বামীত কতকাল বিদেশে থাকে; তারাত স্বচ্ছন্দে কাল কাটায়। আমি বড় আত্মপরায়ণা; স্বামী অর্থোপায় করিয়া ঋণ-দায় হইতে উদ্ধার পাইবেন; ইহা তাঁহার ধর্ম্ম, না করিলে অধর্ম্ম। আমি সেজন্য দুঃখিত হই কেন? যে স্বামী স্ত্রীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেনা, তাকে লোকে স্ত্রৈণ বলিয়া ঘৃণা করে; যে স্ত্রী স্বামীকে ছাড়িতে চায়না, তারও লোকে নিন্দা করে। ছি! স্বামী স্বামী করিয়া পাগল হইতেছি কেন? লোকে জানিতে পারিলে বলিবে কি?"

মাঝে মাঝে ইহাও ভাবে, "আমি কেন তাঁহার কাছে পত্র

লিখিয়া জানাইনা যে, আমি তাঁহার কাছে যাইব। লোকেত পরিবার লইয়া বিদেশে থাকে। ছি! লজ্জা করে, তাই কি স্ত্রীলোকে পারে? আর, আমি কলিকাতায় যাইতে চাহিনা; সেখানকার মেয়েমানুষ নাকি পুরুষের হাত ধরিয়া, খোলা রাস্তায় বেড়াইতে যায়। ভাল, আমি তাহাকে দেখিতে চাহিনা; তিনি না হয় দুবৎসর পরে বাড়ী আসিবেন। তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া বাড়ীর নিকটে আসিয়া চাকরী করুন না কেন? যদি কখনও অসুখ বিসুখ হয়, তবে তৎক্ষণাৎই খবর পাইব।"

প্রভার চিন্তা অনন্ত; এই কেবল চিন্তা করিতে শিখিয়াছে! রসালাপ, হাস্য-কৌতুক, প্রণয়-সম্ভাষণে তাহার যে হৃদয় এতদিন পরিপূর্ণ ছিল; আজ তাহা শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। বাহ্য-প্রকৃতির শূন্য-স্থান যেমন বায়ু দ্বারা পরিপূরিত হয়, অন্তঃপ্রকৃতির শূন্য-স্থানও তেমনি চিন্তায় পরিপূরিত করে। প্রভা কিছুতেই হৃদয়কে চিন্তা-শূন্য করিতে পারিতেছে না। যখন অবিরাম চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে তাহার চির-সুখশান্ত কোমল হৃদয় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, তখন যুক্তকরে সজল-নয়নে বলে "পরমেশ্বর! অগতির গতি! নিঃসহায়ের সহায়! যাহার কেহ নাই, তাহার তুমি আছ। দে'খ প্রভু! আমার সোণার চাঁদ, আদরের শিরোভূষণ, গৌরবের স্পর্শ-মণি, অনাথার রত্নভাণ্ডার দূরদেশে শত্রু-দস্যু পরিবেষ্টিত, তুমিই তাহার রক্ষক। আমার হৃদয়-কুসুমের সৌরভ, জীবন-কুটীরের বৈভব, মানস-মন্দিরের প্রতিমা, সুখ-বিলাসের সীমা, কত দূরে; কোথায় রহিল! দেখিও প্রভু!"



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রথম প্রথম কলিকাতার জল বায়ু চারুচন্দ্রের ভালরূপ সহ্য হইল না। তথাকার রীতি নীতি তদপেক্ষা অসহ্য হইল। তিনি দেখিলেন, সে স্থানে থাকা তাঁহার পক্ষে বিশেষ দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইবে। তিনি যাহাদের সঙ্গে পরিচিত হইলেন, তাহারা সকলেই তাঁহার বিবেচনায় ঘোর দুর্নীতি-পরায়ণ, ধর্ম্ম-জ্ঞান-শূন্য। সকলেই জল পানের ন্যায় সুরাপানে অভ্যস্ত। তাঁহার মনিব সুরাপায়ী, মনিবের ইয়ার দল সুরাপায়ী, অন্যান্য কর্ম্মচারিগণও সুরাপায়ী। পথে ঘাটে, উদ্যানে প্রান্তরে, অবিরাম সুরার স্রোত চলিতেছে। গলধঃকরণ শক্তিশালী হইয়া যে মূর্খ সুরাপানে অনিচ্ছুক, তখনকার কালে সে ঘোর অসামাজিক, অভদ্র, অশিক্ষিত। দেবচরিত্র মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় পর্য্যন্ত এ পিশাচীর মায়া হইতে নিষ্কৃতি পান নাই।

চারুচন্দ্র মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, না হয় কলিকাতা ছাড়িব, কিন্তু মদ্য স্পর্শ করিব না। বাবুরা যখন ইয়ারবন্ধু লইয়া বৈঠকখানায় বসিয়া প্রাণ খুলিয়া আমোদ করিতেন, তখন চারুচন্দ্র হয় বেড়াইতে বাহির হইতেন, না হয় আপন নিভৃতকক্ষে বসিয়া

অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর পড়িতেন। সকলেই তাঁহাকে পাড়াগেঁয়ে অসামাজিক চাষা বলিয়া ঘৃণা করিত।

এইরূপে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। সময়ে নূতন পুরাতন হয়; ভূয়োদর্শন ও দীর্ঘ-সংসর্গে অসহ্য সহ্য হইয়া যায়। চারুচন্দ্রের তাহাই হইল। সহরের নবসভ্য সমাজের যে তীব্রনীতি প্রথমে তাঁহার নিকট অসহ্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল, ক্রমে তাহা সহিয়া গেল। মদ্যের তীব্র গন্ধ অপেক্ষাকৃত কোমল হইল। কতদিন লোকে সঙ্গীহীন হইয়া থাকিতে পারে! তিনি ক্রমে সহরবাসী যুবকদলের সহিত মিশিতে লাগিলেন; তাহাদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ, গল্প তামাসা, গান বাদ্য করিতেন; কিন্তু তখনও প্রতিজ্ঞা স্থির ছিল, চরিত্র খোয়াইবেন না।

স্নেহময়ী জননী ও প্রেমময়ী ভার্য্যার বিচ্ছেদে প্রথম প্রথম চারুচন্দ্রের মন সর্ব্বদাই অস্থির থাকিত। কিন্তু বিচ্ছেদ-কষ্ট চিরদিন সমান থাকিলে অনেক হতভাগা জীবন্ত চিতায় পুড়িয়া মরিত। কথায় বলে কোনও বৃদ্ধা যক্ষের কাছে পুত্র বলি দিয়া ধন পাইয়াছিল, কথা মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। অর্থে পুত্র-শোক নিবারণ করে। মুদ্রা-মায়াবিনীর মোহিনী-মায়ায় নিপতিত হইলে মানুষ সমস্ত ভুলিয়া যাইতে পারে। অর্থের মনোমোহন রূপে চারুচন্দ্রের বিচ্ছেদ-দুঃখ লঘু করিয়া দিল। চারুচন্দ্র পূর্ব্বস্মৃতি হৃদয়ের কোণে রাখিয়া অর্থোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিলেন।

অনিবার্য্য অভাব-তাড়িত হইয়া দুর্ব্বিসহ দুঃখ-ভার হৃদয়ে ধরিয়া, পরঋণের দায়ে চারুচন্দ্র সুখময় স্বগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন ভাবিয়াছিলেন, কোনও রূপে পরঋণ শোধ করিতে পারিলে, আর তিল মাত্রও বিদেশে থাকিবেন না। কিন্তু মানব-মনে আশার

নিবৃত্তি কবে হইয়াছে? ভিখারী আজ মুষ্টিমেয় অন্নে পরিতুষ্ট; কিন্তু যাই কোনও দয়ালুর অনুকম্পায় জঠরানল নির্ব্বাপিত হইল, অমনি মনে হইল, পৃষ্ঠে বসন নাই, ভিখারী আবার ছুটিল; অনেক চেষ্টায় বসন মিলিল। তখন মনে হইল, কল্যকার জন্য অদ্য কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। আশা অভাব দেখাইয়া দিয়া অর্জ্জনস্পৃহা পরিস্ফুট করিয়া দিল। ক্রমে ভিখারীর সঞ্চয়ের প্রতি আশক্তি জন্মিল। আজ কপর্দ্দক, কাল একটী মুদ্রা, পরশ্ব দুইটী, ক্রমে সংখ্যা বাড়িতে লাগিল; কিন্তু ভিখারী কিছুতেই চেষ্টায় নিবৃত্ত হইতে পারিল না। আশা আরও চায়। সে ঊর্দ্ধমুখে বদন-ব্যাদন করিয়া বিশ্বগ্রাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে,—মুগ্ধ ভিখারীকে বিষম ঘূর্ণাবর্ত্তে ফেলিয়া দিয়াছে।—তাই বলিয়া আশা মানবের পরিত্যাজ্য নহে। আশাই উন্নতিশিখরে আরোহণ করিবার প্রকৃত সোপান। আশা যে ছাড়িবে, সে ডুবিবে, যে ধরিবে, সে ঘুরিবে। এই আশা হৃদয়ে ধরিয়া, বর্ত্তমান নির্ব্বোধ লেখক, গুণের মুষ্টি-ভিখারী, কত ভাবিয়া লেখনী চালাইতেছে।

চারুচন্দ্র এই আশার সর্ব্ব-বিজয়িনী শক্তিতে পরাজিত হইয়াছেন। ঋণ শোধ হইলেই চাকরী ত্যাগ করিবেন, সে সঙ্কল্প আর তাঁহার নাই। এখন সাধ হইয়াছে, বড় বাড়ী করিতে হইবে, বিলাতী ধরণে গৃহ সাজাইতে হইবে; স্বর্ণ রৌপ্যের আসবাব করিতে হইবে। কিন্তু স্বদেশের স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। যাত্রাকালে জননীর অশ্রু-পরিষিক্ত সেই মুখশ্রী, সেই স্নেহাশঙ্কাময় সাবধান বাক্য, সেই বাৎসল্য-সিন্ধু, করুণাময় হৃদয়ের অকৃত্রিম অপার অতুল স্নেহ-রাশি এখনও চারুচন্দ্রের মানস-পটে প্রদীপ্ত প্রতিফলিত রহিয়াছে। মাধুরী-পুত্তলী ষোড়শী প্রেয়সীর বিচ্ছেদ-পরিক্লান্ত অশ্রু-পরিপ্লাবিত

সেই মুখ-ভঙ্গিমা, সত্বর-সম্মিলনজন্য কম্পিতাধরে অর্দ্ধ-পরিস্ফুট সেই মর্ম্মান্তিক কাতরোক্তি, কোমল-প্রাণার কমল-হৃদয়ের সেই অপরিমেয় প্রেম-সুধা এখনও তাঁহার হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে। এখনও বালেন্দু-প্রভ শিশু পুত্রের মধুর হাসি, সেই নব-কিসলয়-সন্নিভ সুকোমল হস্ত পদ সঞ্চালনপূর্ব্বক জননীর বুকে অবিরাম ক্রীড়া, আনন্দময়ী প্রভাবতীর প্রমোদ-বিহ্বল সেই পুত্র-মুখ চুম্বন, এখনও চারুচন্দ্র ভুলিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে মনে হয়, একবার দেশে গিয়া সব দেখিয়া শুনিয়া আসি। কিন্তু পরাধীন; কর্ত্তৃপক্ষ ছুটি দেন না; যাইবার উপায় নাই। দুর্গোৎ-সবের সময়ে যাইবার কথা ছিল; কিন্তু সে সময়ে আড়তের কাজ-কর্ম্ম অধিক থাকায় যাওয়া হইল না।

এস্থলে বলিয়া রাখি, চারুচন্দ্র এই একবৎসরে ঋণের প্রায় অর্দ্ধাংশ পরিশোধ করিয়াছেন।





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এক বৎসর পরে আবার সুখের ফাল্গুন রূপরসগন্ধস্পর্শ সর্ব্ববিষয়ের মধুরিমা লইয়া জগতে উপস্থিত হইল। বৃক্ষরাজি শ্যামল-কিসলয়-বেশ পরিধান করিয়া, প্রফুল্ল-কুসুম-ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া গৌরবে ধীর-সমীরে দুলিতে লাগিল। লতিকা-সুন্দরী নবরস-ভারে পরিক্লান্তা হইয়া তরুদেহে ঢলিয়া পড়িল। নব-মুকুলিত-চূতদ্রুমে নিবিড়-পত্রান্তরালে বসিয়া কোকিল, পাপিয়া তান ধরিল। চতুর্দ্দিক সৌরভে পরিপূর্ণ। প্রকৃতি রসে টলটলায়মানা। রসিক-প্রাণ পুলকে বিভোর।

অপরাহ্ণ সময়ে চারুচন্দ্র আফিসের কাজ সারিয়া গৃহে আসিয়াছেন। চারুচন্দ্র যে জমিদারের চাকরী করিতেন, তাঁহার বাড়ীতেই তাঁহার বাসা। বৃদ্ধ জমিদার মহাশয় তাঁহার স্বভাব চরিত্র দেখিয়া তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। চারুচন্দ্র আসিয়া নিজ কক্ষে বসিলেন। ভয়ানক গ্রীষ্ম; আফিসের পরিশ্রমে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ছুটিয়াছে। কাপড় ছাড়িয়া, মুখ মুছিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া মুক্ত-বাতায়ন-পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নীরবে চারুচন্দ্র বসিয়া রহিলেন। বাবুদের বাড়ীর সম্মুখে ফটকের কাছে

দুইটী আমগাছ; আমগাছদুটী মুকুলে ঢাকা; পত্রাদি প্রায়ই অদৃশ্য। তার একটীর উপরে একটী কোকিল, থাকিয়া থাকিয়া, মাঝে মাঝে একটু থামিয়া, কু, কুহু, খুঃ, এক "কু" রব নানারঙ্গে সাধিতেছে। কোকিল অন্যের সময় অসময় দেখে না, তাহার ডাকে তোমার মাথা ঘুরিয়া যাক বা প্রাণ শীতল হউক, সে তাহা দেখিবে না; তাহার সময় হইলে সে ডাকিবে। কোকিল পক্ষিজাতীয় নিকৃষ্ট জীব বলিয়া যে, এটী শুধু তাহারই গুণ তাহা নহে! সৃষ্টিপ্রধান মানবজাতিরও এ গুণটীর অভাব নাই। যখন এক গৃহে শোকের উচ্ছ্বাস, তখন অন্য গৃহে গীততরঙ্গ চলিয়া থাকে। তাই বলি, জগতে সহানুভূতি বড় বিরল।

চারুচন্দ্রের কাছে আজ প্রকৃতি বড় নির্দ্দয়। চ্যুত-মুকুলে, কুসুম-সৌরভে, কোকিলের ডাকে, নির্ম্মল-গগনে তাঁহার মনঃপ্রাণ বড় বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিল। তাঁহার কতদিনের কথা মনে পড়িল। চারুবাবু মনে মনে ভাবিলেন, "আমার মত হতভাগা কে? এমন সুখের সময়ে আমি পরের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া এই সুদূর নির্ব্বান্ধব প্রদেশে অহর্নিশ মনের আগুণে জ্বলিতেছি। আজ এক বৎসর পর্য্যন্ত আপন জনের মুখে একটী স্নেহের কথা শুনিতে পাই না। এই সুখের বসন্তে আমার উদ্যানে কত ফুল ফুটিয়াছে; বকুলের ডালে বসিয়া কত কোকিল ডাকিতেছে। প্রভা কি মালা গাঁথিতেছে?—না, সে আমাকে পরাইবার জন্যই মালা গাঁথিত, এখন গাঁথিবে কাহার জন্য? সে কেবল কাঁদিতেছে। কত কাতর হইয়া আমাকে বাড়ী যাইতে পত্র লিখিতেছে। আমি কি নিষ্ঠুর, অবলা সরলা অনন্যশরণা পতি-প্রাণাকে একবার দেখিয়া আসিলাম না। আঃ! এই বসন্তের শুক্লযামিনীতে, গৃহের ছাদে,

উদ্যান-তরুতলে, সরোবরতীরে বসিয়া কত আনন্দের খেলা খেলিতাম, কত রসরঙ্গ ব্যঙ্গালাপ করিতাম, মাঝে মাঝে রঙ্গ করিয়া তাহাকে কাঁদাইতাম; সে মুখটী ভার করিয়া ডাগর ডাগর চক্ষু দুইটী জলে ভাসাইয়া কেমন সুন্দর হইত! তারপর আদর করিয়া যেমন তাহার মুখ-চুম্বন করিতাম, অমনি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিত। প্রভা মালা গাঁথিত, আমি ছিঁড়িয়া ফেলিতাম। সে রাগ করিত, পিঠে চড় মারিত; আমার কাছে কুসুমস্পর্শ-বোধ হইত। আমি যদি রাগ করিয়া মারিতে যাইতাম, প্রভা হাসিয়া কুটিকুটি হইয়া আমার কোলের উপর শুইয়া পড়িত। প্রভা ছেলে কোলে লইয়া, মুখচুম্বন করিয়া বলিত 'ওঁর কোলে যাইওনা।' সুবোধ ছেলে মার কথা শুনিত। আমি কোলে লইবার জন্য যত হাত বাড়াইতাম, ততই সে মায়ের বুকে মিশিয়া থাকিত। ভবচন্দ্র এতদিনে বেশ বড় হইয়াছে, কথা বলিতে শিখিয়াছে, সকলকে ডাকিতে শিখিয়াছে। একবার তাহাদিগকে দেখিতে বড় সাধ হইতেছে। মা না জানি কত কাঁদিতেছেন? আমাকে তিনি দুদণ্ড না দেখিলে সব আঁধার দেখিতেন! মাকে আর কবে দেখিব? ধিক্ পরাধীন জীবনে!

চারুচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন, তাঁহার চক্ষু সন্নিহিত প্রকোষ্ঠের উন্মুক্ত দ্বারদেশে নিপতিত হইল। পলকমাত্র আপনা হইতে চক্ষু দুইটী ফিরিল। কি অপরূপ! একখানি সুগঠিত স্বর্ণ-প্রতিমা নীরব নিশ্চলভাবে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কবাট ধরিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা। পশ্চাতে ঘন-কৃষ্ণ সুচিক্কণ নিতম্বলম্বিত আকুঞ্চিত অবেনীসম্বদ্ধ অলকদাম, তদগ্রে মুখচন্দ্র;—নিবিড় জলদপটে বিদ্যুন্ময়ী প্রতিকৃতি। পলকমাত্র দেখিয়া চারুচন্দ্র চক্ষু

ফিরাইলেন। কেন ফিরাইলেন তাহা তিনিও বুঝিতে পারিলেন না। চক্ষু ফিরাইলেন, কিন্তু ফিরাইয়া রাখিতে পারিলেন না। আবার চাহিলেন; দেখিলেন ঈষৎ কুঞ্চিত সুগঠিত ভ্রূযুগ-নিম্নে দুইটী অতুলনীয় সুবিস্তৃত কৃষ্ণতার রসোদ্ভাসিত নয়ন, ঈষৎ বঙ্কিম-ভাবে তৎপ্রতি সন্নিবেশিত। এবার এক পলক, দুই পলক, তিন পলক চাহিলেন। সর্ব্বনাশ! সে নয়নে কটাক্ষ খেলিল। আবার চারুচন্দ্র চক্ষু ফিরাইলেন। সর্পের ফণা ভীষণ, তবুও একবার দেখিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। যাহা আশ্চর্য্য, পুনঃ পুনঃ তাহা দেখিতে ইচ্ছা করে। চারুচন্দ্র আবার চাহিলেন। দেখিলেন সে মুখ এখনও আছে। তিনি এবার স্থিরনয়নে দেখিলেন। সে মুখ এবার নড়িল, রসললিত-রক্তাধর ঈষদ্-প্রোদ্ভিন্ন করিয়া মুক্তাপাতি-দন্তশ্রেণী ঈষদ্ পরিদৃষ্ট হইল। তারপর বামহস্তের অঙ্গুলি-প্রয়োগে ললাটবিলম্বিত অলকগুচ্ছ ধীরে কর্ণোপরি সন্নিবেশিত করিয়া, চকিত-সৌদামিনীবৎ রমণী অন্তর্হিত হইল; দুই একবার মৃদু সিঞ্জনধ্বনি শ্রুত হইল।

রমণী অন্তর্হিত হইল, কিন্তু চারুচন্দ্রের চক্ষু সেই দ্বারদেশেই সন্নিবেশিত রহিল। তিনি যেন বড় বিস্মিত, বড় বিমোহিত হই-লেন। নীরবে নিস্পন্দ-নেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তার পর ডাকিলেন, 'ঝি! ও ঝি! একটু ভাল জল দিয়ে যাওত!' পূর্ব্বেই তাঁহার পিপাসা পাইয়াছিল, মন নানাবিধ চিন্তাবিষ্ট থাকাতে জল চাহিবার অবসর ছিল না। চিন্তা-প্রভাবে কোনও কোনও প্রকৃতিস্থ মানব আহারের সময় আহার করিতে ভুলিয়া যাইয়া থাকেন।

চারুচন্দ্র জল চাহিলেন; কিন্তু তাঁহাকে কেহ জল দিয়া গেল-

না। তিনি কখন্ পিপাসার্ত্ত হন, এই চিন্তা করিয়া সর্ব্বদা পানীয় লইয়া বসিয়া থাকিবার তাঁহার সেস্থানে কেহ ছিল না। ঝি কার্য্যান্তরে অন্যত্র ছিল। তাহার ডাক শুনিতে পায় নাই, বা শুনিয়াও মনোযোগ করে নাই। প্রবল পিপাসা, তিনি আবার ডাকিলেন, 'গদাধর, এক গ্লাস জল নিয়ে এসত!' ভৃত্য গদাধরও সেস্থানে ছিল না। চারুচন্দ্রের পিপাসার জল মিলিল না। নীরবে তিনি বসিয়া রহিলেন।

কতক্ষণ পরে পশ্চাতে দ্বারে ঘা পড়িল; সে আঘাত-শব্দের সঙ্গে মৃদুমধুর সিঞ্জনধ্বনি! চারুচন্দ্র চকিত হইয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিলেন, 'কে ও!' অতি ধীরে, কোমলভাবে, স্নেহের কণ্ঠে উত্তর হইল, 'জল নিন'। ব্যস্ত হইয়া চারুচন্দ্র দ্বার খুলিলেন। আশ্চর্য্য! কে এ! নির্ব্বান্ধব প্রবাসী চারুচন্দ্রের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, স্বর্গ হইতে কোনও করুণাময়ী বিদ্যাধরী কি তাঁহার পিপাসার জল দিতে আসিয়াছেন। সুধু জল নয়; সেই কুসুম-সুকোমল করতলে মিষ্টান্নপাত্র। রমণী মিষ্টান্নপাত্র ও জলের গ্লাস ভূমিতে রাখিয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। চারুচন্দ্র নির্নিমেষ নয়নে রমণীর প্রতি কতক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। সে রাশীকৃত কুন্তলরাজি এবার বিলম্বিত নয়, বেণীবদ্ধও নয়,—একটু আঁটাগোজা, লোল-বন্ধনে পৃষ্ঠস্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। রমণীর সর্ব্বাঙ্গে রত্নকাঞ্চনের বিবিধ ভূষণ। বয়ঃ-কৌমার্য্যে, গঠন-বৈচিত্র্যে, অঙ্গসৌষ্ঠবে, বর্ণ-প্রতিভাতিতে, অলঙ্কার-প্রাচুর্য্যে যুবতী স্রষ্টার সৌন্দর্য্যসৃষ্টির শীর্ষস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চারুচন্দ্র বিমুগ্ধ হইলেন, বিস্মিতও হইলেন।—বিস্মিত হইলেন, কেন না, অষ্টাদশবর্ষীয়া অপরিচিতা যুবতী অনবনত-মস্তকে বিস্ফারিত-নেত্রে

কটাক্ষ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। ভাবিলেন, সহর-বাসিনীরা, পল্লীবাসিনীর ন্যায় লজ্জিতা নয়। কিন্তু এতটা ভালনয়।

চারুবাবু কথা বলিলেন না; কিন্তু যুবতী আর অপেক্ষা করিলেন না; বলিলেন, 'বড় পরিশ্রান্ত হ'য়েছেন, কিছু একটু মুখে দিয়ে জল খান।'

চারুচন্দ্র ধীরে সলজ্জে বলিলেন, 'আপনি কেন এত করিতেছেন? ঝি চাকরগুলি কোথায় র'য়েছে?'

ঈষৎ হাসিয়া রমণী বলিলেন, 'আমি যে দাসী নই তাহা কি ক'রে চিনিলেন? আমাকে ত আপনি কখন দেখেন নাই।'

সাবাস! আবার ব্যঙ্গ! ঐ অধরে এহেন কুসুম-হাসি ফুটাইয়া, ঐ কণ্ঠে এমন সময়ে ব্যঙ্গ? কামিনী! তুমি নরহত্যা করিতে পার। চারুচন্দ্র কেমন হইয়া গেলেন, মনে মনে ভাবিলেন, সুন্দরীর কথায় উত্তর দেন, 'তোমার রূপ দেখিয়া চিনিয়াছি তুমি দাসী নও।' কিন্তু মুখে কথা ফুটিল না। তিনি নবীন-যুবক, সবে এই একবৎসর মাত্র সংসার-পথে পা দিয়াছেন; এমন সময়ে কথা বলিবার ক্ষমতা তাঁহার এখনও জন্মে নাই।

কথাটীমাত্র না বলিয়া চারুচন্দ্র মিষ্টান্নপাত্র সম্মুখে টানিয়া মাথা নিচু করিয়া কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন মুখে দিলেন। রমণী আর অপেক্ষা না করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যাইবার সময় চারুচন্দ্র আর একবার তাহার প্রতি চাহিলেন। দেখিলেন, সুন্দরী মুখ টিপিয়া অল্প অল্প হাসিতেছে।

সংক্ষেপে চারুচন্দ্র জলযোগ সমাপন করিলেন। তার পর মনে-মনে বড় অস্থির হইলেন। গৃহে থাকা দায় হইল। অকস্মাৎ তাঁহার প্রশান্ত হৃদয়ক্ষেত্রে যেন ধীরে ধীরে দুই একটী বায়ুপ্রবাহ উঠিয়া

মনঃপ্রাণ বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি ভ্রমণোপযোগী বেশভূষা করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। মনে মনে পঠিত-গ্রন্থ হইতে একটী কবিতা আবৃত্তি করিলেন।—

"ধরা মাঝে ধন্য সেই জন,
যার কণ্ঠে শোভে হেন অমূল্যরতন॥"





সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চারুচন্দ্র গৃহ পরিত্যাগ করিয়া রাজপথ ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে; সহর অল্প অল্প অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। চারুচন্দ্র বেড়াইতেছেন, কিন্তু মন চিন্তাকুল, অনিবার্য্য কৌতূহলে বিচলিত। তিনি ভাবিতেছেন, 'এ রমণী কে? জগতে এমন সুন্দরী দুর্ল্লভ।'

ছি চারুচন্দ্র! তুমি ভদ্র, সুশীল, সুশিক্ষিত যুবক! অপরিচিতা যুবতীর পরিচয়ে তোমার প্রয়োজন কি?

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রবাসে চারুচন্দ্রের কয়েকজন বন্ধু জুটিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যাঁহার সঙ্গে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠতা তাঁহার নাম রামচরণ। রামচরণ বাবুর বাড়ীর সরকার। চারুবাবু অপেক্ষা বয়সে চারি পাঁচ বৎসরের বড়। ইহার সঙ্গে চারুবাবুর ঘনিষ্ঠতার বিশেষ কারণ আছে। চারুবাবুর ন্যায় রামবাবুর বাড়ী পূর্ব্বদেশে—চারুবাবুর স্বগ্রামবাসী না হইলেও একই জেলায়। যেখানে পরিচিত একজন মাত্রও নাই সেখানে রামবাবুই তাহার পরিচিত। উভয়ে একস্থানে থাকেন। রামবাবু ভাল ইংরাজি জানিতেন, চারুচন্দ্র ইংরাজিতে তত শিক্ষিত ছিলেন না। রাম-

বাবুর সাহায্যে তিনি এই কয়েকবৎসরে ইংরাজীভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। এখন তিনি সুন্দররূপে ইংরাজী লিখিতে ও বলিতে পারেন। এবিষয়ে রামবাবু তাঁহার শিক্ষক। আর চারুবাবুর বিশ্বাস ছিল, রামবাবু তাঁহাকে বিশেষ ভালবাসেন। মনের কথা বলিতে হইলে তিনি রামবাবু ভিন্ন অন্য কাহাকেও বলিতেন না। পথে যাইতে যাইতে তিনি রামবাবুকেই খুঁজিতেছিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই রামবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। চারুবাবু আশ্বস্ত ও প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন, 'কি ভাই! কোথা ছিলে? তোমার কথাই ভাবিতেছিলাম।'

রামবাবু সুন্দর একটু হাসিয়া বলিলেন, "হতভাগা রামচরণের এমন কি শুভাদৃষ্ট যে মহাশয়ের মত উচ্চাশয় ব্যক্তি আমার অনুসন্ধান করিবেন? আমাদের প্রতি মহাশয়দিগের এতাদৃশ সম্ভাষণ আমাদের পক্ষে উপহাসস্করও বটে, গৌরবেরও বটে।"

চারু। ভাল ভাল, দিব্য বক্তা যে! এত সভাস্থল নয়?

রামবাবুর আমোদ খুব বাড়িল; ভাবিলেন, আমি খুব ভাল বলিয়াছি। তিনি যে একজন সুদক্ষ বক্তা তাহা তাঁহার নিকট চির-প্রসিদ্ধ ছিল। এ বিশ্বাসে তিনি দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক-সমিতিতে মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিয়া আপন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া ধন্য হইতেন। তখন মহানগরী কলিকাতায় সভাসমিতি, বক্তৃতা-বাগ্‌যুদ্ধের ধূম পড়িয়াছে। পথে পথে, ঘরে ঘরে, শ্বেতাঙ্গ মিশনারীগণ ও তদাশ্রিত কতিপয় শিক্ষিত মহাত্মা বঙ্গকুলতিলক নিঃস্বার্থভাবে কুসংস্কার-তমসাচ্ছন্ন ভারতভূমিতে পাশ্চাত্য-ধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিতরিত করিবার জন্য, ভারতীয় শাস্ত্রকার অজ্ঞ ঋষি-

দিগকে অজস্র গালির স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন, কেবল খ্রীষ্টের উপাসনাতেই মুক্তি। খাদ্যের প্রভেদ করিয়া, জাতির প্রভেদ করিয়া মুক্তি পাইবার আশা দুরাশা মাত্র। ইহারই মধ্যে মহাত্মা রামমোহন রায়ের কতিপয় অনুচর সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের সংস্কার ও রক্ষার্থে প্রাণপণে যত্ন করিতেছিলেন। বলিতে কি, ভারতের সেই ঘোর বিপ্লব-দুর্দ্দিনে যদি মহাত্মা রামমোহনের আবির্ভাব না হইত, তবে বোধ হয় হিন্দু ধর্ম্ম-রাজ্য অন্যরূপ ধারণ করিত। মধ্যে মধ্যে দুই একটী হিন্দুধর্ম্ম-সংরক্ষণী সভাও প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমাদের রামবাবু ইহার কোন্ সভার অন্তর্ভুক্ত তাহা আমরা জানিনা। সকল সভাতেই তাঁহার অল্পাধিক পরিমাণে গতিবিধি ছিল।

চারুচন্দ্র রামবাবুর বক্তৃতার কথা তুলিলেন দেখিয়া, তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "এ আর অধিক কি বলিয়াছি? এখনওত বক্তৃতার কিছু বলি নাই; তাতেই এত প্রশংসা! একবার ভাল করিয়া প্রাণ মন খুলিয়া বলি না কেন?" প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমি ভাই চিরদিন উপহাসাস্পদ হইয়াই আছি। আমি বিহীন-পদ হীনশক্তি বামন; বক্তৃতার উত্তুঙ্গ-গিরিশিখরে সমারোহণ করিবার সামর্থ্য আমার কোথায়? রেণুমেয় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটাণু হইয়া পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিবার প্রত্যাশা করা দুর্ব্বুদ্ধিতার দুরাশা! শ্বেতাব্জাসনা শুভ্রবসনা পতিতপাবনী বীণাপাণি বাগ্দেবীর অনুকম্পা ব্যতিরেকে বক্তৃতারূপ অমৃত লাভের আশা কি?"

চারুচন্দ্র বক্তৃতা শুনিতে আসেন নাই। মনে মনে একটু বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, "ভাই ওসব সভায় গিয়া প্রকাশ করিও। এখন কেন?"

রামবাবু এটি চারুচন্দ্রের পল্লিবাস-সুলভ অসভ্যতার পরিচয় বুঝিয়া লইলেন। ভাবিলেন, পাড়াগেঁয়ে ভূত, বক্তৃতার কি বুঝিবে? মনে মনে একটু চটিলেন। কিন্তু চারুচন্দ্রকে কিছু বলিতে পারিলেন না। কারণ তিনি উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী, বাবুরা তাঁহাকে বড় ভালবাসেন। চারুচন্দ্রের প্রতি রামবাবুর যে এতটা ভাব, তাহারও প্রধান কারণ চারুচন্দ্রের উচ্চপদ। তিনি একদিন তাঁহার আর আর বন্ধুর সঙ্গে কথোপকথনচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমরা এতকালের কর্ম্মচারী; তবু কিছুমাত্র উন্নতি নাই; চারুচন্দ্র দুদিন আসিয়া একবারে আড়তের ম্যানেজার হইলেন। লেখাপড়ায় এখনও ওকে দুবছর পড়াইতে পারি।" যাহা হউক, রামবাবু মুখে বিরক্তির ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ! ভায়া কোথায় যাচ্ছিলে? দেখদেখি আজ প্রকৃতির কি অপূর্ব্ব শোভা! আঃ! কি মনোহর! কি মানস-মোহন!! কি হৃদয়পদ্ম-প্রফুল্লকারী!!! সুধীর, সুশান্ত, সুশীতল, সুস্নিগ্ধ মলয়-সমীরণ কেমন ধীরে ধীরে, অতি ধীরে প্রবাহিত হইয়া পত্র-সুন্দরীদিগকে নাচাইতেছে। আহা যিনি এই অনন্ত প্রকৃতির অনন্ত ক্রীড়া অনন্ত কাল ধরিয়া অনন্ত সৃষ্টি করিতেছেন, সেই পূত কিম্ভূত অনন্ত মহাপুরুষের অনন্ত শক্তির কি অন্ত পাওয়া যায়?

চারু। আর এই শান্ত বসন্তের বাতাসে কি বিরহী জীবন্ত থাকে?

রাম। বাস্! দাদা, তুমিওত বেশ বক্তৃতা দিতে শিখেছ। না হবে কেন? কল্‌কাতায় দুদিন থাক্‌লে চো'ক ফোটে।

চারু। দেখ রামবাবু, আজ শরীরটায় কেমন অসুখ অসুখ বোধ হ'চ্ছে!

রাম। শরীরটা না মনটা। তাত হবারই কথা। সময়ের নিত্যাবর্ত্তনে নর-হৃদয় নিরন্তর রূপান্তরিত হইতেছে। দেখ, তুমি এই সুনূতন যুবক পুরুষ, গৃহে ষোড়শী রূপসী প্রেয়সী পূর্ণশশী কামিনীকে রাখিয়া প্রবাসে আসিয়াছ। এমন সুখের বসন্তে মন কি স্থির থাকে?

চারু। যাক্, দেখ একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস্ ক'র্‌ব, মনে কচ্ছি। তবে ভাব্‌ছি, তুমি না জানি কি ভাব?

রাম। ছি! ভাব্‌ছ কি? আমায় বল্‌তে তোমার ভাব্‌তে হয়? তবে তুমি প্রকৃত বন্ধুতা জান না। True friendshipএর ন্যায় জগতে কি আর সুখ আছে?

চারু। না না, তোমায় বল্‌তে কোনও ভাবনা নাই। তবে কথাটা কি, তুমি সর্ব্বদাই বাবুদের বাড়ীতে থাক, বাড়ীর সমস্ত খবর রাখ।

রাম। তাত নিশ্চয়ই, Creek and corner!

চারু। বল দেখি এ বাড়ীতে একটী সতের আঠার বৎসরের পরীর মত সুন্দরী মেয়ে কে আছে?

রাম। হোঃ! হোঃ! খুব সুন্দরী?

চারু। অমন সুন্দরী বড় দেখা যায় না।

রাম। ওঃ! That most beautiful lady! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। বোধ হয় আমাদের বাবুর ভাগিনেয়ীটী তোমার চ'কে পড়েছেন। উনি আজ কতকদিন বাবুদের দেশের বাড়ীতে ছিলেন; সদ্যই কল্‌কাতায় এসেছেন। যথার্থ বলেছ ভাই, এমন সুন্দরী রমণী এ সহরে, এমন কি, বোধ হয় এ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। দেখ্‌লে মহর্ষিরাও মূর্চ্ছা যান।

চারু। দেখিও তুমি যেন মূর্চ্ছা না যাও।

রাম। বাস্তবিক, সে রূপটী মনে হ'লে যেন আত্মহারা হ'য়ে পড়ি। কিন্তু বিধাতার কি নির্দ্দয়তা! এমন মধুময় অম্লান-কুসুম বিফলে শুকাইল।

চারু। কেন? মেয়েটী কি বিধবা?

রাম। আহা! ওর দুঃখের কথা মনে হ'লে প্রাণের অন্তঃস্থলে অনন্ত বজ্র-নির্ঘাত হয়। অবলা, সরলা, বিকলা, কোমলা রমণী;—আমরা স্বার্থপর, প্রবঞ্চক, প্রতারক, নির্দ্দয় পুরুষজাতি তাহাদের সুখ দুঃখের কর্ত্তা; আমরা তাহাদের প্রতি কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকি! ধিক্ আমাদের পুরুষত্বে! ধিক্ আমাদের গৌরবে!

চারু। আঃ।—বিষয়টা কি বলনা!

রাম। বিষয়টা কি ব'লব? এমন সুন্দরী, সুন্দরী বল্‌তে সুন্দরী যেন বিদ্যাধরী, মেয়েটীকে একটা গণ্ডমূর্খের হাতে দিয়েছে। মেয়েটা একরকম বিয়ের রাত্রিতেই বিধবা হ'য়ে রয়েছে। তোমার আমার ন্যায় রসিক পুরুষের হাতে না পড়িলে কি এমন রত্নের আদর থাকে?

বলিয়া রামবাবু সে রমণীর স্বামীর রূপগুণের নিন্দা, সমাজের নিন্দা, স্বামী পছন্দমত না হইলে স্ত্রী কেন অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে না প্রভৃতি নানা বিষয়ের তর্ক আরম্ভ করিলেন।

চারুবাবুর অতটা ভাল লাগিল না। রামবাবুর যুক্তিতর্কে বাধা দিয়া বলিলেন, "এর স্বামী থাকে কোথায়?"

রাম। সে বানর, রত্নের মর্ম্ম বুঝবে কি? পেটের ভাতে বেগুণ পোড়ে, তার মানের ভারে পথ দেখ্‌তে পান না। মেয়েটার

পিতৃকুলে কেউ নাই ; কুলীনের মেয়ে। আমাদের বাবু কুলীনের ছেলে দেখে ভাগিনেয়ীর বিবাহ দিয়াছিলেন, তার পর ছেলেটাকে বল্লেন, "বাপু! তোমার অবস্থা ভাল নয়। বাড়ীতে থেকে কষ্ট পাবে কেন? এইখানেই থাক।" বাবু তাতে চ'টে আগুণ। কি? ঘরজামাই থাক্‌ব? রাগে গর্ গর্ করে মেয়েটাকে বল্লেন, তুমি যদি আমার সঙ্গে যাওত চল, নচেৎ এই পর্য্যন্ত দেখা শুনা। মেয়েটা বোকা নয়। স্বামীর সঙ্গে গিয়ে কি না খেয়ে মর্‌বে? যাইতে চাহিলনা। জামাই বাবু সেই রাগ ক'রে চলে গেছেন; আর দেখা সাক্ষাৎ নাই। আমার হ'লে, আমি আহারনিদ্রা, মানাপমান ত্যাগ ক'রে ঐ যুগল আল্‌তা-পরা পাদপদ্মে চিরকাল দাস হ'য়ে থাকি। তা আমার ত তেমন ভাগ্য নয়। দেখ তোমার যদি ভাগ্য প্রসন্ন হয়।

চারু। ছি! আমি কি তেমন অধম? সে সুন্দরী হউক আর নাই হউক, তাহাতে আমার কি? আমি সৌন্দর্য্যের অধিপতি।

রাম। অতুল ধন-রত্নের অধীশ্বর হইলেও, একটী নূতন রত্ন দেখ্‌লে, তাহা পাইবার ইচ্ছা জন্মে। ভাই, মেয়েটী দিব্য লিখ্‌তে পড়্‌তে জানে। কত নভেল নাটক পড়েছে। ফুল তুলে প্রত্যহ সুন্দর সুন্দর মালা গাঁথে, কিন্তু পরে কে?

"যাক্, ও কথা রেখে দাও" বলিয়া চারুচন্দ্র একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। রামবাবু কিন্তু নাছোড়। তাঁহার ভাবের ফোয়ারা খুলিয়াছে। তিনি অতি দীর্ঘ সরস বক্তৃতাজাল বিস্তার করিয়া সুন্দরীর রূপযৌবনের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুই একটা বিদ্যাসুন্দরের শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

এই স্থানে আমরা রামবাবুর একটু বিশেষ পরিচয় দিয়া রাখিব। ইনি একজন আশ্চর্য্য প্রকৃতির লোক। যাঁহারা আজীবন তাঁহার সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাও তাঁহার চরিত্র সর্ব্বাংশে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার অশেষ ক্ষমতা। প্রধান ক্ষমতা তিনি মানুষ চিনিয়া চলিতে পারেন। যে যে ভাবের লোক, তাহার সঙ্গে সেইভাব দেখাইয়া তিনি লোককে বশীভূত করিতে পারেন; কিন্তু আপনি বড় কাহাকেও ধরা দেন না। তিনি যাঁহার পরম শত্রু.. তিনিও, তাঁহাকে মিত্র বিবেচনা না করিয়া পারেন না। এই সর্ব্ব-জন-মোহিনী কুটিলতাটুকুই রামবাবুর প্রধান জীবনোপায়। তিনি কুড়ি টাকা বেতনের বাজার সরকার মাত্র! কিন্তু তাঁহার বেশভূষা, চাল চলন বড় বড় বাবুদের অপেক্ষা কোনও অংশে হীন ছিল না। সহরের অনেক বড় বড় বাবুর সঙ্গে রামবাবুর বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল; তিনি তাঁহাদিগের পান করিবার মদ্য, বেড়াইতে যাইবার গাড়ী, পার্টি বসাইবার আসবাব যথাসময়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে আয়োজন করিয়া দিতে পারিতেন। এ সমস্ত কার্য্যে তাঁহার মত দক্ষ লোক সহরে অতি বিরল ছিল। সকলে সন্তুষ্ট হইয়া, কেহবা তাঁহাকে একখানি সখের ছড়ি, কেহবা একটী ঘড়ি, কেহবা একটী জামা, কেহবা একশিশি ল্যাভেণ্ডার উপহার দিতেন। রামবাবু স্বাধীন প্রকৃতির লোক; পরের দান গ্রহণ করিতেন না; তবে বন্ধুদিগের উপহার গ্রহণ করিলে পরদানের নীচতা স্বীকার করিতে হয় না, না লওয়াই বরং সঙ্কীর্ণমনার কার্য্য; তাই লইতেন। সরকারের টাকা তিনি কখনও আপনার কার্য্যে ব্যয় করিতেন না; কিন্তু বাবুদের বাড়ীর ঝি চাকরেরা সর্ব্বদাই বলিত, সরকার মহাশয় এক পয়সা দিয়া দুই পয়সার ফরমাস দেন; না পাইলে মাহিনা থেকে কেটে নেন।

চারিটী বিষয় লইয়া রামবাবু গর্ব্বিত ছিলেন। প্রথমতঃ তিনি বড় সুরসিক ও সুবক্তা। রসের আলাপে ও ভাবের কবিতায় তাঁহার মত কেহ কথনও জগতে জন্মিয়াছে বা জন্মিবে, তাহা তাঁহার মনে বিশ্বাস হইত না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সহিত অনেক বড় বড় লোকের পরিচয় ও বন্ধুতা। অনেক বড় বড় বাবু তাঁহাকে বিশেষ বিশ্বাস করিয়া, বাজার করিতে অথবা গাড়ীভাড়া করিতে দশ পাঁচ টাকা বিনা সাক্ষীতে দিতে সঙ্কোচ করিতেন না। তৃতীয়তঃ তিনি "স্ব নামে পুরুষ ধন্য।" বালককালে পাড়াগাঁয়ের গৃহ ত্যাগ করিয়া, কলিকাতার ন্যায় বড় সহরে এত সম্মানে কাল কাটাইতেছেন। তাহার স্বগ্রামবাসী সকলেই এখনও পাড়াগেঁয়ে ভূত, অসভ্য-গোঁয়ার রহিয়াছে। তিনি কেমন সুসভ্য ও সুশিক্ষিত হইয়াছেন। চতুর্থতঃ তাঁহার চক্ষে তিনি একজন বিশেষ সুপুরুষ সুন্দর যুবক।

আমরা রামবাবুর চতুর্থ গৌরব-স্থল রূপের কিছু ব্যাখ্যা করিয়া এ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিব। রামবাবু গৌরবর্ণ বটে; কিন্তু সে গৌরবর্ণ যদি বর্ণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়, যদি সৌন্দর্য্যের বিজ্ঞাপক হয়, তবে আমাদিগকে নিতান্ত বর্ণ-জ্ঞান-শূন্য অপদার্থ অগুণ-গ্রাহী বিবেচনা করিবেন। কেননা কোনও সুন্দর বস্তু দেখিলে মনে যে ভাবের উদয় হয়, রামবাবুকে দেখিয়া আমাদের মনে কখনও তেমন ভাবের উদয় হয় নাই। তাঁহার শরীরের হরিদ্রাবর্ণ দেখিয়া আমাদের বারোয়ারিতলার সেই গুলিখোর প্রতিমাটীকে মনে পড়িত। তাঁহার দৈহিক দৈর্ঘ্য অন্ততঃ চারিহাত হইবে। কিন্তু কি জানি কি কারণে মাংস-পরিমাণ হ্রাস হওয়াতে দেহ-যষ্টিখানি কেমন বেমানান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রামবাবু কিন্তু সর্ব্বদা বলিতেন, অনর্থক মাংসের ভার বহন করা পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল।

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের পরিদৃশ্যমান শিরাসকল দেখিয়া তিনি মনে মনে ভাবিতেন যে, সহকার-দেহে স্বর্ণ-লতার ন্যায় সমুন্নত শিরালতা-সমূহ তাঁহার দিব্যদেহ-তরুকে বিশেষ সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে। রামবাবু তাঁহার এ হেন বরবপুর সৌষ্ঠব-সাধন করিতে সাধ্যমত ক্রটী করিতেন না। মস্তকের চুলগুলি সংখ্যায় বিশেষ অল্প হইলেও, সর্ব্বদা সুচারু টেড়িতে সুবিন্যস্ত ও সুগন্ধ তৈলে সুরভিত থাকিত। মুখখানি একটু ছোট, কপোল দুটী কিছু নিম্ন; তাহাতে অনেক-গুলি স্ফোটক-চিহ্ন ফুল ফুটিয়া আছে। শ্মশ্রুরাজির বিরলতা বশতঃই হউক অথবা অজাত-শ্মশ্রু নবীন কিশোর সাজিবার জন্যই হউক, রামবাবু সেগুলি সপ্তাহে দুইবার করিয়া পরিষ্কার করিতেন। গুম্ফরেখা একটু মৃত্তিকাভ ও পরিমাণে অল্প হইলেও, তাহাতে তাঁহার মুখের অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধিত করিতে তিনি অবহেলা করিতেন না। রামবাবুর বয়সের পরিমাণ আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিব না। তিনি বলেন বৎসর পঁচিশ হইবে। লোকে বলে তাঁহাকে বহুদিন পর্য্যন্ত ঐরূপই দেখা যাইতেছে।

চারুচন্দ্র রামচরণকে বিদায় দিয়া আস্তে আস্তে গৃহে চলিলেন। তাঁহার মনে অবিরাম রামচরণের সেই কথাটী বাজিতে লাগিল।—"এমন মধুময় অম্লান-কুসুম বিফলে শুকাইল!" সত্য সত্যই কি বিফলে শুকাইল? রামচরণ ঠিক বলিয়াছে; আমি তাহার সেই সুন্দর মুখটীতে একটু বিষাদের ছায়াও বুঝি দেখিয়াছি। আহা! জগতে কি করুণা নাই? রূপ গুণের আদর নাই! বিধাতার এ কেমন সুবিচার!

চারুচন্দ্র এমন কত কি ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গেলেন। অন্তরে প্রবল সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল।



অষ্টম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণপক্ষের ঘোর যামিনী; রাশীকৃত অন্ধকারে জগৎ আবৃত রহিয়াছে। মেঘ-নির্ম্মুক্ত নীলাম্বরে অসংখ্য তারকারাজি সমুদিত হইয়া সে নিবিড় অন্ধকারে অতি অল্প অস্পষ্ট আলোক বিতরণ করিতেছে। তৎসাহায্যে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষগণ এই অনন্ত অন্ধকার-সমুদ্র মধ্যে সমধিক নিবিড় অন্ধকার-পিণ্ডবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। অসংখ্য খদ্যোত-মালা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া, কোথাও বৃক্ষপত্রে, কোথাও দুর্ব্বাদলে, কোথাও শূন্য-মার্গে বিচূর্ণিত হীরক-খণ্ডবৎ থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিতেছে। এই সকল লঘুপ্রাণ ক্ষুদ্র কীট ধরণীর প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু;—স্বার্থপর, নীচাশয় কপট-মিত্রের ন্যায়, ইহারা বসুন্ধরার চন্দ্রিকা-সমুজ্জ্বল সৌভাগ্য-সময়ে তাঁহার কোলে তত বিচরণ করে না, কিন্তু যখন নিশানাথ বসুমতী'পরে রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অগাধ-তিমির-গর্ভে নিক্ষেপ করেন, সেই দুর্দ্দিনেই এই সকল ক্ষুদ্র কীট দলে দলে বুক বাঁধিয়া তাঁহার অন্ধকার-রাশি বিদূরিত করিতে চেষ্টা করে। ধরণীও অকৃতজ্ঞা নন, টুপ্ টুপ্ অবিরল শিশিরাশ্রুপাত করিয়া, দুর্দ্দিনের এই সামান্য উপকারে কত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

রজনী দ্বিপ্রহর,—অতি গভীর; কোথাও বিন্দুমাত্র সাড়া শব্দ

নাই। কেবল দূরবর্ত্তিনী নদীবক্ষে দুই একটী ক্ষেপণী-সন্তাড়ন-শব্দ, দুই একবার নাবিকদিগের সঙ্গীত-ধ্বনি, অথবা কৃষক বালক-দিগের বংশীস্বর ভিন্ন অন্য কিছু শোনা যাইতেছে না। ঝিঁঝির ঝাঁঝাঁ, পত্র-পতনের মর্‌মর্‌, তাল-পত্রের তর্‌তর্‌, পলায়িত পশুর সড়্‌সড়্‌ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শব্দ আছে; কিন্তু বিশেষ মনোযোগ না করিলে সেগুলি বড় অনুভূত হয় না।

এমন সময়ে একজন লোক দেবগ্রামের পথে বড় ব্যস্ত হইয়া চলিতেছে। অন্ধকারে তাহার আকার প্রকার কিছুই লক্ষিত হয় না; গতির দ্রুততা দেখিয়া প্রতীত হইল লোকটী পুরুষ। পশ্চিম-দিক হইতে বরাবর পূর্ব্বদিকে গিয়া পথিক গ্রামের মধ্যে ঢুকিল। তারপর একটী ক্ষুদ্র গৃহের দাওয়ায় উঠিয়া দ্বারের কাছে গিয়া হাপাইতে হাপাইতে অনুচ্চ অথচ ভাঙ্গা গলায় গম্ভীর স্বরে ডাকিল, "ওগো! ঘুমিয়েছ কি? দরজাটা খোলত।"

সৌভাগ্যক্রমে সে ঘরে কোনও শিশু নিদ্রিত ছিল না; নচেৎ সে অস্বাভাবিক স্বরে নিশ্চয়ই চমকিত হইয়া কাঁদিয়া পাড়া জাগা-ইত। পথিকের কথায় কেহ উত্তর করিল না দেখিয়া সে দরজায় অল্প আঘাত করিয়া একটু উচ্চস্বরে আবার ডাকিল, "ওগো বড় ঠাক্‌রুণ! বলি ঘরে আছ কি?"

তখন ঘর হইতে নিদ্রালস জড়িতস্বরে উত্তর হইল, "কেগা? দুপুর রাতে এমন ষাঁড়ের মত গেঁঙাচ্ছে?"

পথিক। একবার দরজাটা খুলে দেখনা?

তখন গৃহ হইতে বেশ পরিষ্কার স্বরে উত্তর হইল, 'কে? নায়েব ম'শায় না? তা এত রাতে কি মনে করে? আমার বুকটা এখনও ধড়াশ ধড়াশ কচ্ছে।

পথিক। দরজার বাইরে পরিচয়টা না নিলে? একবার দরজাটা খুলে দেখনা? না ঘরে প্রবেশ নিষেধ আছে?

"আচ্ছা! একটু দাঁড়াও, আলোটা জ্বেলে নি" বলিয়া গৃহস্থ-ব্যক্তি আলো জালিতে লাগিল। পথিক বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছিল; ততক্ষণ দাওয়ার উপর দরজার কাছে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরে ঘরে আলো জ্বলিল। থট্ থট্ থটাং করিয়া দ্বারের কপাটদ্বয় বিশেষ আড়ম্বরে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইল। প্রজ্বলিত প্রদীপ হস্তে একটী আললাট-অবগুণ্ঠনবতী রমণী দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া বলিল, "এস! এত রাত্রেতে যে মনে পড়িল। কি সুপ্রভাত! ছাগলের বাসার হাতীর পা!"

তখন সেই ঘোর কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারের মত একটী বিশাল দেহ-পিণ্ড হেলিতে দুলিতে একটু গম্ভীর সরস মুখভঙ্গিতে, রঙ্গিল পদ-বিক্ষেপে, গৃহে উঠিয়া দাঁড়াইল। গৃহে প্রবেশ করিবার সময়ে কপাট দুটী একটু বাধা জন্মাইল বলিয়া, রমণী তাহাদিগকে একটু টানিয়া ধরিল। পথিক গৃহে উঠিয়া হাপ্ ছাড়িলেন, তারপর বলিলেন, "মরি মরি, রসের নাগরী, রসের পিয়ারী হে। হাঃ! হাঃ!" অপূর্ব্ব হাস্যে আগন্তুকের মুখগহ্বর বিকট ব্যাদিত হইল।

রমণী ব্যঙ্গ করিয়াছে। ব্যঙ্গ করিয়া তাহার কথায় উত্তর দিতে হয়। একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর স্থির করিতে হইল বলিয়া, যথাসময়ে উত্তর দেওয়া হইয়াছিল না। তা, একটু বিলম্বে দোষ কি! যেমন কথা তেমন উত্তরটীও হইল।

রমণী হাসিয়া দরজা বন্ধ করিল; আগন্তুকের প্রতি বেশ ভাল-রকম একটী চাহনী ছাড়িল। রমণী বয়সে যৌবন অতিক্রান্ত করিয়াছে বটে, কিন্তু যুবতীর মত চাহিতে জানিত।

পাঠক ! এই দুইটী স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে আপনাদিগের কখনও পরিচয় নাই। একটু পরিচয় দিতে হইবে।

পুরুষটী দেবগ্রামের জমিদার কাছারির নায়েব ; নাম রমাপ্রসাদ দত্ত ;—বংশে গোষ্ঠিপতি কায়স্থ। লেখাপড়ায় সরস্বতীর বর-পুত্র ;—কেবল নাম দস্তখতের সময়েই কালিকলমের সঙ্গে সংস্রব হয়। তাঁহার "রোমাপ্রেশাদ দত্য" নাম সইটী লইয়া গ্রামের বর্ণ-পরিচয়পাঠী বালকগণ মাঝে মাঝে একটু হাসি তামাসা করিয়া থাকে। ইনি গরীব প্রজাদিগের ধর্ম্মাবতার, বিচারে মর্কট হাকিম, উৎকোচ গ্রহণে সর্ব্বদা পশ্চাদ্‌হস্ত। তবে অন্ততঃ পঞ্চ মুদ্রা নজর ব্যতীত কোনও ইতর প্রজার সঙ্গে তাঁহার মূল্যবান কথার একটীও অপব্যয় করেন না। রূপের কথা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাতে যদি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম না হইতে পারে, তবে একটা উদাহরণ দিয়া বলিতেছি। কলুপাড়ার কালুবৌএর সঙ্গে কি কারণে একদিন নায়েব মহাশয়ের একটু মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল, তাই বিদ্বেষ-ব্যাকুলা রমণী তাহার বয়স্যার কাছে বর্ণন করিয়াছিল, "ব্যাটা আর জন্মে নিশ্চয়ই ঘানি-গাছের ষাঁড় ছিল ; নইলে অমন পেট আর অমন রূপ হয়।" বয়সের কথা লোকে যাহাই বলুক, আমাদের কিন্তু পঞ্চাশের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। শিশি শিশি কলপ পান করিয়া চুলগুলি বেশ কাঁচা কাঁচা আছে।

এখন স্ত্রীলোকটীর কথা। পাঠিকা মহোদয়াগণ ক্ষমা করি-বেন,—যেস্থলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বর্ত্তমান সেস্থানে স্ত্রীকে রাখিয়া অগ্রে পুরুষের বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে যেটী মধুর, সেইটীই শেষে রাখিতে হয়।

স্ত্রীলোকটী দেবগ্রাম-নিবাসিনী একটী ব্রাহ্মণ-মহিলা। নাম

আর দুই একটী কথা বলিয়া আমরা যোগমায়ার উপাখ্যান শেষ করিব। তাঁহাকে দেবগ্রামের ইতর সাধারণ ভদ্রাভদ্র সকলই বিশেষ ভয় করিত; কারণ তাহার অতুলনীয় বাগ্মিতাপ্রভাবে, গ্রামস্থ সকল নর-নারীই, কলঙ্কী, দুষ্ট-প্রকৃতি, কুচক্রী, নীচবংশজ, অনাচারী, মাতৃপিতৃদুষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন ছিল।

যোগমায়া দেবীর গৃহখানি ক্ষুদ্র; কিন্তু আসবাবগুলি নিতান্ত সামান্য নয়। ঘরের এক পার্শ্বে দুইটা বাক্স,—একটী টিনের একটী কাঠের; দুটীই অতি উজ্জ্বল বর্ণে বার্ণিশ করা। কাঠের বাক্সটীর উপর আর একটী সুন্দর নূতন চক্‌চকে হাতবাক্স সুচিত্র রুমালে আবৃত। দুইটী কলসী, একটী সেকেলে, একটী একালে। গুটিকতক ঘটি, ভিন্ন ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভিন্ন কারীকরের। কয়েকখানা বড়বড় থালা; ছোট, বড়, মাঝারি নানারকমের কতকগুলি বাটী। কয়েকখানা রেকাবী, কয়েকটী কৌটা, দেওয়ালে পরিষ্কার, টাট্‌কা, সোণালী ফ্রেমে রাধাকৃষ্ণ, হরপার্ব্বতী, রামসীতা, সাবিত্রীসত্যবান, বস্ত্রহরণ, মানভঙ্গ প্রভৃতি কয়েকখানি ছবি। দুই পার্শ্বে দুইটী সেল্‌ফ, উপরে নানাবিধ নানাবর্ণের নানাভাবের কতকগুলি শিকে ঝুলান রহিয়াছে। গৃহের অন্য পার্শ্বে, একখানি বড় খাটের উপর পুরু গদিতে ধব্‌ধবে চাদর পাতা সুন্দর শয্যা; শয্যা'পরে চারিটী বড় বড় বালিস চারিপার্শ্বে বেশ সুন্দর সজ্জিত। উপরে অতিসূক্ষ্ম, পরিষ্কার, সুচিত্রিত নেটের মশারী। শিওরের দিকে একখানি বাটার পর কয়েকটী পাণ। মাঝখানে একখানি সুরঞ্জিত, কারুকার্য্য-খচিত পাখা।

নায়েব মহাশয় শয্যার উপর বসিয়া বাতাস খাইয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। যোগমায়া একটী পাণ আনিয়া নায়েব মহা-

শয়ের হাতে দিয়া একটু হাসিলেন। কোনও কথা বলিলেন না। তিনি জানিতেন, নায়েব মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার এত ভালবাসা নাই যে তিনি এত রাত্রিতে বিনা দরকারে তাহার ঘরে আসিয়াছেন। দরকার থাকে আপনিই সাধিয়া কথা বলিবেন। পাণ দিয়া যোগমায়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

নায়েব মহাশয় পাণটী হাতে লইয়া বড় বড় দন্তপংক্তি প্রকাশ করিয়া খুব রসের সঙ্গে বলিলেন, "কিহে? কেমন আছ? কাজকর্ম্মের বড় অবসর নাই, তাই অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ করতে পারি না। তাই আজ ভাবলেম, এই রাত্রিতে গিয়ে একটু দেখা করে আসি।"

যোগমায়া একটু হাসিয়া বলিল, "ভাল, তবু মনে আছে। তা এত রাত্রিতে কার কুঞ্জশূন্য ক'রে এলেন।"

নায়েব। হাঃ! হাঃ! কুঞ্জত বহুদিনই শূন্য।

"বুড় বয়সে মরে মাগ্, সে শালা গিয়ে মেগে থাক্।"

যোগ। তা, বিবাহের চেষ্টা হচ্ছিল; তার কি হ'ল?

নায়েব। না, তা আর হ'লনা। ছেলেগুলি একবারে বেঁকিয়ে পড়েছে। তারা বলে, বাবা বুড় হয়েছে, ওর আবার বিয়ে কি? ঘটকগুলিকে এইরূপে তাড়িয়ে দেয়। তা, আপনার জনে যদি বুড় বলে, তবে পরে মেয়ে দেবে কেন। বাবাজিরা ছেলে মানুষ, কিছুত বুঝতে পারেন না; বুঝবেন যদি কখনও এই বয়সে বউমাদের পরলোক যাত্রা হয়।

যোগ। তা, ছেলেগুলিরত বড় অন্যায়। এমন বুড় কি? তাদের আরও চেষ্টা ক'রে বুড় বাপের একটু উপায় করে দেওয়া উচিত। তা, এখনকার ছেলে পিলে।

নায়েব। হ্যাঁ! হ্যাঁ!! তা দেখ সে সব ইচ্ছা এখন ছেড়ে দিয়েছি। তবে কথাটা কি? তা এখন ব'স, দুটো কথা বলি। অত দূরে দূরে কি কথা বলা যায়?

যোগমায়া শয্যার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। নায়েব মহাশয় পাখাখানা একটু সরিয়ে বাতাস করিতে লাগিলেন। যোগমায়া বলিল, "হুজুরের আগমনে বড় পরিতুষ্ট হইয়াছি।"

নায়েব। তা দেখ, কথাটা কি? একটা দরবার আছে।

যোগ। আচ্ছা, আর্জি' হউক।

নায়েব। ভাল, এ পাড়ার চারুরায় ছোঁড়াটা কোথা থাকে?

যোগ। কল্‌কাতায় চাকরি করে।

নায়েব। অনেক দিন নাকি বাড়ী আসে না?

যোগ। প্রায় দেড় বৎসর হইল, চাকরিতে গিয়েছে; তারপর আর বাড়ী আসে না।

নায়েব। বাড়ীতে একটা খুব সুন্দরী যুবতী স্ত্রী রেখে গেছে?

যোগমায়া একটু বিলম্ব করিয়া, একটু ভাবিয়া হাসিয়া উত্তর করিল, "ছোঁড়াটা নিতান্ত কাঠ-গোঁয়ার। এমন অমৃতের ভাণ্ডার আল্‌গা রেখে কোথায় পড়ে রয়েছে।"

নায়েব মহাশয় খুব একবার হাসিয়া লইলেন। যোগমায়া বারণ করিয়া, বলিল, "চুপ্ পাড়াপর্শীরা জাগিয়া উঠিবে।"

নায়েব মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "তবে কথাটা কি জান, মেয়েটা বিরহে নাকি কালি হ'য়ে গেছে।"

যোগ। তা একটু হয় বইকি? এই প্রথম বয়স।

কি জ্বালা! যোগমায়া কেমন কথায় কেমন উত্তর দেয়? বলিল

না কেন, "তুমি কি শিব হইবে?" নায়েব মহাশয় একটু ফাঁপরে পড়িয়া বলিলেন, "তা দেখ কথাটা কি জান! বিরহীর সঙ্গে বিরহিণীর মিলনটা বড় শক্ত হয় কিনা? হাঃ, হাঃ, হাঃ!"

যোগ। তাত বটে!

নায়েব। তবে আমাদের উভয়ের মঙ্গলার্থে একটু চেষ্টা করতে পারনা কি?

যোগমায়া সব বুঝিল; তবু অবুঝের মত বলিল, "হ্যাঁ! পুরুষের অপেক্ষা মেয়েদের বিরহ-জ্বালাটা কিছু অধিক। পুরুষ স্বাধীন কিনা।"

নায়েব মহাশয় যোগমায়ার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "এটা তুমি কোলে টেনে বল্‌লে? পুরুষের বিরহ তুমি কি জান্‌বে? যদি দেখাবার হ'ত তবে দেখাতেম। সেই সুন্দরী বিরহিণীর বিরহে আমার বুকের মধ্যে অহর্নিশ তুষানল জ্বল্‌ছে। বড় ঠাক্‌রুণ! এখন তুমি একটু অনুগ্রহ কর্‌লে, এ গরীব বেচারার প্রাণটা বাঁচে।"

যোগমায়া জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "এ বুড় বয়সে এত সাধ?"

নায়েব। বড় ঠাকুরাণী! তুমি মহাশয়া! অন্যে যা বলে বলুক, তুমি আমায় বুড় বলিও না। তুমি সব বোঝো; পরের দুঃখ তুমি বই আর কেহ বোঝেনা। আমি তোমার পায়ের কেনা হইয়া থাকিব।

নায়েব মহাশয় যোগমায়ার পা ধরিতে প্রস্তুত। যোগমায়া একটু সরিয়া আসিয়া বলিল, "তা দেখ, তোমাদের কাজে আমি কবে অবহেলা করিয়া থাকি? তবে একাজটা বড় শক্ত।"

নায়েব। তবে কি আমার সব বিফল হ'ল? তুমি কিছু পার্‌বেনা? নায়েব মহাশয়ের স্বর কাঁন্নার মত হইল।

যোগ। না এমন কি যে হবেনা। তোমাদের জন্যে ভাই, না কর্‌তে পারি এমন কি আছে? সাগর ছেঁচে মাণিক তুলতে পারি। তবে কথাটা কি? ভালরূপে ভুলাতে হবে; অনেক লোভ দেখাতে হবে।' সহজে কি মাছে বঁড়্‌সি ধরে?

তৎক্ষণাৎ নায়েব মহাশয় দশটী টাকা পকেট হইতে বাহির করিয়া যোগমায়ার পায়ের কাছে রাখিলেন, এবং সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন, "এই দশটী টাকা দিয়ে তা'কে দুই শিশি চুলের তেল, কিছু পাণের মসলা কিনিয়া দিও। তারপর কুবেরের ভাণ্ডার রহিল, আর সে রহিল। দেখ, আমি তা'কে না দিতে পারি কি! সোণারূপা, মণিমুক্তা যা' চাবে কিছুতেই ত্রুটী হবেনা। আমি ইন্দ্র, সে শচী হ'লে ধনরত্নের আর অভাব কি?"

যোগমায়া আর একটু সরিয়া বলিল, "ভাই! তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি দেখ্‌ছি বাহাত্তুরে পেয়েছে। ওকি দশ বিশ টাকার কাজ। আমি দশটাকা নিয়ে তা'র সামনে যেতে পারব না।"

যোগমায়া ব্যবসায়িনী কম নয়। নায়েব মহাশয় পকেট হইতে একখানি ২০৲ টাকার নোট বাহির করিয়া যোগমায়ার হাতে দিয়া বলিলেন; "দেখ, আজ আর কাছে নাই। না হয় কাল আর কিছু দেওয়া যাবে। তোমার বিদায়ের সময় বিশেষ বিবেচনা করা হবে।"

যোগ। আঃ! সেকিং? তোমাদের কাজে আমি কি কিছু প্রত্যাশা করি? তোমরা বিশেষ ভালবাস, তাই যথেষ্ট। এখন গুরুর ইচ্ছা কি হয় দেখি।

নায়েব। ছোঁড়াটাত শীঘ্র বাড়ী আস্‌বে না?

যোগ। বোধ হয় না। চাকরিতে মোটে ছুটী নাই।

মায়েব। মা কালী তাই করুন। দুই চারি বৎসরের মধ্যে না আস্‌লেই ভাল; চিরতরে না আস্‌লে আরও ভাল। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

বলিয়া নায়েব মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। দাঁড়াইয়া আবার বলিলেন, "দেখ, ভাই একটু বিশেষ মনোযোগ করিও! অধিক বিলম্ব না হয়। প্রাণটা বড়ই অস্থির রহিল।" বলিয়া দরজা পর্য্যন্ত গেলেন। তারপর আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "দেখ, চেষ্টার ক্রুটী করিওনা। সহজে না হয়, শেষে বলে দেখা যাবে। তবে স্বীকার করাটা তা'র পক্ষে কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়। এই দেখ, আমার গৃহিণী যত গয়না পরিত, আমার মনিবের গৃহিণীও তত পরিতে পারিত না। মনিব আবার কে? আমিইত মনিব। তা যাক, না হয় শেষে কৌশলে দেখা যাবে। যাবেন কোথায়?"

বলিতে বলিতে নায়েব মহাশয় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যোগমায়া টাকাগুলি ও নোটখানি বাক্সে পুরিয়া, প্রদীপ নিবাইয়া শয়ন করিল।





নবম পরিচ্ছেদ।

অল্প দিন হইল চারুবাবু পত্র লিখিয়াছেন, বৈশাখ মাস গেলে, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই বাড়ী আসিবেন। বাবু ছুটি দিতে চাহিয়াছেন। জননী তারাসুন্দরী আশ্বস্ত হইয়া হরিঠাকুরকে ভোগ মানস করিলেন, যেন পথে ঝড় ঝট্‌কা, দস্যু ডাকাতে কোনও বিপদ না ঘটে। প্রভাবতী প্রফুল্ল হইল; স্বামীর গড়গড়াটী ধুইয়া মাজিয়া জল পুরিয়া রাখিল। বিছানাটী ধুইয়া কাচিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিল। চারুচন্দ্রের কাষ্ঠপাদুকা দুইখানি অযত্নে ময়লা পড়িয়াছিল, প্রভা তাহা বেশ করিয়া পরিষ্কার করিল। বাক্স খুলিয়া অলঙ্কারগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া সাফ করিল। অনেক দিন পরে মাথায় সাবান দিয়া, চুল পরিষ্কার করিয়া মাথাটী ভাল করিয়া আঁচড়াইল। তারপর নিভৃতে গিয়া ছেলে কোলে লইয়া, তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে বসিল। "এবার মণির জন্যে পোষাক আস্‌বে? সাহেব সেজে বেড়াতে যাবে।" ছেলে বলিল, "চায়েব! মা, চায়েব! বাবা চায়েব!"

প্রভা। আহা! মণির আমার কত বুদ্ধি। সব বুঝে। দেখ বাড়ী এলে কিছুতেই তাঁর কোলে যেওনা।

ভবচন্দ্র মল্লিকা-কলির ন্যায় নবোদ্গত দন্তকয়টী বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "দেওনা।"

প্রভা। আচ্ছা বল্ দেখি কবে আসবেন?

ভবচন্দ্র। কলা আচ্‌বে, চন্দেচ আচ্‌বে।

প্রভা। আস্‌বে বই কি? আমায় একটী দেবে? বলিয়া বড় আনন্দে প্রভাবতী পুত্রের মুখচুম্বন করিল।

কিন্তু যাহার ভাগ্য ভাল নয়, তাহার বাড়াভাতে ছাই পড়ে। দুর্ভাগার সমুদ্র শুষিয়া যায়। অল্প দিন পরে আবার পত্র আসিল; তৎসঙ্গে পঞ্চশত মুদ্রা ডাকযোগে আসিল। অর্থে যাহার প্রয়োজন, সে অর্থ পাইলে সন্তুষ্ট হয়; যে অর্থের কাঙ্গাল সে অর্থ পাইলে সব ভুলিয়া যায়। সরলা প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা, স্বামি-সন্দর্শন-পিপাসু প্রভাবতী এ পঞ্চশত রৌপ্য মুদ্রায়,—যাহার পঞ্চটীর মাত্র অনুরোধে, আমরা ক্ষমতাশালী স্বাধীন পুরুষ না করিতে পারি জগতে এমন দুরূহ কার্য্য নাই,—যাহার অনুরোধে আমরা হয়কে নয় করিতে পারি, লেখনীর অপূর্ব্ব পরিচালন-কৌশলে হিসাবের খাতায় নয়কে ছয় করিতে পারি, অনাথার রোদনে দরিদ্রের কাতরোক্তিতে হৃদয় অবিচলিত রাখিতে পারি,—সেই জগন্মনোমোহিনী বিমল-ধবল-রূপসী নিখিল-বীর-হৃদয়-বিজেত্রী পঞ্চশত মুদ্রায় প্রভাবতী বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট হইল না। অর্থ তাহার কাছে অতি তুচ্ছ পদার্থ; যে মুদ্রা তাহার স্বামী মাসে মাসে বিস্তর উপার্জ্জন করিতেছেন, তাহার কাছে তাহা অতি সুলভ। সেই সর্ব্বার্থ-সাধন অর্থের সঙ্গে একখানি ঘোর অনর্থকর পত্র আসিয়াছে। চারুচন্দ্র লিখিয়াছেন, "বাড়ী আসিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু আসা হইল না। আড়তের হেড্ ম্যানেজার কার্য্য ত্যাগ করাতে, কর্ত্তৃপক্ষেরা আমাকেই সেই পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। নূতন-প্রাপ্ত পদ ত্যাগ করিয়া এখন বাড়ী আসা অসম্ভব; ৺পূজার সময় আসিবার চেষ্টা করিব।

যে পাঁচশত টাকা পাঠাইলাম, প্রাপ্তিমাত্র মহাজনকে যেন দেওয়া হয়।"

রামকৃষ্ণ টাকাগুলি গণিয়া লইয়া মহাজনের বাড়ীতে গেল; তারাসুন্দরী পুত্রের বাড়ী আসা হইল না শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন; তবে পুত্রের পদোন্নতির সংবাদ পাইয়া কতক শান্ত হইলেন। কোন্ জননী পুত্রের উন্নতিতে সুখী না হন্? প্রভাবতী যেস্থানে বসিয়াছিল, সেই স্থানেই বসিয়া রহিল।

হায় আশা! তুমি মনুষ্য-হৃদয় বড় উৎপীড়িত কর। নিবিড় ঘনঘটাচ্ছন্ন-দুর্য্যোগ-রজনীতে আকস্মিক বিদ্যুচ্চমকে হতভাগা পথিককে যেমন ভীত দিক্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে, তুমিও তেমনি মুহূর্ত্তের জন্য শোক-কালিমাময় মনুষ্যহৃদয় কাম্যবস্তুর ছায়ালোকে বিভূষিত করিয়া, পর মুহূর্ত্তেই তাহা সহস্রগুণ অন্ধকার গর্ভে নিক্ষিপ্ত কর। অভাগিনী প্রভাবতী এই দুই বৎসরের বিচ্ছেদ একরূপ সহ্য করিয়াছিল। আবার তাহার হৃদয়ে, কেন স্বামি-সন্দর্শন সুখের আশা জাগাইয়া দিলে? প্রবল আশার পর গভীর নিরাশায়,—ঘোর-ঘন-ঘটান্তে বিন্দুপাতাভাবে পিপাসিতা চাতকীর মর্ম্মোচ্ছেদ হইল। প্রভা কাঁদিল না, একবিন্দু অশ্রুপাতও করিল না। বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া রহিল।

সময় কাহারও অনুরোধ রাখেনা; কাহারও সুখদুঃখানুসারে পরিচালিত হয় না। ক্রমে, দিবাবসান হইয়া আসিল। প্রভার ঘরকন্নার কাজ সবই বাকি। শ্বাশুড়ী আসিয়া বউকে কাজের সময় এরূপভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "ছি বউ, এখনও বসে আছ? বেলা যে যায়। কখন জল আন্‌বে? বাসন মাজ্‌বে? ঘর ঝাঁট দেবে? ছি! অমন ক'রে ভাব্‌লে কি চলে?"

যথার্থই, ভাবিলে চলেনা। ভাব, পলে পলে চিন্তার বিষ-দংশনে শীর্ণ হও, প্রতি মুহূর্ত্তে এ সংসার-কারাগার হইতে মুক্তির ইচ্ছা কর, কিন্তু কবে কাজ না করিয়া পারিয়াছ। প্রভা কাজে মন দিল, কলসী লইয়া জল আনিতে চলিল।





দশম পরিচ্ছেদ।

পুকুরে যাইতে অগ্রে উদ্যান অতিক্রান্ত করিতে হয়। চারু-চন্দ্রের সাধের উদ্যানটী তাঁহার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতে কোনও অংশে সৌষ্ঠব-বিহীন হয় নাই। প্রভা সর্ব্বদা স্বামীর প্রমোদ-বাগানে জল সেচন করিত; অন্য কোনও আগাছা দেখিলে তুলিয়া ফেলিত; গলিত পত্রগুলি কুড়াইয়া পরিষ্কার করিত। রামকৃষ্ণও অবসর মত বাগানের তত্ব লইত; মাঝে মাঝে মাটি ঢালিয়া বাগানের উর্ব্বরতা শক্তি বর্দ্ধিত করিত।

প্রভা কলসী-কক্ষে অলস-পদবিক্ষেপে অতি ধীরে ধীরে উদ্যানে প্রবেশ করিল। দেখিল চারিদিকে বিচিত্র-পত্রাসনে অসংখ্য কুসুমরাজি হাসিয়া হাসিয়া মৃদুল বাসন্তি-পবনে কত লীলা করি-তেছে। চারিদিকে কতশত ভ্রমর ঝাঁকে ঝাঁকে ঝঙ্কার করিয়া উড়িতেছে বসিতেছে ঘুরিতেছে। বসন্ত-সরস নবোদ্ভিন্ন-লতিকা-বৃন্দ তরু-দেহ আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে দুলিতেছে। মধ্যে মধ্যে পত্রান্তরাল হইতে দুই একটী কোকিল পাপিয়া প্রভৃতি মধুর রব করিতেছে। হায়! প্রকৃতি সুখের সময়ে যেমন, দুঃখের সময়ও তেমন! প্রভা ভাবিল নির্দ্দয় প্রকৃতি এখন কি দেখিয়া হাসে?

ধীরে ধীরে, চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্রভা পুষ্করিণীর দিকে চলিল।

অন্যান্য দিন অর্দ্ধ দণ্ডকাল মধ্যে সরোবর হইতে গাত্রমার্জ্জন করিয়া, কলসী ধৌত করিয়া, জল লইয়া প্রভা গৃহে প্রত্যাগমন করিত, আজ একদণ্ড গত হইল তবু প্রভা ঘাট পর্য্যন্ত পৌছিতে পারিল না। প্রভা চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, "বৃক্ষলতা! তোমরাই সুখী, তোমরা অঙ্কুরিত হইয়া যে যাহার সঙ্গে মিলিয়াছ, চিরকাল তাহার সঙ্গেই মিশিয়া আছ। তোমাদের মধ্যে জীবিকা-চিন্তা নাই, উপার্জ্জনস্পৃহা নাই, উন্নতি-লালসা নাই; সুতরাং বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। ফুলগুলি! তোরাও সুখী; তোদের হাসিয়াই সুখ, ফুটিয়াই সুখ, অন্যের হাসি, অন্যের স্ফূর্ত্তির উপর তোদের হাস্য-স্ফূর্ত্তি নির্ভর করে না। একদিনের জীবন;—সমস্ত জীবন হাসিয়াই যাপন করিতেছিস্। আমরা তোদের মত আপনাআপনি হাসিতে পারিনা কেন? অন্যের হাসি না পাইলে আমাদের হাসি ফুটেনা কেন?" প্রভার চক্ষে সমস্ত জগৎ সুখী, কেবল সেই অসুখী।

প্রভা সরোবর-তীরস্থ ফুল্ল কুসুম-পরিশোভিত, অসংখ্য মধুপ-ঝঙ্কারিত সেই কামিনী তরুতলে,—যে তরুতলে স্বামিসঙ্গে বসিয়া প্রভা চাঁদের আলোকে সরোবর মধ্যে মৎস্যক্রীড়া দেখিত, রাশি রাশি ফুল কুড়াইয়া মালা গাঁথিয়া স্বামীর গলায় পরাইত, কখনও বা অঞ্জলি পুরিয়া ফুল লইয়া স্বামীর পদপ্রান্তে ছড়াইয়া দিত,—সেই সুখ-সময়ের শান্তি-নিকেতন তরুতলে গিয়া প্রভা দাঁড়াইল। তাহার কত কথা মনে পড়িল;—সেই হাসিখুসি, সেই অনর্থক অথচ অমূল্য, সেই নিত্যই এক অথচ নিত্য নূতন, সেই অবিরাম অথচ অফুরণীয় হাস্যালাপ, আমোদ-প্রমোদ, সুখ-স্বপ্ন, স্মৃতির ন্যায় প্রভাবতীর মানসে ভাসিয়া উঠিল। এই তরুতলে চারুচন্দ্র দুই হাতে প্রভার দুইখানি হাত ধরিয়া জলের উপর হেলাইয়া বলিতেন,

"কেমন? তোকে ফেলে দিই।" প্রভা বলিত "দাওনা, আমি ডুবিলে তুমিও ডুবিবে।" চারুচন্দ্র টানিয়া তুলিয়া বলিতেন, "থাক্ আজ নয়, আর একদিন ডুবাইব।" প্রভার সব মনে পড়িল। দুঃখের অন্ধকারময় চিত্রপটে অতীত-সুখ-চিত্র বড় উজ্জ্বল চিত্রিত হয়।

রায়ের বাড়ীর পুকুরে অনেক লোক জল লইতে আসিত, তখন সকলেই জল লইয়া চলিয়া গিয়াছে; বেলা ডুবিয়া আসিয়াছে, পুষ্করিণীতে লোক নাই। প্রভা ধীরে ধীরে কলসী পূর্ণ করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, একখানি সাচ্চা তসরের ধুতি পরিয়া তোয়ালে হস্তে যোগমায়া ঘাটের দিকে আসিতেছে। দূর হইতে যোগমায়া প্রভাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "কি? বউ? এখনও যে ঘাটে আছ? সন্ধ্যা যে হয়ে এল।"

প্রভা উত্তর করিল, "এই মাত্র ঘাটে আস্‌ছি।"

যোগমায়া প্রভার নিকটে আসিয়া, একটু মুখভঙ্গি করিয়া ভ্রূ দুটী একটু টানিয়া বেশ মিষ্ট স্বরে বলিল, "কিলো বউ! তোকে এত রোগা দেখাচ্ছে কেন গা? কোনও ব্যাম ধরেছে কি?"

প্রভা। না এমন কিছু নয়।

যোগ। নাগো না বউ, তোর শরীরের আর সে শ্রী নাই। এমন ভাব ত কোনও দিন দেখি নাই। কতদিন ভাবছি, তোমায় একটু দেখে যাব, তা একা মানুষ, সন্ধ্যা পূজা করে বড় সময় থাকে না; তায় প্রায়ই দুই একজন অতিথি-অভ্যাগত আছে; এমন একটু অবকাশ নাই যে একবার এসে দেখে যাই। শরীরটাও আজ কতদিন কেমন খারাপ হয়েছে। আমি পারিনা, তা ত লোকে বুঝেনা। গরীব হউক, ভিখারী হউক, আমার বাড়ীতে যেন সকলের পালা। আজ খেতে বসেছি, এমন সময়ে দুমাগী বৈষ্ণবী, অনাহারী

এসে উপস্থিত হ'ল। অমনি কোলের ভাত তাদের টেনে দিয়ে, এই শেষ বেলায় দুটী ভাতেভাত মুখে দিয়ে এলেম।

প্রভার অত কথা শুনিবার অবকাশ ছিলনা, সে কলসী লইয়া তীরে উঠিল। যোগমায়া বলিল, "দাঁড়াওনা বউ একটু; কতদিন পরে যদি দেখা হ'ল, তবে দুটো কথাবার্ত্তা বলেনি।"

প্রভা কলসী কক্ষে লইয়া দাঁড়াইল। যোগমায়া বলিল, "কলসীটা নিয়ে কতক্ষণ দাঁড়াবে। শানের উপরে কলসীটা রেখে একটু ব'স। আহা! বউ তোর শরীরটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে। তোর যে রূপ দেখে স্বর্গের দেবতারা ভুলে যেত, তেমন রূপ আর নাই। আহা! সর্ব্বাঙ্গে যেন কালি মেড়ে দিয়েছে। তা আর হবেনা? এমন কাঁচা বয়স, তা এই দুই বছরের বিরহে, শরীর আর থাকে কিসে? বুঝি, বুঝি যেনে, সব বুঝি। পোড়া পুরুষে মেয়েগুলোকে এমনি করিয়া জ্বালায়। আচ্ছা, চারুর কোনও সংবাদ পাওকি?"

প্রভা। মাঝে মাঝে পত্র লেখেন।

যোগ। পত্র লেখেন, তবু ভাল। কিন্তু চারুকে আমরা বরাবর ভাল মানুষ জান্‌তেম। তা কে জানে এমন হবে! পুরুষকে কি বিশ্বাস কর্‌তে আছে?

যোগমায়া এক মুখে অনেক কথা বলিল। প্রভার কাছে সকল কথা ভাল লাগিল না। যোগমায়ার শেষ কথাটী শুনিয়া প্রভা বড় বিরক্ত হইল! "পুরুষকে কি বিশ্বাস কর্‌তে আছে।" এ কথার তাৎপর্য্য সে বুঝিল না। পুরুষকে বিশ্বাস করিবে না, তবে সুখ পাইবে কোথায়? ইষ্টদেবের প্রতি আস্থা রাখিতে না পারিলে, ধর্ম্ম থাকে কিসে? প্রাণ খুলিয়া পুরুষের-পদে জীবন বিসর্জ্জন করিতে না পারিলে, নারী-জীবনের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয় কিসে?

অবলা নারী সবল পুরুষের আশ্রয় না পাইলে কি লইয়া সংসারে দাঁড়াইবে? পুরুষের বিশাল-হৃদয়ে প্রেম বিনিময় করিয়া ক্ষুদ্র-হৃদয় রমণী যে স্বর্গ-সিংহাসন অধিকার করে! প্রভা ইহাই বুঝিত। পুরুষকে বিশ্বাস করিবে না, তবে বিশ্বাস করিবে কা'কে? যোগমায়া কি বলে? প্রভা বলিল, "ছি! পুরুষকে কেন এত নিন্দা করিতেছ।"

যোগ। এ নিন্দা না করে কে? তুমিও যে করনা তা নয়! অবশ্যই মনে মনে কর। আমার ভাই মুখে যা পেটেও তাই। আমরা এমন কি গুরুতর অপরাধ করেছি যে, পুরুষের কাছে আমরা নাকে শিকলিবাঁধা ভালুকের মতন থাক্‌ব; যখন যে দিকে চালাবে, সেই দিকেই চল্‌ব। মিন্‌সেরা আমাদের কত রকমে না জ্বালাতন করে। নিজেরা হাজার হাজার গোপিনী নিয়ে রঙ্গ করেন, আর আমরা যদি একটু কা'রও 'পরে চাইলেম, তবেই তাদের মাথায় বাজ পড়ে। বলে "আপনার বেলায় লীলা খেলা, পাপ লিখেছেন পরের বেলা।"

প্রভা। থাক্‌ মেনে, ওসব কথা ভাল না।

যোগ। না, দেখ, পুরুষের ব্যবহারটা দেখ। তুমি কাল্‌কের মেয়ে, কি বুঝ্‌বে? আমরা দেখে দেখে অনেক শিখেছি। আর বুঝ্‌বে নাইবা কেন? এই দেখনা, তুমি চারুকে যেমন ভালবাস, অমন ভাল ক'জনে বাস্‌তে পারে? তুমি [illegible] না খেয়ে না নেয়ে, ভেবে ভেবে শরীরটা মাটি কচ্ছ। সেকি তোমাকে একটুও ভাবে? পুরুষ মধুলোভী ভ্রমর, এক ফুলে চিরদিন থাকে না, নিত্য নূতন খুঁজে বেড়ায়। হ্যাঁগা, চারু যে বাড়ী আস্‌বে আস্‌বে শুনেছিলেম, তা এলনা কেন?"

প্রভা। তাঁর চাকরিতে উন্নতি হয়েছে, তাই এখন আস্‌তে পারলেন না। পূজার সময়ে আস্‌বেন।

যোগ। হঁ্যা, তা আস্‌বে বই কি? তুমি হাবা মেয়ে বইত নয়। কি কর্‌বো, যদি তোমার মতন রূপ যৌবন থাকৃত, তবে মিন্‌সেদের দেখাতুম মেয়ে মানুষের ক্ষমতাটা কি? ওমা! কি পোড়া কপাল! ঘরে এমন সোমত্ত মাগ্‌, হতভাগা ছোঁড়াটা কিনা একটা আধবুড় বাগ্দিনীকে নিয়েই মত্ত! ছি লো ছি! চারুকে এতদিন ভালই জান্‌তুম।

প্রভার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল; কণ্ঠদেশ হইতে ললাট পর্য্যন্ত রক্তিমাকার ধারণ করিল। মর্ম্মান্তিক ঘৃণা ও রোষের আবেগে সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গে এক অপূর্ব্ব তীব্রজ্যোতি প্রতিফলিত হইল। মানসিক আবেগের প্রাবল্যে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; নিস্পলক বিশাল নয়ন উন্মুক্ত করিয়া, পাপিষ্ঠা যোগমায়ার মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া রহিল। সে দৃষ্টিতে রাক্ষসী যোগমায়ার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু তবু বলিল, "যে সে লোকের কথায় বিশ্বাস হ'ত না, আমার বোনের ভাসুরপো কল্‌কাতায় চাকরি করে; সেই সব জেনে এসেছিল, তাই সে দিন আমাকে বল্লে। আহা! শুনে তখন কান্না এল। তোমার এমন স্বভাবটী! তা কি কর্‌বে, অদৃষ্টে যার যা থাকে।"

প্রভা আ[illegible] করিতে পারিল না; ভগ্নস্বরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তো[illegible]র মাথায় বাজ পড়ুক। কে তোমায় এত জিজ্ঞাসা করছে?"

তার পর অতি ব্যস্ত হইয়া কলসী লইয়া প্রভা চলিয়া গেল।





একাদশ পরিচ্ছেদ।



প্রভার ঘাট হইতে আসিতে রাত্রি হইয়াছে; সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শ্বাশুড়ী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ছি মা! এ কেমন কাজ। সন্ধ্যা হয় দেখ না। তুমি কোণের বউ, এ সময়ে ঘাটে ছিলে; লোকে শুন্‌লে কি বলবে? ঘরের কাজকর্ম্ম সব পড়ে আছে, তুমি ঘাটে গিয়েই দিনটা পার করে এলে?"

প্রভা কথা বলিল না, চক্ষু মুছিতে মুছিতে নীরবে গৃহকর্ম্ম সারিতে লাগিল। সকাল সকাল সমস্ত কাজ সারিয়া, রামকৃষ্ণকে আহার করাইয়া, পুত্রের দুগ্ধটুকু লইয়া প্রভা শুইয়া পড়িল। নিজে জলস্পর্শ মাত্র করিল না, শ্বাশুড়ীকে বুঝাইল, অসুখ করিয়াছে।

শয্যা বিরামদায়িনী;—কিন্তু সকলের পক্ষে নয়। ঐ যে সমস্ত দিবসের পরিশ্রমান্তে শ্রমজীবী ভগ্নকুটীরে মৃত্তিকাসনে পরমসুখে নিদ্রিত। আর ঐ দেখ সুরম্য হর্ম্মতলে, বহুমূল্য পর্য্যঙ্কে সুগন্ধময় কোমল শয়নে শুইয়াও কোনও হতভাগার শয্যাকণ্টক উপস্থিত। প্রভার শয্যা আজ কণ্টকময়। আজ তাহার জগৎ বিষময়! সে কেবল কাঁদিতেছে আর ভাবিতেছে, আমার সুখের নিদান,

শান্তির কুটীর, প্রমোদের উৎস, শতজন্মের তপস্যালব্ধ অমূল্য-রত্ন যথার্থই কি হারাইলাম? যোগমায়া—পাপিষ্ঠা কি বলিল? সে মিথ্যাবাদিনী, সর্ব্বনাশিনী পাপিনী, তাহা জানি। কিন্তু আমার কাছে এ মিথ্যা বলিয়া তাহার লাভ কি? তাহার কথা কি সত্য? হে জীবন-সর্ব্বস্ব! অবলার একমাত্র আশ্রয়! ক্ষমাময়! ক্ষমা করিও। আমি সর্ব্বনাশিনী যোগমায়ার কথা বিশ্বাস করিবনা। কিন্তু যতদিন তোমার মুখে না শুনিতে পাইব, যোগমায়ার কথা সমস্ত মিথ্যা, ততদিন এ হৃদয় শান্ত হইবে না।

প্রভাবতী বিচ্ছেদ-কাতরা অনাথার ন্যায়, হৃত-সর্ব্বস্বার ন্যায় কত কাঁদিল! থামিয়া থামিয়া, চাপিয়া চাপিয়া, কত দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া প্রভা সমস্ত রাত্রি কাঁদিল। কিছুতেই মন স্থির হইল না, রোদনের শেষ হইল না। ভাবিলে ভাবনা বাড়ে। তীব্র হলাহল, ঘোর দাবানল, জ্বলন্ত মহাবজ্র অপেক্ষা যে ভাবনা অধিকতর মর্ম্ম-প্রদাহী, সে ভাবনা হৃদয় হইতে দূরীকৃত করিবার জন্য অভাগিনী কত চেষ্টা করিল, তাহা কিছুতেই দূরীভূত হইল না; বরং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রবল হইতে লাগিল। হায় কি শুনিলাম! কালামুখী যোগ-মায়া, কেন এ হৃদয়ে আগুণ জ্বালিয়া দিলি? যদি একথা সত্য হয়, তবে হে সর্ব্ব দুঃখ-বিনাশন, তাপিত জনতারণ যম! এস তুমি, আমি তোমার কোলে লুকাইব। এ বিপদে তুমি ভিন্ন অবলার আর গতি নাই। স্বামী কলঙ্কী! হায় আমি কোথায় লুকাইব?"

রাত্রি অনেক হইল, কিন্তু ভোর হইল না। আজিকার রাত্রি যেন দশগুণ বাড়িয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি! অনেক রাত্রির অন্ধকার! অন্ধকার অস্ত হইল। শেষ রাত্রিতে জ্যোৎস্না ফুটিল। তাহাতেই প্রভা ভাবিল ভোর হইয়াছে। গৃহের ভিতর আর থাকা

যায়না, দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া শুনিল, রামকৃষ্ণ তাহার ঘরের দাওয়ায় বসিয়া দেহতত্ত্ব গাহিতেছে। প্রভাবতী জানিত, রামকৃষ্ণ সুখেও গায়, দুঃখেও গায়। সুখের সময় সখী-সংবাদ, মাথুর-লীলা গাইত, দুঃখের সময় দেহতত্ত্ব বা রামপ্রসাদী গাইত। রামকৃষ্ণ কি দুঃখে এত রাত্রিতে দেহতত্ত্ব ধরিয়াছে? রামকৃষ্ণেরও কি দুঃখ আছে? অশীতিপর বৃদ্ধ অথচ চিরসুস্থ-শরীর, পুত্রকলত্র-হীন অথচ অজ্ঞাত-শোক-দুঃখ, পরসেবানিরত অথচ চিরসন্তোষ-শান্ত রামকৃষ্ণ কি চিন্তায় রাত্রি জাগরণ করিতেছে? আমার প্রয়োজন আছে, অভাব আছে, আশা আছে, নিরাশা আছে, প্রেম আছে, বিচ্ছেদ আছে, পাপ আছে, অনুতাপ আছে, পরিবার আছে, জীবিকা-চিন্তা আছে; আমার ভাবিবার বিষয় আছে। রামকৃষ্ণের জগতে কি আছে? সে কিসের জন্য ভাবিবে? তাহার বাসনার সামগ্রী সমস্তইত তাহার হস্তগত রহিয়াছে। হুক্কা কল্কি, তামাক টিকা, প্রাত্যাহিক শাক ভাত, মনোমত স্থূল বসন, সবইত তাহার নিকট সুলভ। তাহার ইহজগতে এর অধিক বাসনার সামগ্রী নাই। আর পরলোকেও তাহার ভয়ের কারণ নাই; তাহার স্থূল জ্ঞানে সে কখনও প্রতারণা প্রবঞ্চনা শিক্ষা করে নাই। কাহারও স্বার্থ ধ্বংস করিয়া নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে কখনও সাহসী হয় নাই। লোকে যাহাকে পাপ বলে, যাহাতে পরলোকে শান্তিসুখ বিনষ্ট হয়, এমন কিছু সে জীবনে কখনও করে নাই। তবে সে ভাবিবে কেন? যাহার ভাবনার বিষয় নাই, এমন লোক কি জগতে একটীও নাই?

প্রভা ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণের কাছে গেল। তাহাকে দেখিয়া রামকৃষ্ণ সঙ্গীত হইতে বিরত হইয়া নীরবে রহিল। ভক্তিশ্রদ্ধা-

ব্যঞ্জক কোমলকণ্ঠে প্রভা বলিল, "ঠাকুর, রাত্রি কি ভোর হইয়াছে ?"

প্রভাবতী স্বামীর "রামাখুড়ো" ভৃত্য রামকৃষ্ণকে শ্বশুর সম্ভাষণ করিত।

রামকৃষ্ণ একটু আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "না, এখনও প্রায় একপ্রহর রাত্রি আছে।"

প্রভা। তবে এত রাত্রিতে কেন জেগে আছ ?

রাম। নানারূপ ভাবনা-চিন্তায় ঘুম আস্‌ছে না। আমার গানের শব্দ শুনে বুঝি তুমি জেগে উঠেছ ?

প্রভা। না, আমি জেগেই ছিলাম। তোমার এমন কি ভাবনা যে এত রাত্রি জেগে আছ ?

রাম। হাঁ! আমার ভাবনা কি ? পরের ভাবনাই ভাবনা; তুমি মা বালিকা, কি বুঝ্‌বে। যাও ঘরে যাও।

এই বলিয়া রামকৃষ্ণ ছোট রকমের একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া কল্‌কিতে তামাক সাজিল। তামাক সাজিয়া দেখিল অগ্নিকুণ্ড নিবিয়া গিয়াছে।

"দূর ছাই! আগুণটা একেবারে নিবে আছে; যা'ক।" বলিয়া রামকৃষ্ণ কল্কিটী মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আগুণের অভাবে রামকৃষ্ণের তামাক খাওয়া হইল না দেখিয়া, প্রভা কল্কিটী তুলিয়া লইয়া বলিল, "মার ঘরে আগুণ আছে, আমি এনে দিচ্ছি!"

সেকি ? প্রভু-পত্নীর দ্বারা আগুণ আনাইয়া তামাক খাইব ? ধিক! রামকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি প্রভাবতীর হস্ত হইতে কল্কিটী লইয়া বলিল, "না মা! আমার আগুণে কাজ

নাই। তুমি আগুণ এনে দিবে, সে আগুণ আমার মুখে দিও।”

নিবিড় ঘনঘটামধ্যে বিদ্যুচ্চমকের ন্যায়- প্রভাবতী রামকৃষ্ণের কথায় এত বিষাদেও একটু হাসিয়া উত্তর করিল, “মুখে দেওয়ার সময় হইলে দিব। এখন হুকার মুখে দেই।”

রামকৃষ্ণ তবু কল্‌কি ছাড়িল না; বলিল, “যাও, আমি তামাক খাইব না। চাকরকে মনিবের তামাক সেজে দিতে আছে?”

প্রভা। সেকি কথা ঠাকুর? তোমায় আমরা কি তেমন ভাবিয়া থাকি? আমি তোমায় শ্বশুর বলিয়াই জানি। আমার পিতৃকুলে বাপ খুড়া নাই, একুলে আসিয়াও আমি শ্বশুরের মুখ দেখিতে পাই নাই। তোমাকেই আমি শ্বশুরের মত ভাবি। শ্বশুরের সেবা স্ত্রী-জীবনের একটা মহৎ কাজ; আমি ভাবি তোমার সেবা করিয়া সে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিব। তুমিওত আমায় নিজের কন্যার ন্যায় ভালবাস। আজ এমন কথা বলিতেছ কেন?

রামকৃষ্ণ আর কথা বলিল না। প্রভাবতীর সরল সুমধুর বাক্যামৃতে তাহার প্রাণ গলিয়া গেল। তাহার বার্দ্ধক্য-বিকৃত তন্দ্রিল নয়নযুগল নিমেষ-শূন্য রাখিয়া করুণাময়ী বালিকার শান্তি-প্রেম-পবিত্রতা-বিধৌত মুখমণ্ডল ও সারল্য-সরোবর নয়ন দুইটীর প্রতি তাকাইয়া রহিল। দেখিল, বালিকার মুখ পরম-তীর্থ। সেমুখ মর্ত্ত্যধামে স্বর্গের ছায়া। অভূতপূর্ব্ব আনন্দে বিহ্বল হইয়া রামকৃষ্ণ নীরব রহিল, মনে মনে ভাবিল, “যে মহাত্মা এ দেবীর জন্মদাতা, তিনিই ধন্য! এই জন্যই লোকে পুত্রকন্যার কামনা করে।”

রামকৃষ্ণ কল্‌কি ছাড়িয়া দিল। প্রভা অল্পক্ষণমধ্যে আগুণ

আনিয়া ফুৎকার দিতে দিতে রামকৃষ্ণের হাতে দিল। রামকৃষ্ণ পরমানন্দে তামাক খাইতে লাগিল। প্রভা তখন বলিল, "ঠাকুর, এখন বলনা কি ভাবিতেছিলে?"

রাম। কি ভাবিতেছিলাম, তাকি না শুনিলে নয়? তবে শোন মা, বলি। আমার আর সংসারে থাকিতে ইচ্ছা নাই। শিয়রে যম আগত, আর কতদিন মায়ায় মুগ্ধ থাকিব? তাই বহুদিন ভাবিতেছি, এখন যে কটা দিন বাঁচি, কাশী গিয়া বাস করি। কিন্তু চারুবাবু দেশে না আসিলে কি করে তোমাদের পরিত্যাগ করে যাই। সেবারকার পত্র পেয়ে ভা'বলাম এইবার বাড়ী আস্‌বেন, আমি বলে ক'য়ে চলে যাব। আজ পত্রে জা'নলাম, তিনি আসিবেন না। আমার অদৃষ্টে বুঝি কাশী দর্শন নাই।

প্রভা। ঠাকুর, তুমি কাশী যাবে, টাকা পাবে কোথা?

রাম। আমার কিছু টাকা আছে। চিরদিন চাকরি করে পাঁচশত টাকা সঞ্চয় করেছি।

প্রভা। যদি কাশী যাও, আমাকে সঙ্গে লইও। আমিও কাশীবাসী হইব।

রাম। ছি! এখন ওকথা বলিতে নাই। তুমি সবে বালিকা। কত ছেলে মেয়ের মা হবে। কত দৌহিত্রপৌত্র হবে। কত সুখ কর্‌বে, কত দান, ধ্যান, পুণ্য-কর্ম্ম কর্‌বে। এখন কাশী যাবে কেন?

প্রভা। আমার তত জোরকপাল নয়, আমি অভাগিনী।

প্রভা চক্ষু মুছিল। ওকি! প্রভা কি কাঁদিতেছে? রামকৃষ্ণ বড় ব্যস্ত হইয়া অতি স্নেহের স্বরে বলিল, "কেন? কি হয়েছে বউ মা? তোমার ন্যায় ভাগ্যবতী কে? তুমি রাজার ঘরের রাজ-

রাণী; তোমার কোলে এমন সোণার চাঁদ। তোমার জোরকপাল নয়ত, কার জোরকপাল? ওকি মা! কাঁদছ কেন?"

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া, মনের আবেগ একটু শান্ত করিয়া প্রভা বলিল, "ঠাকুর, মহাজনের ধার শোধ দিতে আর কত বাকি আছে?"

রাম। আর বেশী বাকি নাই। আর পাঁচশ টাকা হ'লে দেবেন চৌধুরীর ডিক্রি শোধ যায়।

প্রভা। ঠাকুর, তুমি আমায় আপন কন্যার অধিক ভালবাস। আমার জন্য একটী কাজ ক'রতে হবে। তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুর। এ কাজটী তোমায় ক'র্‌তে হবে।

রাম। এমন কি কাজ যে, তোমার জন্য আমি তাহা করিব না। মা! আমার তিন কাল গেছে এককাল আছে। পুত্রকন্যা কেমন, তাহা আমি কখনও জানিনা। কিন্তু মা, তোমাদের জন্যই আমি এখনও মায়ায় আবদ্ধ আছি। আমি মুখে বলি কাশী যাইব, কিন্তু তোমাদের কথা মনে হইলে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বউ মা! বল, কি হইয়াছে। কেন এ সময়ে তুমি এমন করিতেছ?

প্রভা। শোন ঠাকুর, আমি তোমায় আমার অলঙ্কারগুলি দিতেছি। তুমি এইগুলি বিক্রয় করিয়া যেরূপে পার পাঁচশ টাকা আনিতে চেষ্টা কর। সেই পাঁচশ টাকায় সমস্ত দেনা শোধ করিয়া দাও।

রাম। কেন মা? চারুবাবু আর দুই মাসের মধ্যেই পাঁচশ টাকা শোধ দিতে পারিবেন।

প্রভা। মিনতি করি, তুমি ইহাই কর। যদি আমার প্রতি তোমার ভালবাসা থাকে, আমি সুখী হইব এ ইচ্ছা যদি তোমার মনে থাকে, তবে আমার অনুরোধটী রাখ।

রাম। ছি! আমি কি তাহা পারি? বাবু দেশে নাই। আমি তোমার অলঙ্কারগুলি বেচিয়া ফেলিব, তিনি আসিয়া আমায় কি বলিবেন? তুমি এমন কথা বলিতেছ কেন?

প্রভা। তুমিও জান, ঋণ পরিশোধ না হইলে তিনি দেশে ফিরিবেন না। আর তাঁহার কলিকাতায় থাকার প্রয়োজন নাই। আমার কপাল ভাল নয়।

রাম। এতদিন আছেন, আর দুমাস থাকিলে কি হইবে? ছি! স্থির হও মা।

প্রভা। ঠাকুর, আমার কপাল বুঝি ভাঙ্গিয়াছে। তোমার পায়ে ধরি, মিনতি করি আমার অনুরোধ রাখ। আমি কালই পত্র লিখিব, সমস্ত ঋণ শোধ হইয়াছে। দেখিও, আমি যেন তাঁহার কাছে মিথ্যাবাদিনী না হই।

ইহার পর সেই রাত্রিমধ্যেই, প্রভাবতী কৌটা করিয়া সমস্ত অলঙ্কারগুলি আনিয়া রামকৃষ্ণের হাতে দিল, এবং আর একবার সবিনয়ে অনুরোধ করিল। সরলার সরল বুদ্ধিতে নিশ্চিত ধারণা হইয়াছে, ঋণ পরিশোধ হইলেই তাহার স্বামী বাড়ী আসিবেন। তিনি বাড়ী হইতে যাইবার সময় যে তাহাই বলিয়া গিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ অগত্যা অলঙ্কারগুলি লইল। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। প্রভাবতীর অশ্রু-পরিপ্লুত মুখ-মণ্ডল দেখিয়া ও মর্ম্মান্তিক কাতরোক্তি শুনিয়া, রামকৃষ্ণ প্রাণে বড় আঘাত পাইল। সে মোটামুটী বুঝিল, ইহার অবশ্য কোনও গূঢ় কারণ আছে। কিন্তু প্রভুর অনুপস্থিতি-কালে প্রভু-পত্নীর অলঙ্কারগুলি সে কি প্রকারে বিক্রয় করিবে? প্রভু আসিয়া কি বলিবেন? প্রভা বালিকা, ওকি বুঝে? ধর্ম্মই বা কি বলিবে?

বাহিনী শুকাইল, সে স্থলে নরকের প্রখর বৈতরিণী-স্রোত বহিল। ঐ যে একবৃন্তস্থিত-যুগল-কুসুম-সন্নিভ যুগল ভ্রাতা মধুর ভ্রাতৃ-স্নেহবন্ধনে কেমন সুন্দর সুদৃঢ়-বদ্ধ হইয়া সংসারের সুখ দুঃখ, মান অপমান, অভাব সুভাব সমভাবে ভোগ করিতেছিল, ঐ দেখ, কালের আঘাতে তাহারা কি ভীষণ স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। আর কেহ আত্ম-বিনিময় করিতে প্রস্তুত নয়। পরস্পরের মুখদর্শন হইলে পরস্পরেই যেন জ্বলিয়া উঠে। জগতে এমন কত হইতেছে; কত প্রফুল্ল-প্রসূন অকালে বৃন্তচ্যুত হইতেছে; কত অমৃতভাণ্ড অসুরপদাঘাতে ভগ্ন হইতেছে! কত উদ্যান তরুশূন্য, কত নদ বারিশূন্য, কত মন্দির বিগ্রহশূন্য হইতেছে; হায়! জগতের এ অত্যাচারের সংখ্যা কে গণিতে পারে?

হতভাগা চারুচন্দ্রের কপাল বুঝি পুড়িল। যুবতীর মনোমোহন সৌন্দর্য্যানলে যুবক চারুচন্দ্র বুঝি পতঙ্গদশা প্রাপ্ত হইল।

চারুচন্দ্রের ভাবের বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে তিনি যখন কার্য্যস্থলে আসিতেন, তখন নিশ্চিন্ত থাকিতেন। বাসায় আসিলে মন চঞ্চল হইত; স্বদেশ, সুহৃদ্, আত্মীয়-স্বজন মনে হইত। বাসায় বড় থাকিতেন না, অবকাশ-কাল ভ্রমণ করিয়াই কাটাইতেন।

এখন তিনি বাসায়ই থাকেন। তাঁহার বাসায় থাকিতে আর তত কষ্ট হয় না। কারণ এই নির্ব্বান্ধব-প্রদেশে, তাঁহার যেন আপনজন কেহ মিলিয়াছে। এখন আর তাঁহাকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর জন্য ঝি চাকরদিগকে ডাকিতে হাঁকিতে হয় না। তিনি কার্য্যস্থল হইতে আসিয়াই দেখিতে পান, তাঁহার গৃহে সুবাসিত জল, সুমিষ্ট খাদ্য, সুগন্ধি তাম্বুল প্রস্তুত রহিয়াছে। তাঁহার

শয্যা, পরিবার বসন, ভ্রমণের যষ্টিখানি পর্য্যন্ত বিলাতী গন্ধদ্রব্যে সুগন্ধীভূত রহিয়াছে। কোনও দিন তিনি সামান্য একটু অসুস্থ হইলে, নানাবিধ সুমিষ্ট পথ্য প্রস্তুত হইয়া আসিত। আঙ্গুর, বেদানা, পেয়ারা প্রভৃতি মধুর সুপক্ব ফলে তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ হইত। আর সেই অপূর্ব্বরূপসী যুবতী দণ্ডেদণ্ডে দেখিয়া যাইতেন, শুশ্রূষা করিতেন, কত মিষ্টস্বরে শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন। এহেন প্রবাসে আবার দুঃখ কি! স্বগৃহবাসে কে এমন সুখে থাকে? চারুচন্দ্রের প্রবাস-দুঃখ অন্তর্হিত হইল।

যিনি তাঁহার এত সুখের মূলীভূত, যিনি সর্ব্বদা তাঁহাকে এহেন স্নেহের নয়নে দেখিতেছেন, ক্রমশঃ তিনি তাঁহার নিকট সুপরিচিত হইলেন। চারুচন্দ্র জানিলেন, এই রমণীকুলরত্নের নাম বিনোদবালা।

কিন্তু এসব সুখের সময়েও চারুচন্দ্র চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁহার মনে বড় গোলযোগ বাধিয়াছে। তিনি সর্ব্বদাই চিন্তা করেন, "এ রমণী আমার জন্য এত করে কেন? আহা, এমন রূপসী, এমন গুণবতী কি জগতে আর দ্বিতীয় আছে? কিন্তু এত রূপ-গুণ সত্ত্বেও বিধাতা বিনোদবালার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই। তাহার এমন ভরা যৌবন; কিন্তু একদিনের জন্যও স্বামি-মুখ নিরীক্ষণ করিতে পায়না। এত দুঃখেও সরলা সদা হাস্যময়ী।

"আহা কি মনোহর রূপ! কি সুন্দর চক্ষু! কেমন বিস্তৃত!— যেরূপ বিস্তৃত হইলে সুনয়ন হয়, তাহার বিন্দুমাত্রও অধিক নয়, বিন্দু-মাত্রও কম নয়। বিনোদবালা সেই প্রফুল্ল নীলোৎপলনয়নে যখন করুণা-কোমল, গরিমা-গম্ভীর, বিনোদ কটাক্ষ করে, তখন হৃদয় মধ্যে কি যেন অপূর্ব্ব তেজ প্রবেশ করিয়া প্রাণমন কি এক অনির্ব্বচনীয়-

ভাবে সঞ্জীবিত করে। সুচারু বিনোদ-বঙ্কিম-ভ্রূযুগল দৃষ্টিগোচর করিলে কবিদিগের সেই মন্মথ-শরাসন মনে পড়ে। 'কি সুন্দর কেশরাজি!—কত নিবিড়, কত ঘনকৃষ্ণ, কেমন সুচিক্কণ, সুবিন্যস্ত! অলকদাম-বেষ্টনে মুখের সৌন্দর্য্য কি সমুজ্জ্বল আভাময় হইয়াছে! যেন বৈশাখের কালমেঘে স্থির সৌদামিনীর সম্মিলন! নাসিকা, কণ্ঠ, বক্ষঃস্থল, হস্ত, উরু প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই নিখুঁত্। আকার প্রকার, চাল চলন সমস্তই মধুর। কথাগুলি কি কোমল, কত স্নেহযুক্ত, কত ভাবময়! বিনোদবালা যথার্থই বিনোদ-বালা! নিষ্ঠুর বিধাতা, কেন ইহাকে এত রূপগুণ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছ? এমন সুকুমার পুষ্প সৃষ্টি করিয়া এহেন নিদাঘতাপে দগ্ধ করিতেছ কেন? এই জন্যই দুঃখীরা তোমায় নির্দ্দয় বলে।"

"দূর হ'ক! আমি এত ভাবিতেছি কেন? আমি কি সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলাম? কেন,—আমি কি সৌন্দর্য্যের কাঙ্গাল? সৌন্দর্য্য-ধনে আমি ত দরিদ্র নই। আমার প্রভা—স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়ী সদা হাস্যময়ী প্রভা,—সরলতার শুভ্র প্রতিমা কি সুন্দরী নয়? তেমন সরল বালিকাভাব, তেমন প্রাণখোলা হাসিখুসি, তেমন বুকভরা ভালবাসা! তার চেয়ে মধুর কি আছে? স্বীকার করি, এ কামিনীর রূপ-লাবণ্য অনুপম, দেহের পারিপাট্য বেশ-বিন্যাস মুনি-মনোমোহন। কিন্তু তেমন সরলতা তেমন চঞ্চলতা, তেমন স্নিগ্ধতা কি আছে? বিনোদবালা রাজোদ্যানের যত্ন-সেবিত কুঞ্জলতিকা, প্রভা অযত্ন-বর্দ্ধিত বনলতা। দুইই সুন্দর। কিন্তু আমার ত সৌন্দর্য্যের অভাব নাই; আমি পরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইব কেন?"

চারুচন্দ্র এইরূপে আপনার মন বশীভূত রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত মন বাধ্য হইয়া আবার অবাধ্য হইতেছে।

চারুচন্দ্র আবার ভাবিতেছেন, "মনুষ্য-মনে কি না আশা করে? যে অগণিত ধনের অধিকারী, সে আরও ধনের আশা করে। কুবের কি ইন্দ্রত্ব বাসনা করে না? মানব-মন কখনও বাসনা-শূন্য থাকিতে পারে না। কিন্তু সকল বাসনাই কি পূরণীয়? বিনোদবালা সুন্দরী, প্রেমময়ী, কিন্তু আমি ত সে সৌন্দর্য্য-প্রেমের অধিকারী নই। যাহা পরস্ব তাহার প্রতি যে বাসনা করে, সে অতি নীচ।

"আমি তাকে চাহিনা; কিন্তু সে আমাকে চায়। তাহার বিশাল স্নেহময় হৃদয় শূন্য; তাই অভাগিনী শূন্য-হৃদয় পূরণ করিবার জন্য আমার প্রতি বড় তৃষিত-নয়নে চায়! নইলে আমার জন্য এত করে কেন? সর্ব্বদাই যেন আমাকে দেখিতে তাহার প্রবল বাসনা। আমি ঘরে থাকিলে, খিড়কি খুলিয়া, আমার পানে চাহিয়া থাকে! আমি গৃহ হইতে বাহির হইবার সময় ছাদের উপর উঠিয়া আমাকেই দেখিতে থাকে। বিনোদবালা ধনীর ঘরের বিলাসিনী রমণী; তাহার এমন পূর্ণ যৌবন; বিচ্ছেদ-বাতাসে তাহা অহর্নিশ তরঙ্গাকুল। আঘাতে আঘাতে তাহার কোমল-প্রাণ জর্জ্জরীভূত। প্রেম যাহার হৃদয়ে আছে, সে তাহা দান করিতে না পারিলে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে! অভাগিনী ধনি-গৃহে আদরিণী হইয়াও কাঙ্গালিনী। আমি তাহার বেতনভোগী ভৃত্য মাত্র; আমার জন্য সে এত করিতেছে। আমি কি তাহার প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে পারিনা?"

চারুচন্দ্র বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় রামচরণ আসিল। রামচরণ আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "কি বাবু, কি ভাবিতেছ?"

চারু। ভাবিব কি? এমন কিছু নয়।

কথায় চাপিলে কি হয়? মুখ হইতে চিন্তা-লক্ষণ অপসারিত

করিতে পারিলেন না। বিশেষ আকৃতি দেখিয়া অন্যের মনোভাব বুঝিতে রামচরণ সিদ্ধপুরুষ। রামচরণ বলিল, "ছি ভাই! তুমি লুকাইতেছ? বন্ধুতার এরূপ রীতি নয়। যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রেমিক, সে প্রণয়ীর কাছে হৃদয় চিরিয়া দেখায়। তুমি কি ভাবিতেছ, আমায় লুকাইলে!"

চারুচন্দ্র একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "এমন গুরুতর কিছু ভাবিতেছি না। আচ্ছা, তুমিত মুখ দেখিয়া অন্তরের কথা বলিতে পার। বলত আমি কি ভাবিতেছি?"

রাম। হ্যাঁ! বল্‌ব? আমি বুঝিয়াছি, বল্‌ব?

চারু। বলত, কি ভাবিতেছিলাম?

রাম। কোনও সুন্দরী যুবতীকে ভাবিতেছ।

চারু। আন্দাজী উত্তরের কাজ নয়। আমি তাহা ভাবিতেছি না।

রাম। আমি নিশ্চিত বলিতেছি, তুমি বিনোদবালাকে ভাবিতেছ।

বাস্তবিক, রামচরণ কি মনের কথা মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারে? চারুচন্দ্র বিলক্ষণ পরাজিত হইয়া ভাবিলেন, উহাকে গোপন করিব না। তিনি রামচরণকে নিতান্ত বন্ধু জানিতেন। বলিলেন, "ভাই, যথার্থই আমি সেই অভাগিনীকে ভাবিতেছি। অনেক সময় ভাবিয়া থাকি। কেন ভাবি, তাহা ভালরূপ বুঝিনা। তাহার মুখখানি দেখিলে আমার বড় দুঃখ হয়।"

রাম। তা বুঝ্‌তে পেরেছি। তোমার ভাই জোর কপাল;—অমন ফুল ইন্দ্রের নন্দনেও নাই।

চারু। ছি! তুমি বল কি! বিধাতা না করুন, আমার এমন সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু ভাই আমার মন বড় খারাপ হইয়াছে। প্রভা

বাড়ী যাইতে বড় অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিল। আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়াছে। অনেক সময় ভাবিতেছি বাড়ী চলিয়া যাই। নইলে বুঝি নিষ্কৃতি নাই।

রাম। তুমি নিতান্ত আহাম্মুখ। এখন বাড়ী গেলে কি তোমার চাকরি থাকে? এমন চাকরি কেউ সেধে পায়না, আর তোমাকে সেধে দিয়েছে।

চারু। তা কি করি! এখন আমার আপনার প্রতি বিশ্বাস হইতেছে না। এখন বাড়ী না গেলে নিস্তার নাই।

রাম। কি বালক দেখ! ছি! তোমার মত বোকা আমি দু'টী দেখি নাই। এই দুই বৎসর সহরে র'য়েছ, তবু তোমার একটু পুরুষত্ব হ'ল না। একটা রমণীর ভয়েই চাকরি ছেড়ে দেবে।

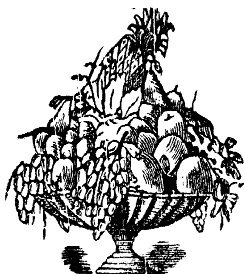
চারু। কি করি, মন বড় লঘু। ধর্ম্মের চেয়েত চাকরি বড় নয়।

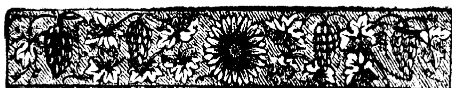
রাম। জানিনা ভায়া, তোমাদের ধর্ম্ম কেমন! দারুণ পিপাসায় পীড়িত হইয়া কোনও ব্যক্তি যদি তোমার কাছে একটু জল চায়, তবে তাহা না দেওয়াই তোমার ধর্ম্ম। তুমি তোমার ধর্ম্ম লইয়াই আছ। আমি দেখিতেছি তুমি ভয়ানক পাপ করিতেছ। প্রণয়-প্রার্থিনী রমণীকে প্রেম-দান না করা ঘোর অধর্ম্ম। মহাবীর অর্জ্জুনকেও সেজন্য পাপগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। সুন্দরীর দীর্ঘনিশ্বাসে তোমার প্রত্যহ একবৎসরের আয়ুঃক্ষয় হইতেছে।

তারপর উভয়ে অনেক কথা হইল। রামচরণ মহাজ্ঞানীর ন্যায় শত শত অকাট্য প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা যুক্তি-সিদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইলেন যে, চারুচন্দ্রের পক্ষে বিনোদবালার প্রণয় উপেক্ষাই অধর্ম্ম, রক্ষাই ধর্ম্ম।

চারুচন্দ্র তর্কে হারিলেন। কিন্তু রামচরণ উঠিয়া গেলে পর মনে

মনে ভাবিলেন, "রামচরণ যাহা বলিল তাহা কি সত্য ? তাহা হইলে জগতে পাপ বলিয়াত কিছু থাকে না। জানিনা ইহাতে পাপ পুণ্য কি ? কিন্তু আমি প্রভার কাছে অবিশ্বাসী হইতে পারিব না। এমন বিশ্বাসঘাতকতা আমি কি প্রকারে করিব ? সে অনন্য-শরণা, সরলা আমাকে বুক চিরিয়া স্থান দিয়াছে, সমস্ত সংসার ভুলিয়া আমাকে সার ভাবিয়াছে ; আমি তাহার পবিত্র প্রণয় কলুষিত করিব ? আমার গতি কি হইবে ?"





ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চারুচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, এখন একবার দেশে গিয়া প্রভাবতীকে দেখিয়া আসিলে, এ বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন। প্রবল মেঘমালা তাঁহার হৃদয়াকাশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, বিনোদবালা তাহাতে ক্ষণ-প্রভার ন্যায় অবিরাম ঝলসিতেছে। বারেকমাত্র প্রভাবতীর মুখচন্দ্র দেখিতে পাইলে, সে ঘনান্ধকার বিদূরিত হইবে, সে বিদ্যুৎ আকাশে মিলাইবে। কিন্তু মানুষ যাহা বুঝে, সকল সময়ে তাহা করিতে সমর্থ হয় না। চারুচন্দ্রের দেশে যাওয়া হইল না। এখন দেশে গেলে যে চাকরি থাকে না। বাঙ্গালী যদি দাসত্বের প্রতি বীতস্পৃহ হইতে পারিত, তবে বঙ্গের এত অধঃপতন হইবে কেন?

অগত্যা চারুচন্দ্র ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, যাহাতে বিনোদবালা হইতে পৃথক থাকিতে পারেন, সতত সেই চেষ্টাই করিবেন। অধিক সময় বাসায় থাকিবেন না, তাহা হইলে বিনোদবালাকে দেখিতে হইবে না। ইহাও প্রতিজ্ঞা করিলেন শীঘ্রই নিজের বাসা করিতে হইবে; বাবুদের বাড়ীর সংস্রব একবারে ত্যাগ করিবেন। প্রবল-স্রোতে বালির বাঁধ বাধিলেন। এত প্রতিজ্ঞা করিলেন, তবুত বিনোদবালা দৃষ্টিতে আসিয়া পড়ে, বিনোদবালা

সুযোগ পাইলেই তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে; প্রত্যহ তাঁহাকে খাবার আনিয়া দেয়। জানালার ভিতর দিয়াও তাঁহাকে দেখে। চারুচন্দ্র মনে করিলেন, "বিনোদবালাকে একদিন বলি, তুমি আমার এখানে আর আঁসিওনা।" বলি বলি করিয়া তাহা বলা হইল না। যে এত যত্ন করে, দেখিবামাত্র এমন মধুর হাসি হাসে, এই নির্ব্বান্ধব প্রবাসে এমন আপনজনের ন্যায় মমতা করে, তাহাকে কি এমন কথা বলা যায়? আরও সে কত বড় লোকের মেয়ে, রাজার ঘরের আদরিণী, আমাকে যে সে এত যত্ন করে সে তাহার মহাশয়ের পরিচয়মাত্র, তাহাকে এমন কথা কেমন করিয়া বলি। দেখি, আজত হইল না, কাল না হয় বলিব। বুঝিলাম, চারুচন্দ্র, তোমার নিস্তার নাই। সংসার-সমুদ্রে অশিক্ষিত নাবিকের ভাগ্যে এইরূপই ঘটিয়া থাকে! অধিকাংশই দিকহারা হইয়া অবশেষে মগ্ন হয়।

প্রায় একমাস এই ভাবে চলিল; তারপর প্রভাবতীর আবার পত্র আসিল। প্রভাবতী যে পত্র লিখিয়াছিল তাহা অবিকল আমরা পাঠকদিগকে শুনাইতেছি। কেবল তাহাতে যে ভাষাশুদ্ধি ও বর্ণাশুদ্ধি ছিল, তাহার কিছু সংশোধন করিয়া দিলাম, প্রভাবতী লিখিয়াছে;—

শ্রীচরণকমলেষু—

দাসীর সহস্র প্রণাম জানিবে। এতদিনে জানিলাম যথার্থই "আমাদের সুখের পথে কাঁটা পড়িল।" তুমি যে আর তেমনটী নাই, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি না ভ্রমেও কখনও মিথ্যা বলিতে না? এখন যে ঘোর মিথ্যাবাদী হইয়া পড়িয়াছ। তুমি বলিয়া গিয়াছিলে, ঋণ পরিশোধ হইলেই বাড়ী ফিরিবে। সে ঋণ পরিশোধ হইয়াছে; এখনও যে পরের দাসত্ব ছাড়িতে পারি-

তেছ না। পরের চাকরি করিতে তোমার বড় ঘৃণা ছিল জানি। বুঝি আরও তোমার এমন কতগুণ হইয়াছে। লোকেত কত কথাই বলিতেছে!

আগে জানিতাম তুমি আমারই অধীন। পাপকথা মুখে আনিতে নাই, তুমি কত বলিতে "আমি তোমার কেনা গোলাম।" কিন্তু এখন বুঝিলাম, পুরুষ কখনও কাহারও অধীন নয়। তাহারা স্বাধীন। কেবল স্ত্রীলোকগুলিকেই বিধাতা অধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এত কথা তোমায় কখনও লিখিব, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। অদৃষ্টে ছিল, তাই লিখিতে হইল। যাহা হউক, পত্রের উত্তর দিও। বাড়ীতে টাকাকড়ি পাঠাইবার কিছু আবশ্যক নাই। যদি শীঘ্র বাড়ী আসিতে না পার তবে লিখিও, আমি অলঙ্কারগুলি বেচিয়া তোমায় টাকা পাঠাইয়া দিব। তুমি টাকা বড় ভালবাস দেখিতেছি। তুমি আমার জন্য যে অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে দিয়াছ, তাহার প্রয়োজন কি? তাহা না করিয়া তুমি টাকাগুলি বাক্সে পুরিয়া রাখিও।

মা বড় কাঁদেন। তা কি করিব, তাঁহার অদৃষ্টের দোষ। ভবচন্দ্র ভাল আছে। সেই হতভাগাই আমায় এত জ্বালাতন করিতেছে, সে যদি না থাকিত তবে আমি আপন পথ খুঁজিয়া লইতাম; তোমরা স্বাধীন, দেশে বিদেশে বেড়াইতে পার; কিন্তু জানিও আমরা ঘরে বসিয়াও কোনও কোনও বিষয়ে স্বাধীন।

সত্য বলি, আমার ন্যায় সৌভাগ্যবতী কেহ ছিল না, বিধাতা আমার প্রতি কি যথার্থই বাম হইয়াছেন?

হতভাগিনী সেবিকা,

প্রভাবতী দাসী।

পত্র পাইয়া চারুচন্দ্রের অত্যন্ত দুঃখ হইল। তিনি বুঝিলেন, প্রভাবতী তাঁহার চরিত্রে সন্দেহ করিয়াছে। না করিবে কেন? আমি ত সন্দেহের কাজই করিয়াছি, বড় দুঃখে পড়িয়া এই পত্র লিখিয়াছে। এরূপ পত্র সেত আর কখনও লেখে নাই। যাহা হউক, আমি নিশ্চয়ই বাড়ী যাইব। সকল কথা তাহাকে খুলিয়া বলিব। আমি এরূপভাবে ডুবিতে গিয়াও নিষ্কৃতি পাইয়াছি, শুনিয়া সে কত আহ্লাদিত হইবে!

এমন সময়ে রামচরণ আসিল। চারুচন্দ্রের হস্তে পত্র দেখিয়া বলিল, "কি পত্র? কোথা থেকে এল? বাড়ীর পত্র যেন।"

চারুচন্দ্র রামচরণকে পত্রখানি পড়িতে দিলেন। রামচরণ পত্রখানি আদ্যোপান্ত পড়িল; পড়িয়া বুদ্ধিমানের মত মুখখানি বিলক্ষণ গম্ভীর করিয়া বলিল, "হুঁ! এই প্রভাবতী আবার সরলা!"

চারু। তুমি কি ভাবিতেছ কুটিলা?"

রাম। এ যদি সরলার কথা হয়, তবে জগতে কুটিলতা ব'লে কোনও কথা নাই। যে রমণী এত অভিমানিনী, সে আবার সরলা, পতিব্রতা!

চারু। তুমি কি প্রভার সতীত্বেও সন্দেহ করিতেছ?

রাম। আমার মন ভালনা, তাই সন্দেহ করিতেছি। সে যে সতী সাবিত্রী! তুমি তাহার 'কেনা গোলাম', তোমার কাছে সে অবশ্য সতী। দেখনা লিখিতেছে, 'আমরাও ঘরে বসিয়া কোনও কোনও বিষয়ে স্বাধীন হইতে পারি।' স্বাধীন বোধ হয় হইয়াছেন।

চারু। ছি! তুমি স্ত্রীচরিত্র জাননা। নিতান্ত দুঃখে পড়িয়া একথা লিখিয়াছে।

রাম। আমি তাহাকে নিন্দা করিতেছি না; এরূপ অবস্থায়

পড়িয়া সকল স্ত্রীলোকেই এমনি করিয়া থাকে। এর চেয়ে উচ্চ অন্তঃকরণের স্ত্রীলোক আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। ইহারা নিতান্ত অসার-জীব। যতদিন দৃষ্টির মধ্যে থাকে, ততদিন কত ভালবাসা দেখায়; দৃষ্টির বাহির হইলে সব ভুলিয়া যায়। আমি এমন হাজার হাজার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। 'বিশ্বাসঃ নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।'

চারু। যাহা হউক, আমাকে বাড়ী যাইতেই হইবে।

রাম। তা যাইবে বই কি! তুমি নিতান্ত কাপুরুষ। যাহার বিন্দুমাত্র পুরুষত্ব আছে, সে কখনও স্ত্রীর এরূপ দুই একটা অভিমানের কথা শুনিয়া আতঙ্কে কম্পিত হয় না। যথার্থই তুমি স্ত্রীর গোলাম। যে স্ত্রী তোমার চরিত্র সম্বন্ধে এহেন সন্দেহ করিয়া তোমাকে এমন তিরস্কার করিয়াছে, তুমি তাহারই জন্য এত পাগল হইয়াছ। ধিক্ তোমায়!

চারু। তুমি এরূপ হইলে কি কর?

রাম। আমি এমন স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপও করিনা।

চারুচন্দ্র আর কথা বলিলেন না। রামচরণও কিছুকাল নির্ব্বাক রহিল। তারপর বলিল, "আজকাল বিনোদবালার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কি?"

চারুচন্দ্র পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সেইজন্যইত বলি. বাড়ী যাওয়া ভাল। নইলে বিনোদবালার রূপ-বহ্নিতে পুড়িয়া ছারখার হইতে হইবে।"

রাম। বিনোদবালার প্রতি এত নির্দ্দয় কেন?

চারু। সত্য কথা ভাই, আমি বিনোদবালার প্রতি বড় নির্দ্দয়। কিন্তু কি করিব, আমি সম্পূর্ণ অনায়ত্ত।

তখন রামচরণ ও চারুচন্দ্র কত কথা বলিলেন। বিনোদবালাকে ভালবাসা চারুচন্দ্রের একান্ত কর্ত্তব্য, ভাল না বাসা পরম অধর্ম্ম, ইহা রামচরণ চারুচন্দ্রকে বুঝাইতে অনেক চেষ্টা পাইলেন। প্রভাবতী অপেক্ষা বিনোদবালা চারুচন্দ্রকে অধিক ভালবাসে ইহাও বুঝাইলেন।

ইহার জন্য রামচরণের এত মাথাব্যাথা কেন? একথা পাঠক-বর্গ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। রামচরণের ইহাতে দুইটী উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ বিনোদবালার সৌন্দর্য্যানলে চারুচন্দ্র যেমন দগ্ধ হইতেছেন, রামচরণও তদ্রূপ। কিন্তু গর্ব্বিতা বিনোদবালা সামান্য কর্ম্মচারী বাড়ীর সরকারের প্রতি একটুমাত্রও অনুগ্রহ-কটাক্ষ করিতে রাজি নহে। তাই বিনোদবালার প্রতি রামচরণের জাত-ক্রোধ, যদি সে চারুচন্দ্রের বশীভূত হয়, তবে সে এসমস্ত ব্যক্ত করিয়া তাহাকে স্বচ্ছন্দেই প্রতিশোধ দিতে পারিবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য চারুচন্দ্র উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন; ক্রমাগত তাঁহার পদোন্নতি হইতেছে। একেবারে হেড্ ম্যানেজারের পদ পাইয়াছেন। রামচরণের এতটা সহিত না। আরও, চারুচন্দ্র বড় চরিত্রের গৌরব করেন; কর্ত্তারা তাঁহার চরিত্রের জন্য তাঁহাকে এত আদর করেন। এইক্ষণ চারুচন্দ্র ফাঁদে পড়িয়াছেন; কোনও রূপে এই ফাঁদে তাঁহাকে ভালরূপে আট্‌কাইতে পারিলে, তাঁহার মান প্রতিপত্তি সমস্তই যে চূর্ণ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। জগতে এমন নিকৃষ্ট বন্ধুর অভাব নাই।

যাহা হউক চারুচন্দ্র রামচরণের কথায় বড় বিশ্বাস করিলেন না। দেশে যাইবার জন্য বাবুর কাছে বিদায় চাহিলেন। তখন অনেক কাজ, বিদায় পাইলেন না। বাবু বলিলেন, একমাস পরে বিদায় পাইবে। অগত্যা তাহাই করিতে হইল; চাকরিত্যাগ করা যায়না।

চারুচন্দ্র প্রভাবতীর পত্রের উত্তর লিখিবেন লিখিবেন করিয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন। কি লিখিবেন স্থির করিতে না পারাতেই লেখা হইল না। প্রভাবতীর কাছে পত্র লিখিতে তাঁহার বড় লজ্জা হইল।





চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাবতী ভাবিয়াছিল ঋণ পরিশোধ হইলেই চারুচন্দ্র বাড়ী আসিবেন। যাত্রাকালে তিনি তাহাই বলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। কিন্তু সরলার সে বিশ্বাস টিকিল না। স্বামী বাক্যানুসারে কাজ করিলেন না। বড় দুঃখ হইল, বড় অভিমান হইল। যথার্থই কি আমার পায় ঠেলিলেন? অনেক-বার একথাটী মনে জাগিল। তারপর অভিমানভরে সেই পত্র-খানি লিখিল। ভাবিল, এবার নিশ্চয়ই বাড়ী আসিবেন; আমি সামান্যমাত্র রাগ করিলে কত অনুনয় করিতেন, আমার প্রতি তাঁহার কত ভালবাসা ছিল! এত ভালবাসা কি দুই বৎসরের অদর্শনে ফুরাইয়া যায়?

হায় সরলে, বিধি প্রতিকূল হইলে সাগরও শোষিয়া যায়। আজ কাল করিয়া দিন গত হইল; চারুচন্দ্র দেশে ফিরিলেন না। চিঠিখানি মাত্রও লিখিলেন না। তবেত কপাল ভাঙ্গিয়াছে! যোগমায়া একদিন একটী কথা বলিয়াছিল; কথাটী কি, ভাল করিয়া জানিবার জন্য প্রভাবতীর ইচ্ছা হইল। সে যোগমায়াকে ডাকিয়া পাঠাইল।

যোগমায়া প্রায়ই প্রভার বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া থাকে। কিন্তু যে দিন সে চারুচন্দ্রের কুৎসা প্রভাবতীর কাণে দিয়াছে,

সেই দিন হইতে প্রভাবতী তাহার সঙ্গে আর বাক্যালাপ পর্য্যন্তও করে না। যোগমায়া কত আদর করিয়া প্রভাবতীর সঙ্গে আলাপ করিতে যায়, প্রভা কার্য্যান্তরের ভাণ করিয়া তাহার কাছ থেকে উঠিয়া যায়।

যোগমায়া পরাস্ত হইল। নায়েব মহাশয়ের মনোরথ সিদ্ধির কোনও উপায় দেখিতে পাইল না। নায়েব মহাশয় কিন্তু দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার যোগমায়ার গৃহে আসিতে ভুলিতেন না। নগদ দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত ডাকিয়াছেন; পাঁচশত টাকা পুরস্কার হাঁকিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যসিদ্ধির কোনও সুযোগ না পাইয়া যোগমায়া বড় বিষণ্ণ হইল। নায়েব মহাশয় সে দিন বলিয়া গিয়াছেন, "জানিতাম তোমার অসাধ্য কিছুই নাই; এই সামান্য কাজটায় হারিলে। তা যাহা হউক, সহজে না হয় অগত্যা বলে হইবে। যখন ধরেছি, তখন ছাড়া হবে না। তেমন কাপুরুষ আমি নই।"

আজ প্রভা স্বয়ং ডাকিয়া পাঠাইয়াছে শুনিয়া, যোগমায়ার বড় আনন্দ হইল। তাড়াতাড়ি করিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। প্রভাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবামাত্র যোগমায়া বলিল, "কি বউ, ডেকে পাঠিয়েছ কেন? তোমার কাছে আস্‌তে ভাই আমার কান্না পায়। তোমার মুখের পানে চাইলে বুক ফেটে যায়। অনেক সময়ে ভাবি আর আস্‌ব না, তা আবার দুই একদিন না দেখলে প্রাণটা কেমন করে।"

প্রভাবতী ভাবিল, যোগমায়া যথার্থই তাহার প্রতি স্নেহশালিনী। দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয় সহানুভূতি পাইলে কাঁদিয়া উঠে প্রভাবতী কাঁদিয়া বলিল, "অদৃষ্টে দুঃখ থাকিলে কে খণ্ডাবে?"

যোগমায়া স্বরটী বেশ ভারী করিয়া একটু লম্বাসুরে বলিতে

লাগিল, "নিষ্ঠুর বিধাতা স্ত্রীলোকের ভাগ্যেই যত দুঃখ লিখে রেখেছেন। আমরা অবলা জাতি বলিয়া নিষ্ঠুর পুরুষেরা আমাদিগকে এত পীড়ন করে, পরমেশ্বর কি তাঁর বিচার ক'রে থাকেন?"

প্রভা। পরমেশ্বরের দোষ কি ভাই, যে যেমন কর্ম্ম ক'রে এসেছে, সে তেমন ফল ভোগ কচ্ছে। পূর্ব্ব জন্মে কত মহাপাপ করে এসেছিলাম, তাই এত কষ্ট।

যোগ। ভাল, চারুর আজকাল কিছু সংবাদ রাখ কি?

প্রভা। এবার পত্র লিখিয়া উত্তর পাই নাই।

যোগ। আর পেয়েছ বোন!—তিনি কি আর তোমার আছেন?

প্রভাবতীর কোমল বক্ষে সহস্র বজ্রাঘাত হইল। এই কথার অনুসন্ধান করিবার জন্যই সে যোগমায়াকে ডাকিয়াছে। কিন্তু যোগমায়া কথাটী পাড়িবামাত্র তাহার হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল। এমন কথাও শুনিতে হয়! স্বামীর কলঙ্ক পরের কাছে কি শোনা যায়? হা অদৃষ্ট! কাতরকণ্ঠে অধীর-হৃদয়ে প্রভা বলিল, "তিনি আমায় বড় ভাল বাসিতেন।"

যোগ। পুরুষের আবার ভালবাসা! ও কেবল মায়া দেখান। তবে সকল পুরুষ অবশ্য সমান নয়। এই দেখনা, আমাদের কাছারীর নায়েব মহাশয়; বেশ লোকটী, যাকে ভালবাসে তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। প্রায়ই আমার বাড়ীতে আসে যায়, খায় দায়, কেমন আপন ভাবে দেখে। দেখতে, শুনতে বেশ সুপুরুষ।

প্রভা। থাক্ দিদি। পরের কথা শুনিয়া কি হইবে? আমার স্বামীর ন্যায় গুণবান্ পুরুষ ক'জন ছিল? আমি নিতান্ত হতভাগিনী, তাই আমার নিষ্কলঙ্ক চাঁদে কলঙ্ক ঘটিল।

"তা, দেখ, এই নায়েব মহাশয়ের বয়স এমন অধিক হয় নাই;

সম্প্রতি স্ত্রীটী মরিয়া গিয়াছে; কিন্তু বিবাহ করিতে কিছুতেই রাজি নন।” বলিয়া যোগমায়া পুনর্ব্বার নায়েব মহাশয়ের গুণ-বর্ণনা আরম্ভ করিল। প্রভাবতীর তাহা ভাল লাগিল না; বলিল, “সতীর পক্ষে পরপুরুষের সমালোচনা করিতে নাই। ও সব রাখিয়া দাও। বল, সত্যসত্যই কি আমার কপাল পুড়িয়াছে?”

যোগমায়া তখন কত কথা বলিল। চারুচন্দ্র যে কলিকাতায় পররমণীর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন, ইহা শত ব্যক্তি চাক্ষুষ দেখিয়া তাহার কাছে বলিয়াছে। তাহার একজন সই সে দিন গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন, তিনিও চারুচন্দ্রকে একটা বেশ্যার সঙ্গে গাড়ি হাঁকাইয়া গড়ের মাঠে যাইতে দেখিয়াছেন। ইত্যাদি প্রকারে প্রভাবতীকে বুঝাইল, তাহার স্বামী নিতান্ত অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছে। নায়েব মহাশয়ের কথা তুলিলে প্রভাবতী অসন্তুষ্ট হয় বলিয়া, যোগমায়া সে কথা বড় তুলিতে পারিল না। মনে মনে ভাবিল বল ভিন্ন কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক যোগমায়ার সঙ্গে প্রভাবতীর যথেষ্ট সদ্ভাব স্থাপিত হইল। যোগমায়া এখন প্রত্যহ প্রভার বাড়ী আসিত।





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দুঃসময়ে পণ্ডিত ব্যক্তিরও বিপরীত বুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। যোগমায়াকে প্রভাবতী চিরকালই অতি দুষ্ট বলিয়া জানিত, এখনও জানে। কিন্তু তাহার এই অনন্ত দুঃখের সময়ে যোগমায়া কত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। ব্যাধ-বাদিত বীণাধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া হরিণী যেমন জালে আবদ্ধ হয়, পাপিষ্ঠা যোগমায়ার বাহ্য-মধুর স্নেহালাপে মুগ্ধ হইয়া সরলা প্রভাবতীও তেমনি মায়াবদ্ধ হইল। প্রভাবতী অবলা, নিরাশ্রয়া, অকূল সাগরে পড়িয়াছে; কেবলমাত্র যোগমায়াকে নিকটে দেখিতেছে; পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই বলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

সে দিন যোগমায়া স্বামীর মন ফিরাইবার ঔষধ বলিয়া দিয়াছে। কাজ বড় ভয়ানক; অমাবস্যার নিশীথ কালে একাকিনী বাগানে গিয়া বৃক্ষের মূল তুলিতে হইবে। প্রভার দিনের বেলাও বাটীর বাহির হইতে ভয় হয়। কিন্তু উপায় কি?—সে যে সর্ব্বস্বান্ত হইতে চলিয়াছে! যাহা অদৃষ্টে থাকে, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব ভাবিয়া প্রভা অমাবস্যার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আজ সেই অমাবস্যার রাত্রি, সমস্ত জগৎ ঘোর অন্ধকারময়। অন্ধকারের বিরাট ভীষণ কালিমা-মূর্ত্তি ভিন্ন কিছুমাত্র লক্ষিত

হইতেছেনা। গভীর রজনী, সকলেই নিদ্রিত। ধীরে ধীরে প্রভা দ্বার খুলিল। তাহার সর্ব্বশরীর ভয়ে শিহরিয়া উঠিল; বাহিরের অনন্ত অন্ধকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রভা চক্ষু মুদিল। অতি দুঃখে কান্না আসিল। হায়! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? আমি স্বামীর মন ভুলাইবার জন্য চাতুরী করিতেছি। আমার কি হইল? আমার স্বর্গের সিংহাসন যথার্থই কি অসুরে অধিকার করিয়াছে? আমার পবিত্র দেবমন্দিরে যথার্থই কি পিশাচে আশ্রয় লইয়াছে? আমি একথা বিশ্বাস করি কেন? আমি যেমন তাঁহাকে ভালবাসি, তিনি আমায় তদপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। আমার চিত্তে তাঁর প্রতি ভালবাসারত বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তবে তাঁহার ভালবাসায় সন্দেহ করিতেছি কেন? তিনি কি আমা অপেক্ষা হীন? ছি! আমি অবলা রমণী, তিনি বলবান পুরুষ! আমি দাসী, তিনি প্রভু! আমি শিষ্যা, তিনি গুরু! তাঁহার চরিত্রে আমার অবিশ্বাস হয় কেন?"

অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রভা ভাবিল, কত কাঁদিল। কিন্তু মনত বুঝিল না। "পুরুষ স্বাধীন। স্ত্রীলোক যেমন পুরুষের অধীন, পুরুষ তেমন স্ত্রীলোকের অধীন নয়। এক স্ত্রীর একাধিক পুরুষে আসক্ত হওয়া যেমন পাপ, পুরুষের বুঝি একাধিক স্ত্রীতে আসক্ত হওয়া তেমন পাপ নয়। তিনি অন্য রমণীর প্রতি আসক্ত হইতে পারেন; তাহাতে বোধ হয় তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না। কিন্তু আমি কি চিরতরে বঞ্চিত হইব? যে রাজ্যে আমার ন্যায্য অধিকার, তাহা অন্যে অধিকার করিবে, আমি কি কিছুই করিতে পারিব না?"

প্রভা দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। তখন ঘুমন্ত শিশু ভবচন্দ্র

কাঁদিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া প্রভা গৃহে গিয়া পুত্রকে সান্ত্বনা করিল। পুত্র নিবৃত্ত হইয়া মায়ের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল, "মা দাদাল কাছে দাই।"

ভবচন্দ্র রামকৃষ্ণকে দাদা বলিয়া ডাকিত। অধিক সময় তাহার কাছেই থাকিত। সে দাদার বড় অনুরক্ত। ঘুমের ঘোরেও দাদাকে ডাকিয়া উঠিত।

প্রভা পুত্রকে কোলে লইয়া বলিল, "দাদা! ঘুমাইয়াছে, তুমি ঘুমাও।"

ভবচন্দ্র বলিল, "দাদাল কাছে দাই। দাদা বলেছে বাবাকে আন্‌তে দাবে।"

প্রভা। তিনি আস্‌বেন না।

ভব। আমি দাদাল চঙ্গে বাবা দেক্‌তে দাব।

অন্ধকারে পুত্রকোলে লইয়া প্রভা অনেক কাঁদিল। আমাকে ভুলিতে পারিয়াছেন; কোন রূপবতীর প্রেমে পড়িয়া আমায় ভুলিয়াছেন, কিন্তু এ শিশুমুখের সুধামাখা দুইটী কথা শুনিলে কি ভুলিতে পারিবেন? একবার কি পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে দেশে আসিবেন না?

ভবচন্দ্র আবার ঘুমাইল। প্রভা আবার শয্যা হইতে উঠিয়া দ্বার খুলিল। আবার সে দুর্ভেদ্য অন্ধকার দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। করযোড় করিয়া মনে মনে বলিল, "হরি হে! জগন্নাথ! আমি অবলা, বল নাই, তাই চাতুরী করিয়া আত্ম-অধিকার রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমার মনোরথ সফল কর প্রভু।"

ভয়ে ভয়ে, ধীরে ধীরে, কম্পমান-কলেবরে অভাগিনী প্রভাবতী সেই নিশীথ অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে

শিশির পতনের টুপ্ টুপ্ শব্দ, মাঝে মাঝে গলিত পত্র পতনের সড়্ সড়্, শাখাসীন পক্ষিগণের পক্ষ-সন্তাড়ন ঝর্‌ঝর্, কদাচিৎ দুই একবার পেচকের রুক্ষস্বর শ্রুত হইতেছিল। প্রতি শব্দে প্রভাবতীর অঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছিল।

সহসা অদূরে অতি সাবধান-সঞ্চালিত মনুষ্য-পদধ্বনি অনুভূত হইল। প্রভাবতীর চরণ আর চলিল না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কতক্ষণ দাঁড়াইল। তারপর ভাবিল কাজ নাই, গৃহে ফিরিয়া যাই। কিন্তু পশ্চাতে ফিরিয়া গৃহাভিমুখে যাইবে এমন শক্তি তাহার নাই। ভয়ে তাহার সর্ব্ব শরীর আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইষ্টদেবের নাম পর্য্যন্ত স্মরণে আসিতেছে না।

অনতিবিলম্বে ঘটনা আরও ভীষণ হইল। চারিদিক হইতে ৫।৬ জন লোক আসিয়া চক্ষুর নিমেষে তাহার হস্তপদ মুখ বন্ধ করিল। মনুষ্যাঙ্গ স্পর্শমাত্রই তাহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। প্রভার অদৃষ্টে যাহা ছিল ঘটিল। পরদিন সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়াও দেবগ্রামে কোথাও প্রভাবতীর অনুসন্ধান পাওয়া গেল না।

প্রথমে যে শুনিতে পাইল সেই দুঃখ পাইল। রায়েদের বউটী বড় ভাল মানুষ ছিল। কে তাহার সর্ব্বনাশ করিল। তারপর আঁচাআঁচি কানাকানি হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বাড়ী বাড়ী রমণীদলের সভা বসিয়া গেল। একজন বলিল, "ওমা! দিনে দিনে হ'ল কি?" আর একজন তাহাতে সমর্থন করিয়া বলিল, "মানুষকে এখন চেনা ভার।" কেহ বলিল, "আমার কিন্তু তেমনটা বিশ্বাস হয় না। বউটীত কারও চ'কের দিকে চেয়ে কথাটীও বল্‌ত না।" তখনই উত্তর হইল, "হ্যাঁ। সন্ন্যাসী চোর না ল্বোচকায় ঘটায়! মানুষ বল্‌তে কি আর বিশ্বাস আছে? ঐ যে

যোগমায়া ঠাকরুণ বড় ঘন ঘন রায়বাড়ী যাতায়াত কর্ত্তেন। উনিত এর ঘটক। ও মাগীর পা যেখানে পড়্‌বে সেখানে কি আর মঙ্গল আছে?”

ইত্যাদি নানা তর্ক বিতর্কের দ্বারা সেইদিন দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইল চারুচন্দ্র রায়ের স্ত্রী অভিসারিকা হইয়া কুল ছাড়িয়া পলাইয়াছে।





ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বাবুদের বাড়ীর পশ্চাতে মধ্যম রকমের একটী প্রমোদোদ্যান। উদ্যানের তিন দিক দেওয়ালে পরিবেষ্টিত, অন্যদিকে বাবুদের অট্টালিকা। শ্বেত, পীত, লোহিত, জরদ, হরিত প্রভৃতি নানাবর্ণের নানাদেশীয় পুষ্পবৃক্ষে উদ্যানটী সুসজ্জিত; মধ্যে ছোট রকমের একটী পুষ্করিণী, তাহাতে নানারকমের মৎস্যসকল খেলা করিতেছে। নববসন্তাগমে শ্যামল-পল্লবাসনে প্রফুল্লকুসুমরাজি সৌন্দর্য্যের হাট মিলাইয়া, সায়াহ্ন-সমীরণে ধীরে ধীরে গৌরবে দুলিতেছে। প্রকৃতির হেথা পূর্ণ স্ফূর্ত্তি। মানব-প্রকৃতিও এখানে অসীম স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে। এ বাজারে সবারই সখের জিনিষ মিলে। তুমি ভগবৎ-প্রেমে মত্ত, আরও প্রেম চাও, এই স্থানে এস সাধ মিটিবে। ভগবানের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া তোমার সাত্ত্বিকতা আরও স্ফূর্ত্তি পাইবে, পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অভীষ্টের শ্রীচরণ পূজা করিও, অতুল শান্তি পাইবে। তুমি রসিক নবযুবক, প্রেয়সীর সুধাহাসিতে মন, প্রাণ মাতাইতেছ, আর ভাবিতেছ,—প্রণয়িনীর ফুল্লাধরের হাস্যচ্ছটা আরও মধুময় হয় কিসে? প্রেমিকা-কর ধারণ করিয়া এই স্থানে এস; বেল মল্লিকা চাঁপা সুন্দরীরা হাসিয়া হাসিয়া তোমার

প্রিয়তমাকে আরও হাসাইয়া দিবে, তোমার সাধ পুরিবে। আর তুমি বিরহী, অতীত সুখস্মৃতি,—যাহা সততই তোমার মনে আছে কিন্তু বিশৃঙ্খল ভাবে রহিয়াছে, বর্ষান্তে বিচ্ছিন্ন মেঘ-খণ্ডবৎ তোমার হৃদয়াকাশে প্রতিপলে আলোকাধাঁরে ভাসিতেছে; তোমার মনঃ-প্রাণ আকুল করিয়া তুলিয়াছে—বড় সাধ হইতেছে সেই বহু-দিনাস্তমিত পূর্ণচন্দ্রমার ছায়াখানি এ অমাবস্থার রজনীতে মানসা-কাশে উদিত করিয়া একবার বিরলে বসিয়া কাঁদিবে। এস, এই পুষ্পোদ্যানে এস, অতীত স্মৃতিসকল একীভূত হইয়া তোমার অন্তরে জাগিবে, তোমার সাধ পুরিবে। আর তুমি সুন্দরী-কটাক্ষে মুগ্ধ হইয়াছ, বড় সমস্যায় পড়িয়াছ, প্রতি মুহূর্তে বিদ্যুৎ-স্ফূর্তিবৎ সে বিশাল নেত্রের কটাক্ষ তোমার অন্তরে জাগিয়া তোমায় দিকহারা করিয়া দিতেছে; শুনিয়াছ রমণীকটাক্ষে অগ্নি আছে, তাই ভয় পাইতেছ, যদি পুড়িয়া মরি। তবে এই স্থানে এস মন্মথ-সহচরী পুষ্প-সুন্দরীরা হাসিয়া হাসিয়া তোমায় উৎসাহিত করিবে, কোকিল মধুরগানে তোমার প্রাণ নাচাইয়া তুলিবে। কটাক্ষে যে আগুন আছে সে ভয় আর থাকিবে না। সবারই সব মিলিল; কবির কাব্যরসও কি মিলিবে? মিলিবে বই কি? আর কিছু না হউক দুই একটী শ্রুতি-মধুর সরস বিশেষণ অবশ্যই মিলিবে।

উদ্যান মধ্যে চারুচন্দ্র একাকী ধীরে ধীরে চলিতেছেন। নানা-কারণে তাঁহার মন বড় ব্যতিব্যস্ত, শরীর অসুস্থ, তাই আজি ভ্রম-ণের বড় ইচ্ছা ছিল না। বাগানে আসিয়া একটু শান্তি-লাভ করিবেন ভাবিয়াছিলেন। বাগানের দুটী খণ্ড, একটী পুরুষদিগের জন্য একটী স্ত্রীলোকদিগের জন্য। কতকগুলি নিবিড় লতাকুঞ্জের সারি এই দুটী খণ্ড বিভক্ত করিয়াছে। যে খণ্ড পুরুষদিগের জন্য

নির্দ্দিষ্ট, চারুচন্দ্র সেই খণ্ডে এপাশ ওপাশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কখনও ধীর-সমীরে ক্ষুদ্র-বীচি-বিক্ষোভিত-সরসীবক্ষে অস্তগমনোন্মুখ-রবিকিরণচ্ছটা নিরীক্ষণ করিয়া ষোড়শী-উরসে মুক্তামালার তুলনা করিতেছিলেন, কখনও নির্ম্মল নীলাম্বরতলে নীলাম্বু-স্রোতোবাহিত চঞ্চলতরণীবৎ মন্দ-বায়ু-সঞ্চালিত নীরদখণ্ড দেখিয়া মানব-আশার চঞ্চলতা উপমা করিতেছিলেন, কখনও বা প্রস্ফুটিত কুসুম-সুশোভিত বিহঙ্গম-কূজিত মলয়-পরিদোলিত তরুরাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে কত ভাব তুলিতেছিলেন। চারুচন্দ্র একটু দেখিতেছেন, একটু ভাবিতেছেন, একটু চলিতেছেন।

অকস্মাৎ চারুচন্দ্রের এ চঞ্চলতা অবরুদ্ধ হইল। হৃদয়ে একটী ভাব অঙ্কুরিত হইতে যাইয়াই বিলীন হইল। নেত্রদ্বয় একটী নব-কুসুমের সৌন্দর্য্য নিমেষমাত্র দৃষ্টি করিয়াই ফিরিল। শ্রবণ-যুগল বিহঙ্গম-কূজনের অস্তিত্ব অনুধাবন করিতে আর পারিল না। চরণ আর চলিল না। অদূরে লতাকুঞ্জান্তরালে গীত হইল,—

যার তরে আঁখি ঝুরে
সে কেন চায়না ফিরে?
আমারে যে জ্বালায় এত, সে কেন জ্বালায় না তারে?
হারেরে নিঠুর বিধি, কেন দিলে প্রেম-নিধি,
গড়িলে পুরুষ যদি দিয়ে এ পাষাণরে।

সঙ্গীত! তোমার আকার নাই;—কিন্তু কোন্ সাকার বীর তোমার ন্যায় শক্তিশালী? জগতে যেই নিরাকার সেই অজেয়। পরমাত্মা নিরাকার, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। কন্দর্প নিরাকার, তাঁহার শক্তিতে বিশ্বেশ্বর অবনত। বায়ু নিরাকার, কিন্তু উত্তুঙ্গ ভূধর তাঁহারই শক্তিতে কম্পিত। সঙ্গীত, সেই বায়ু তোমার বাহন,

তুমি অজেয় হইবে না কেন? আরও তুমি যখন রমণীকণ্ঠে ভর কর, তখন সেই নিরাকার কন্দর্প ঠাকুরটীও তোমার রথে আসিয়া চাপিয়া বসেন। তুমি সব পার। যে প্রশান্ত চিন্তাশীল যুবক নিসর্গ-শোভায় মন ডুবাইয়া কত ভাব তুলিতেছিল; মুহূর্ত্তে তাহার মনঃপ্রাণ বিশৃঙ্খল করিয়া দিলে। মুহূর্ত্তে চারুচন্দ্র নিশ্চল, জল-মগ্নোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় দিকহারা, বিহ্বল, বিমুগ্ধ! কে গায়? বুঝি কোনও গন্ধর্ব্ব-নায়িকা এ মর্ত্ত্য-কুঞ্জে আসিয়া প্রমোদ করিতেছেন? যে দিক হইতে সঙ্গীত প্রবাহ আসিতেছিল চারুচন্দ্র সেই দিকে অগ্রসর হইলেন; নিবিড় পত্রান্তরাল ভেদ করিয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে গায়িকার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ছি! চারুচন্দ্র! কাজ কি? গান শুনিয়াছ সেই ভাল। গায়িকাকে দেখিতে এত আবেগ কেন? তোমায় দেখিলে তাহার যে কত লজ্জা হইবে! উদ্যানের ওঅংশ যে স্ত্রীলোকের জন্য, তুমি ওদিকে অমন সাবধান কটাক্ষ করিতেছ, অন্যে দেখিলে কি বলিবে?

চারুচন্দ্রের এসব কিছুই মনে হইল না। লতাকুঞ্জের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া স্থির নয়নে চারুচন্দ্র দেখিতে পাইলেন, অন্ধকার-গর্ভ-নিহিত সূর্য্যকান্ত-মণির বিন্দুবিন্দু প্রভা পল্লবান্তরাল ভেদ করিয়া ফুটিতেছে। নিবিড় হরিৎ-পল্লবরাজি পরিবেষ্টিত হইয়া একটী নব-প্রস্ফুটিত পরিমল-ভারাক্রান্ত স্থলপদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। নব ঘনাভ্যন্তরে একটী নিশ্চল বিদ্যুৎরেখা প্রতিফলিত রহিয়াছে? সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা বেশ-পারিপাট্য-সুসজ্জিতা কলাবতী বিনোদবালা নির্জ্জন লতাকুঞ্জে বসিয়া গীত গাইতেছে। চতুঃপার্শ্বস্থ প্রফুল্ল-পুষ্প-দাম-সৌরভ-রাশি সুন্দরীর অঙ্গ-সৌরভে বিমিশ্রিত হইয়া উদ্যান-

স্থল অপূর্ব্ব মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। ঊর্দ্ধে নির্ম্মলাকাশে সপ্তমীর চাঁদ পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতেছে। দিবাকর-বদন আর লক্ষিত হইতেছে না; কেবলমাত্র পশ্চিম গগন স্বুবর্ণ-প্রলেপে রঞ্জিত রহিয়াছে। মস্তকের উপর দিয়া পক্ষিকুল উড়িয়া উড়িয়া গাছে গিয়া লুকাইতেছে।

বিমুগ্ধের ন্যায় চারুচন্দ্র কতক্ষণ মৌনভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গীত সমাপন করিয়া বিনোদবালা চিন্তাকুলিতার ন্যায় গম্ভীর-বদনে উপবিষ্ট, কর্ণভূষণ অল্প পরিদোলিত হইতেছে। বিনায়িত বেণী-মধ্য হইতে দুই একটী অলকগুচ্ছ ললাটের উপর পড়িয়া অতি ধীরে ধীরে নড়িতেছে। চারুচন্দ্র একনয়নে বিনোদ-বালাকে দেখিতে লাগিলেন। বিনোদবালাকে আর দেখিবেন না, তাহাকে আর দৃষ্টির মধ্যে আসিতে দিবেন না, যে প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন তাহা ভুলিয়া গেলেন? অধিকাংশ যুবকেরই প্রতিজ্ঞা এমনি অসার।

কতক্ষণ পরে বিনোদবালা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া আপনাআপনি বলিল, "বিধাতা, আমার অদৃষ্টে এত দুঃখ লিখেছিলে?"

সুন্দরীর দীর্ঘনিশ্বাস চারুচন্দ্রের হৃদয়ে গিয়া বাজিল। যে হৃদয়ে গায়িকার গীতধ্বনি এখনও তালে তালে নাচিতেছিল, এই স্বগত কথাটীও সেই হৃদয়ে গিয়া লয় হইল। চারুচন্দ্র ভাবিলেন, বিনোদবালার গানটী মর্ম্মান্তিক। কথাটীও মর্ম্মান্তিক! বিনোদ-বালা যথার্থ দুঃখিনী। চারুচন্দ্র আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ব্যস্ত হইয়া সাড়া দিলেন, "কে? বিনোদ?"

বিনোদবালা চমকিয়া উঠিল। গ্রীবাদেশ ঈষৎ বঙ্কিম করিয়া,

বিদ্যুতাগ্নিবর্ষী কটাক্ষ তাঁহার মুখের প্রতি নিপতিত করিল। চারুচন্দ্র দেখিতে পাইলেন বিনোদবালার তাম্বুলরঞ্জিত অধরোষ্ঠে ঈষৎ হাস্যচ্ছটা প্রকাশিত হইয়াছে। আবার সেই হাস্য-প্রদীপ্ত ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত করিয়া বিনোদবালা আর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। পাঠক, কখনও কোনও চন্দ্রাননী যুবতীকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে দেখিয়াছেন কি? কখনও কোনও মর্ম্মদুঃখ-পীড়িতা ষোড়শীবালার ওষ্ঠাধর-কম্পন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি? কখনও কোনও বসন্তপ্রফুল্ল-কুসুম-সম্ভারপরিশোভিত কোকিল-কূজিত ললিত-লতাকুঞ্জান্তরে কলাবতীর বিরহ-সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া সঙ্গীত-কারিণীর সলজ্জ সহাস্য অথচ মর্ম্মপীড়িত মূর্ত্তিখানি সম্মুখে রাখিয়া নির্জ্জনে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন কি? এমন সুযোগ ঘটিয়াছে কি? না ঘটিয়া থাকে, একবার ভাবিয়া দেখুন। অনন্যোপায় চারুচন্দ্রের প্রতি দোষারোপ করিবার পূর্ব্বে একবার এ ভাবটী হৃদয়ঙ্গম করুন। চারুচন্দ্র কথা বলিলেন, "বিনোদ, কি করিতেছ?"

বিনোদ আবার দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল, আবার ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিল, মস্তক একটু অবনত করিল, কর্ণভূষা একটু দোলাইল, বামহস্তের ফুলটী দক্ষিণহস্তে লইয়া বলিল, "ভগবান যাহা করিতে দিয়াছেন।"

চারু। তোমার এমন কি দুঃখ?

বিনোদ। আমার দুঃখ বুঝিবে, এমন লোক কে আছে?

চারু। তুমি দুঃখিনী, তাহা জানি। তুমি তোমার স্বামীর বাড়ী যাওনা কেন?

বিনোদ একটু হাসিয়া বলিল, "আমি বিধবা।"

চারু। আমি জানি তোমার স্বামী আছেন। ভাল হউক, মন্দ হউক; স্ত্রীলোকের স্বামীর কাছে থাকিতে হয়।

বিনোদ। আমায় পরিত্যাগ করেছে।

চারু। তুমি ইচ্ছা করিলে আবার গ্রহণ করিতে পারেন।

বিনোদ। কাঁটাগাছে উঠিতে লতার কি ইচ্ছা হয়?

চারু। ধর্ম্ম।

বিনোদ। ধর্ম্ম! চিরজীবন এরূপ জ্বলিয়া যে ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম আমি চাই না। আর আমার ধর্ম্ম নাই; আমি মনে মনে ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়াছি। এত কথা অন্য কাহাকেও বলিনাই, তুমি জিজ্ঞাসা করিলে তাই বলিলাম। বস, এ স্থান নির্জ্জন, তোমায় আরও কিছু বলিব; তোমায় অনেক বলিতে ইচ্ছা করে। তোমাকে দেখিয়া অবধি এ হৃদয়ে যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা নিবারণ করিতে পারি নাই। একটু ব'স, শোন আমি এত দিন কি কষ্টে আছি।

চারুচন্দ্র বসিলেন। যে অজেয় মহাশক্তির প্রভাবে সংসারবিরাগী শ্মশানবাসী যোগেশ্বরের যোগভঙ্গ হইয়াছিল, যে শক্তির প্রভাবে অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি বিধাতার ব্রহ্মত্ব পরাজয় মানিয়াছিল, যাহার বলে সুরজয়ী মহাবীর দৈত্যকুলপতি সুন্দ উপসুন্দ, সুদৃঢ় ভ্রাতৃ-প্রেম-বন্ধন-বিচ্ছিন্ন হইয়া কাল-সাগরে ডুবিয়াছিল, যাহার প্রভাবে কামনাজ্ঞানহীন সুকুমারমতি শিশু মুনিসুত ঋষ্যশৃঙ্গের পিতৃস্নেহ ভাসিয়া গিয়াছিল, চারুচন্দ্র আজ সেই মহাশক্তির সম্মুখে নিপতিত হইলেন!



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।



চারিদণ্ড রাত্রির সময় চারুচন্দ্র ধীরে ধীরে বাসায় প্রত্যাগত হইলেন; আসিয়া দেখেন, রামচরণ বড় প্রফুল্ল মূর্ত্তিতে তাঁহার কক্ষে বসিয়া আছেন। রামচরণকে দেখিবামাত্র তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। রামচরণ বুঝি সব জানিয়াছে। পাপের প্রথমে এমনি ভয়ই হইয়া থাকে। ঘরে গিয়া চারুবাবু অতি রুক্ষকণ্ঠে রামচরণকে সম্ভাষণ করিলেন। রামচরণ সেই রুক্ষকণ্ঠেই যেন কত আমোদ পাইল, বলিল, "কি বাবু, এতক্ষণ কার ঘরে ছিলে? বিনোদ-বালার?"

রামচরণের স্বর জড়তাময়, মদিরার পূর্ণ অধিকার। কিন্তু চারুচন্দ্র আবার শিহরিলেন। "বিনোদবালার ঘরে!" রামচরণ কি সব জানিয়াছে? চারুচন্দ্র কোনও কথা বলিলেন না, দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। মদিরাবিহ্বল রামচরণ খুব জমকাল স্বরে বলিল, "কাচিন্তা! চিন্তা রোগের অমোঘ ঔষধ, একটু খাওনা। একটু অমৃত খাও, অমর হবে!" বলিয়া রামচরণ বস্ত্র মধ্য হইতে বোতল বাহির করিয়া চারুচন্দ্রের সম্মুখে রাখিল। তখন বাহির হইতে রামচরণকে কে ডাকিল। "যাচ্ছিগো" বলিয়া তাহাদিগের

ডাকে উত্তর দিয়া, রামচরণ চারুবাবুর হাত ধরিয়া বলিল, "চলনা ভাই, একটু আমোদ করে আসি গিয়ে।"

চারুচন্দ্র হাত ছাড়াইয়া লইয়া ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, "তুমি যাও।"

রামচরণ চলিয়া গেল, কিন্তু সখের বোতলটী ভুলিয়া রাখিয়া গেল।

রামচরণ বহিস্কৃত হইলে চারুচন্দ্র আসনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ভাবনা অনেক, যন্ত্রণা বড় অধিক। পাপের প্রথমে মনঃপীড়া বড় বিষম। যাঁহাদের শুভাদৃষ্ট, তাঁহারা এই মনঃপীড়ায় জ্বলিয়া আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ভবিষ্যতে সাবধান হন। আর যাহাদের অদৃষ্ট ভাল নয়, তাহারা এই আগুণে হৃদয় মন পোড়াইয়া এরূপ বিশুষ্ক করিয়া ফেলে যে, ভবিষ্যতে পাপের আগুণে আর বড় যে কষ্ট অনুভব করে না। চারুচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন, অনুশোচনা করিতে লাগিলেন।—হায়! আমার জীবনের ঐ অংশটুকু কি স্বপ্নময় হইতে পারে না? কিন্তু হায়! চারুচন্দ্রের মন কি বিশ্বাসঘাতক; এই অনন্ত অনুশোচনার মধ্যেও তিনি বিনোদবালার মোহিনীমূর্ত্তিটী ভুলিতে পারেন নাই। যে ভুজঙ্গিনী তাঁহাকে দংশন করিয়াছে, তাহার সে মণিময় মনোহর মূর্ত্তিটী চারুচন্দ্রের হৃদয়ে মধ্যে মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে তিনি সাবধান-দৃষ্টিতে দরজার দিকে চাহিতেছেন; বুঝি বিনোদবালা আবার আসিল।

কিছুকাল এইভাবে থাকিয়া চারুচন্দ্রের মন বড় বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। তাঁহার মনোরাজ্যে পাপে ধর্ম্মে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়াছে।

"এমন বহুমূল্য রত্নলাভে বঞ্চিত হইবে কেন?" এই মন্ত্রে পাপ প্রথমে শর ত্যাগ করিল।

"এরত্নে আমার অধিকার কি? ইহা পরস্ব!" এই মন্ত্রপূত শরে ধর্ম্ম তাহা ব্যর্থ করিল।

পাপ রোষে অন্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিল, "অন্যের হইলে কি হয়? বিনোদবালা আপনিই তোমার করে সপিয়া আসিতেছে।"

"প্রভা কি বলিবে?" ধর্ম্মের এ অস্ত্রে পাপ কতক্ষণ নিরস্ত রহিল। কিন্তু পাপের বেগ যদি এত সহজে পরাজেয় হইত, তবে মুনি ঋষিদিগের এত কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইবে কেন?

পাপ আবার অস্ত্র ত্যাগ করিল, "প্রভাকে যদি এত ভালবাস, তবে বিনোদবালাকে এত আশা দিয়াছিলে কেন? তাকে এমন প্রেম-নয়নে দেখিয়াছিলে কেন? ঐ লতা-কুঞ্জে তাহার কাছে বসিয়া তাহার মনের কথাগুলি শুনিলে কেন?"

ধর্ম্ম। সে পাপিষ্ঠা. আমি তাহাকে পাপনয়নে দেখি নাই।

পাপ। সে ভিখারিণী, তোমার কাছে একটু অনুগ্রহ চায়।

ধর্ম্ম। আমি পরাধীন, আমার ভালবাসা আমি অন্যকে দিয়াছি। আমার সমস্তই প্রভার। যাহা অন্যকে দিয়াছি, তাহা আবার দান করিব কিরূপে?

পাপ। প্রভাত জানিবে না।

ধর্ম্ম। জানিবে না বলিয়া আমি তাহার কাছে বিশ্বাসঘাতক হইব? সে যে আমায় বড় বিশ্বাস করে!

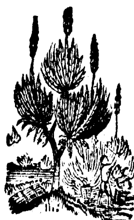
পাপ। সেত তোমায় বিনাদোষেই অবিশ্বাস করিয়াছে। সে কত তিরস্কার করিয়া তোমায় পত্র লিখিয়াছে। যখন অবিশ্বাসী হইয়াছ, তখন আর অবিশ্বাসের কাজ করিলে দোষ কি?

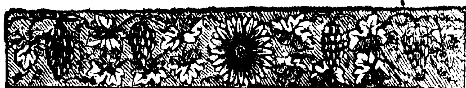
ধর্ম্ম ক্রমেই হীনবল হইয়া আসিতে লাগিল। যুবক চারু-চন্দ্রের মনোরাজ্যে ধর্ম্মপক্ষীয় সৈন্যবল তত সমরকৌশলী নহে।

তাহারা অশিক্ষিত, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রও বহুদিন যাবৎ অশানিত। অন্য পক্ষে পাপের বল স্বভাবতঃই বর্দ্ধন-শীল, তাহার অস্ত্রশস্ত্র আপনা হইতেই বিনা ব্যবহারেই সুধার থাকে। ধর্ম্ম একটু নিস্তেজ হইল বটে, কিন্তু আবার সাহস করিয়া দাঁড়াইল। "প্রভার ন্যায় সরলা পতিব্রতা রমণীর সর্ব্বনাশ করিব ?"

পাপ। প্রভা যে বিশ্বাসিনী তাহার বিশ্বাস কি ? তুমি বুদ্ধিমান্ বিবেচক পুরুষ, তুমিই যখন বিনোদবালার রূপে উন্মত্ত, তখন অশিক্ষিতা, জ্ঞানহীনা রমণী যে এত দীর্ঘ-বিরহে বিশ্বাসিনী আছে তাহার বিশ্বাস কি ?

সমস্ত রাত্রি এই মহাসমর চলিল। কোনও পক্ষেরই নিশ্চিত জয়পরাজয় হইল না। রাত্রি ভোর হইল তবু স্থির হইল না কি হইবে ? কখনও ধর্ম্মের জয় কখনও পাপের জয় এইরূপ চলিতে লাগিল।





অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দুরদৃষ্ট চারুচন্দ্রের প্রাণমন যখন এই মহাসমরে বিশৃঙ্খল তখন প্রাতঃকালে হরকরা আসিয়া এক পত্র দিল। পত্র চারুচন্দ্রের বাড়ী হইতে আসিয়াছে, তাঁহার মাতা লিখিয়াছেন। পত্রের সংবাদ বড় বিষম! গত রজনীতে প্রভা নিরুদ্দেশ হইয়াছে, অনেক অনুসন্ধান করিয়াও পাওয়া যাইতেছে না। কি ভীষণ সংবাদ! চারুচন্দ্রের মস্তকে যেন সহস্র বজ্রাঘাত হইল। হস্ত হইতে পত্রিকাখানি খসিয়া পড়িল, পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল, সমস্ত জগৎ শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। কতক্ষণ চারুচন্দ্র নিশ্চল নির্জ্জীববৎ বসিয়া রহিলেন। পরে একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, ভাবিলেন, একি? একথা কি সত্য? পত্রখানি তুলিয়া আবার পড়িলেন, সন্দেহ দূর হইল, তবু পড়িলেন, অক্ষরে অক্ষরে মনোনিবেশ করিলেন। হায়! কালির অক্ষর, তোমার আমার ইচ্ছায় পরিবর্ত্তিত হয় না। মাথায় হাত দিয়া চারুচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন।

পাপ ও ধর্ম্ম কতক্ষণের জন্য নিরস্ত হইল। চারুচন্দ্র ভাবিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! প্রভা অবিশ্বাসিনী! তবে সতীত্ব বলিয়া যে কথাটা জগতে প্রচারিত আছে, তাহা অনর্থক। বিধাতা স্ত্রীলোককে কেবল

অসার মরীচিকারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন ? প্রভা ও বিনোদবালা এক ছাঁচে গড়া।"

ভাবিয়া ভাবিয়া চারুচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিলেন;—অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন। রোদনে অন্তঃকরণ কতক স্থির হইল। তখন মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "হায়! আমার সব শেষ হইল। আমি কি কুক্ষণে গৃহ হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম; এ যাত্রাই আমার স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসন। আর কোন্ মুখ লইয়া স্বদেশে যাইব ? যাহার ভার্য্যা এরূপ কলঙ্কিনী, তাহার দগ্ধ-মুখ পরিচিত সমাজে না দেখানই ভাল। আমি দেশে গেলে, কতলোকে আমাকে উপহাস করিবে, অতি নীচ অন্ত্যজ ব্যক্তিও আমার প্রতি ঘৃণার চক্ষে চাহিবে। হায়! আমি যথার্থই কুলাঙ্গার হইয়া জন্মিয়াছিলাম। আমা হইতেই পিতৃপিতামহের পবিত্রবংশ কলঙ্কিত হইল। ধিক্ আমায়! প্রভা! রাক্ষসী! পিশাচী! এই কি তোর সরলতা! সেই সরল কুসুমের মত হৃদয়খানিতে কি এত নরকের আবাসস্থান ছিল ? বুঝিলাম রমণী!—এতদিনে তোমাদের চিনিলাম। তোমরা মধুপায়ী ভ্রমর। মধু পাও, ফুলে বস, না পাও পুষ্পান্তরে উড়িয়া যাও। সীতা, দময়ন্তী, শকুন্তলা সমস্তই কল্পনামাত্র। যা'ক, এত-দিনে স্বপ্ন ভাঙ্গিল। বুঝিলাম রমণী খেলার সামগ্রী মাত্র। সুযোগ পাইলে তাহাদিগকে লইয়া খেলিবে।"

এইরূপ ভাবিয়া মন কতক স্থির করিয়া, চারুচন্দ্র মাতার কাছে পত্র লিখিলেন।

আপনার পত্র পাইলাম। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা ঘটি-য়াছে। যে গিয়াছে তাহার আর অনুসন্ধান করিয়া কি হইবে ?

আমার দেশে আসিতে আর ইচ্ছা নাই। এ মুখ আর দেশের

লোককে দেখাইব না। আপনি ভাবুন আপনার পুত্রটী মারা গিয়াছে; সেজন্য দুই চারি দিন কাঁদিয়া কাটিয়া শান্ত হইবেন।

পাপিষ্ঠার সন্তানটী যদি এখনও বাঁচিয়া থাকে, তবে সময়মত তাহাকে পানাহার করাইবেন। রামকৃষ্ণকে বলিবেন, তাহার যদি কাশী যাইতে ইচ্ছা হয় তবে সে যেন যায়, খরচ পত্র কিছু চায় আমি দিব। আপনারও তাহার সঙ্গে কাশীবাস শ্রেয়ঃ। যাহা মত হয় লিখিবেন, খরচ পাঠাইব। ইতি।

সমস্ত দিন চারুচন্দ্রের বড় কষ্টে গেল। লোকের বিপরীত কালে বিপরীত বুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। অনেক মূঢ় ক্ষণিক দুঃখশান্তির জন্য আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। চারুচন্দ্রও সেই প্রকৃতির লোক বটে; কিন্তু মরিতে সাহস নাই বা ইচ্ছাও নাই। তিনি ভাবিলেন, "সুরার আশ্রয় লইলে নাকি মন বড় প্রফুল্ল হয় আমিও তাহাই করিনা কেন?" ভাবিয়া তিনি অন্যরূপ মৃত্যুর ব্যবস্থা করিলেন।

সেই দিন রাত্রে চারুচন্দ্র অপরিমিত সুরাপান করিলেন। সুরার শক্তিতে অন্য সব ভুলিলেন বটে, কিন্তু বিনোদবালাকে ভুলিলেন না। মত্ত অবস্থায় বিনোদবালাকেই স্বপ্ন দেখিলেন।

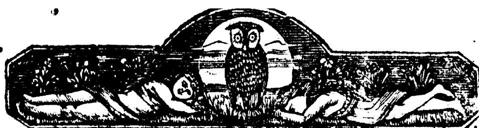
পাঠক, আর কি লিখিব। এরূপ অবস্থায় যাহা ঘটিবার অচিরাৎ তাহাই ঘটিল। শেষ মীমাংসা হইল, "যখন প্রভা দ্বিচারিণী, তখন আমি তার জন্য বিনোদবালাকে ভুলিব কেন?"



প্রথমখণ্ড সমাপ্ত



দ্বিতীয় খণ্ড।



দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মল-সলিলা ভাগীরথী শুক্লাষ্টমীর অর্দ্ধচন্দ্র বক্ষে ধারণ করিয়া নিবিড় অরণ্যপ্রদেশ দিয়া ধীর-বীচি-বিক্ষেপে প্রবাহিত হইতেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র; দিবসের শ্রান্তি দূর করিয়া বিবিধ বিহঙ্গদল তীরজাত বৃক্ষের শাখায় শাখায় বসিয়াছে, কোনওটী দুই একবার শব্দ করিতেছে, কোনওটী পাখা নাড়া দিতেছে, কেহবা চঞ্চুপুটে চঞ্চুপুট মিশাইয়া শাবকদিগকে আদর করিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া বনমধ্যে শৃগালদলের তীব্রশব্দ শ্রুত হইতেছে। মানবকণ্ঠের ধ্বনিমাত্রও নাই। তটিনীর এ প্রদেশে সন্ধ্যার পরে তরণী-সমাগমের সম্ভাবনা নাই; কারণ অরণ্যপ্রদেশে জলদস্যুর ভয়ে এস্থানে প্রায়ই কেহ রাত্রিতে নৌকা দিতে সাহস করিত না। কিন্তু আজ নদীর একপার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র তরণী প্রদীপ্ত চন্দ্রালোকে প্রভাসিত হইয়া মৃদুতরঙ্গাভিঘাতে মৃদু পরিদোলিত হইতেছিল।

ইহা দৃষ্টিমাত্র দস্যুর নৌকা বলিয়া ভয় হয়। তরীতে দুইজনমাত্র আরোহী,—একজন যুবক, অন্যজন যুবতী। দুইই অতুলনীয় সুন্দর, বড় সুন্দর মিলন! বীর্য্যের সহিত মাধুর্য্য, তেজের সহিত ক্ষমা, ভাস্করের সহিত চন্দ্রমা, পুণ্যের সহিত শান্তি,—এমন মধুর মনোমুগ্ধকর মিলন লেখনী সাহায্যে চিত্রিত হইতে পারে না। যুবক উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গ, যুবতী স্নিগ্ধ গৌরাঙ্গী; যুবক নিরাভরণ, যুবতী পুষ্পাভরণময়ী,—পুষ্পের হার, পুষ্পের বলয়, পুষ্পময় দেহ। যুবকের পূর্ণায়তন সুদৃঢ় মাংসল দেহে মহিমার উজ্জ্বল প্রভা বিভাসিত, রমণীর পূর্ণ-বিকসিত দেহপুষ্পে সতীত্ব-পরিমলের পবিত্র সৌরভ নিঃসৃত হইতেছে। যুবকের প্রশান্ত মুখমণ্ডলে সর্ব্বগামিনী প্রতিভা, যুবতীর হাস্যোদ্দীপ্ত প্রফুল্ল কমলাননে সদা-রঙ্গময়ী সরলতা। যুবকের অনিন্দ্য-সুন্দর দর্পণবৎ বিমল ললাট বীরত্বের বিশ্রামভবন, রমণীর অৰ্দ্ধেন্দু-সুবিমল ঈষদ্‌ব্রীড়া-সঙ্কুচিত ললাট মাধুর্য্যের রত্নাসন। বিশাল উজ্জ্বল চারিটী চক্ষু প্রীতিরসে ঢল ঢল, আনন্দভরে কচিৎ ঈষন্নিমীলিত, ক্বচিৎ সুস্নিগ্ধ কটাক্ষময়। চারিটী চক্ষুই এক কার্য্যে নিরত,—পরস্পর পরস্পরের সৌন্দর্য্য-সুধাপানে আত্মহারা হইয়া নিখিল সৌন্দর্য্যময়ী জগৎকে ভুলিয়া গিয়াছে! সে চক্ষের দৃষ্টি, সে প্রমোদময় নীরবতা, সে নিঃসঙ্কোচ প্রেমভাব চিত্রে চিত্রিত হইতে পারেনা, মানব-ভাষায় বর্ণিত হইতে পারে না। ঊর্দ্ধে নীলগগনে বিমল চন্দ্র হাস্যময়, নিম্নে স্বচ্ছস্রোতস্বিনী সেই নীলগগন সহ শশি-প্রতিবিম্ব বক্ষে লইয়া হাস্যময়ী! তীরে নিবিড়-বৃক্ষ-পল্লবে হীরকখণ্ডবৎ খদ্যোতিকামালা দলে দলে জ্বলিতেছে। মৃদু-পবনসন্তাড়িত বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর ধ্বনির সহ তটিনীর শ্রুতিমধুর কুল কুল শব্দ মিশিতেছে। দম্পতি-যুগল সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন!

স্বামী কর্ণধার, পত্নী আরোহী। কর্ণধার শিথিল-করে কর্ণ ধরিয়াছেন, তরী স্রোতের অনুকূলে ইচ্ছামত চলিতেছে। ক্ষণপরে যুবতীর বিম্বাধর ঈষদ্ বিস্ফারিত হইল, মুক্তা-দন্তে ওষ্ঠাধর দংশন করিয়া সুন্দরী উদ্ভূত হাস্যচ্ছটা লুকাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে জোয়ার-তরঙ্গ বাধা মানিলনা। দুই একটী লহরী নাচিয়া উঠিল। মাঝীর মাথা ঘুরিয়া গেল, হস্ত হইতে কর্ণদণ্ড খসিয়া পড়িল। রমণীরও সকল সংযম উড়িয়া গেল; উচ্চহাস্য করিয়া স্বামীর ক্রোড়-দেশে গড়াইয়া পড়িলেন। তখন অধরে অধরে অজস্র সুধাবৃষ্টি হইতে লাগিল। অনিরোধ্য আনন্দভরে সুন্দরীর বীণাকণ্ঠ বাজিয়া উঠিল ;—

"প্রেমময়ী ধরা, প্রেমেতে বিভোরা, প্রেমের ফোয়ারা,
উছলে মধুর লহরে।"

অতিব্যস্তে যুবা পার্শ্ববর্ত্তী বীণা করে লইলেন। তখন কল-নাদিনী জাহ্নবীর কলনাদ ডুবাইয়া, মধুময়ী মূর্চ্ছনায় মুদারাস্বরে আকাশ-কানন প্রতিধ্বনিত করিয়া কণ্ঠবীণাসহ কাষ্ঠবীণা মিশিয়া গীত হইল ;—

প্রেমময়ী ধরা, প্রেমেতে বিভোরা, প্রেমেরই ফোয়ারা,
উছলে মধুর লহরে।
প্রেমেতে উজলা, প্রেমেতে বিভোলা, ধাইছে তটিনী
প্রেম-অসীম-সাগরে।
নীলাম্বরে হাসি, সুধাময় শশী, ভাষায় ধরণী
প্রেম সুধাময় করে।
কিবা হাসে ফুল, প্রেমেতে আকুল, প্রেমের সৌরভ
সকলে বিলায়রে॥

প্রেমিকা প্রকৃতি, প্রেমানন্দে মাতি, নীরবে হাসিছে,
নীরব কাননেরে !!”

সঙ্গীত গায়িকার কণ্ঠের উচ্চতম সোপানে চড়িয়া ক্রমে নিম্নতরে আসিতে লাগিল, ক্রমে শব্দ অস্পষ্ট হইয়া আসিল; কে যেন সে বীণার তার বেসুর করিয়া দিল। রমণী আর গাহিতে পারিলেন না, তাঁহার মুখমণ্ডল নিবিড় লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, নয়নেন্দীবর অশ্রুভারাক্রান্ত নিমীলিত হইয়া আসিল। অধরোষ্ঠ কম্পিত হইল; একটী মূর্চ্ছনা অর্দ্ধ-নিঃসৃত করিয়া রমণী শিথিল বাহুবল্লী দ্বারা স্বামীর কণ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়া, সেই বিশাল বক্ষোপরি মুখ লুকাইলেন, যেন বাতান্দোলিত প্রফুল্ল কমল গৌরবে স্বচ্ছ সরোবরে ডুবিল। ধারায় ধারায় অশ্রু গড়াইয়া যুবকের বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। অকস্মাৎ সেই আনন্দময়ী গীতধ্বনি যেন বিষাদের উচ্ছ্বাসে পরিণত হইল।

বাদকের কর হইতে বীণা খসিয়া পড়িল; সে প্রশান্ত বক্ষঃস্থল কাঁপিল। অসীম স্নেহভরে যুগল-বাহুবন্ধনে হৃদয়াশ্রিতা প্রেয়সীকে আলিঙ্গন করিয়া, স্নেহ-গদগদ কণ্ঠে যুবক বলিলেন, “একি হইল সিদ্ধি, সহসা এ মধুর বীণা কে ছিঁড়িল?”

সিদ্ধি কথা বলিলেন না; রুদ্ধোচ্ছ্বাসে অবিরল অশ্রুধারা বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। স্বামী অতি স্নেহে পত্নীর অধরে মুখ মিশাইয়া বলিলেন, “সিদ্ধি! শান্তিময়ী আমার! তোমার চক্ষে অনেক দিন আমি এমন ধারা দেখিতে পাই নাই! তুমিত কাঁদিতে ভুলিয়া গিয়াছিলে! হাসিমাখা আনন্দাশ্রু তোমার নয়নে প্রায়ই দেখিতে পাই; এমন উচ্ছ্বাসত দেখি নাই! এমন সুখের সময় এ কি হইল?”

যুবকের কণ্ঠও ভাঙ্গা ভাঙ্গা, তাঁহার নয়ন প্রান্তে দুইটী অশ্রু-বিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সিদ্ধি সে চক্ষের পরে একবারমাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া, অতি কষ্টে অনিবার্য্য হৃদয়াবেগ সংবরণ করিয়া বলিলেন, "সাধন, সিদ্ধি দুঃখে কাঁদিতে জানে না। কিন্তু আজ যে কাঁদিলাম, তাহা সুখে কি দুঃখে তাহা বলিতে পারি না। আজিকার ন্যায় সুখ বুঝি জীবনে কখনও ভোগ করিনাই। এই নির্ম্মল চাঁদের কিরণে ভরানদীর তরলবক্ষে তোমার হাসিমুখ চাহিয়া যে গীত গাইলাম, তাহা কত সুখে, বুঝিতে পারনা কি ?"

সাধন। তাহা বুঝি ; তাতেই এত ! কেন, এমনত আর কতদিন গাইয়াছ !

সিদ্ধি। গাইয়াছি, কাঁদিয়াছিও বটে। কিন্তু আজ যে কান্না আসিতেছে, তাহা সুধু সুখের আবেগে নয় ! আজ ঐ চাঁদমুখ পানে চাহিয়া গাইতে গাইতে পরমানন্দে যখন হৃদয় ভরিয়া গেল তখন অকস্মাৎ কে যেন আমার অন্তরে আসিয়া বলিল,—সিদ্ধি, তোর এ সুখ কি চিরদিন থাকিবে ? আমিও ভাবিলাম, আমার এসুখ কি চিরদিন থাকিবে ?—যদি ভাঙ্গিয়া যায় !

সুন্দরীর নয়নেন্দীবর হইতে আবার অশ্রু-আসার ঝর্ ঝর্ নির্গত হইতে লাগিল। প্রীতি-পুলকিত-চিত্তে যুবক প্রণয়িনীর অশ্রুধারানিসিক্ত চন্দ্রাননে ঘন ঘন চুম্বন করিয়া বলিলেন, "এ সুখ কি কখনও ভাঙ্গিতে পারে পাগলি !"

সিদ্ধি। কি জানি নাথ ! মনে কেন এমন ভয়ের উদয় হইল ! সে দিন তুমি একাকী দশজন দস্যুর সঙ্গে যুঝিয়াছিলে ; আর এক দিন তুমি কৃতান্তমূর্ত্তি গোঘাতক যবনদ্বয়ের শাণিত ছোরা তুচ্ছ করিয়া রিক্তহস্তে একটী গাভীকে রক্ষা

করিয়াছিলে, আমি দেখিয়া আনন্দে হাসিয়াছিলাম। আজ্ তোমার সেই দুঃসাহসিকতা মনে পড়িয়া প্রাণে বড় ভয় হইতেছে! কেন এমন হইল প্রভু! চল আজ আশ্রমে ফিরিয়া যাই।

যুবকের স্নেহ-সমুদ্ভাসিত তরল মুখকান্তি গম্ভীর হইল। রোরুদ্যমানা পত্নীর মুখের উপর গভীর দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "তুমি কি বিচ্ছেদের আশঙ্কা করিতেছ?"

সিদ্ধি। জগতে কোথাও চিরস্থায়ী মিলন দেখিনা। ঐ যে অষ্টমীর চাঁদ বুকে লইয়া ধরণী হাসিতেছে, অল্পক্ষণ পরেইত সে চাঁদ লুকাইবে। এই সব দেখিয়া বড় ভয় হয়; কিন্তু এত দিনত হয় নাই!

সাধন। পরকালের প্রতি কি বিশ্বাস হারাইয়াছ?

মুহূর্ত্তে সুন্দরীর তরল মুখভঙ্গিমা প্রগল্‌ভ ভাবময় হইল, ব্রীড়া-সঙ্কুচিত ললাটদেশ দর্পণাকার সমতল হইল, আবেশময় লোলদৃষ্টি স্থির প্রতিভাময় ও কণ্ঠস্বর গম্ভীর হইল। স্বামীর মুখপ্রতি চাহিয়া বলিলেন, "যথার্থ সাধন, সিদ্ধি পরকালের প্রতি বিশ্বাস হারাইতেছিল; অমূলক বিচ্ছেদের আশঙ্কা করিতেছিল। কে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে? সাধন হইতে সিদ্ধি কবে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে? এই যে দিব্যজ্ঞানে দেখিতেছি তুমি আমি মিশিয়া এক হইয়া, দেহে প্রাণে বিন্দুমাত্র বিভিন্ন না থাকিয়া কেমন সুখে বিচরণ করিতেছি! এই যে সুধার নদীস্রোতে পারি-জাতের তরণীতে আরোহণ করিয়া চাঁদের আলোতে কেমন সুন্দর খেলিতেছি! এমন দিন কবে হবে নাথ?"

পরমানন্দে স্বামী পত্নীর মুখচুম্বন করিলেন; অতৃপ্ত পিপাসায় প্রেয়সী প্রিয়তমের অধরসুধা পান করিলেন। অনঙ্গঠাকুর শর-

সন্ধানের সুসময় বুঝিয়া লইলেন। যুবতীর বেণীবন্ধ খসিয়া পড়িল। সেই রাশীকৃত ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত অলকদাম চূর্ণীকৃত হইয়া যুবকের উরঃস্থল আবৃত করিয়া ফেলিল; নির্ম্মল-গগণে নীরদখণ্ডের উদয় হইল। সে নীরদকালিমা আবার তদুপরি ভাসমান মুখচন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে উজ্জ্বলে মধুরে জ্বলিতে লাগিল। কতক্ষণ এই সুখস্বপ্নে দম্পতিযুগল বিভোর রহিলেন। সহসা রমণী চকিত হইয়া বলিলেন, "ওকি!" চকিতস্বরে যুবক উত্তর করিলেন "কি!"

যুবতী। কে যেন আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছে।

উভয়ে একদিক লক্ষ করিয়া শ্রুতি ও দৃষ্টি সমাবেশ করিয়া রহিলেন। উভয়েরই প্রমোদ-চঞ্চল অঙ্গভঙ্গি সহসা গম্ভীরভাব ধারণ করিল। দূরে তরণীমধ্যে শ্রুত হইল, "হায়রে তোমাদের কি স্ত্রীকন্যা নাই! একটুমাত্র ধর্ম্মভয় নাই!"

অকস্মাৎ অপূর্ব্বতেজে যুবকের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল!—সে প্রমোদতরঙ্গ হাস্যোচ্ছাস বিনোদ-দৃষ্টি বিলীন হইল। মুখমণ্ডল গম্ভীর, সর্ব্বাঙ্গ সুস্থির, নয়নদ্বয় নিস্পলক তেজোময় হইল। প্রবল-ঝটিকাপূর্ব্ব-ঘন-ঘটাচ্ছন্ন-গগন-প্রতিফলিত গম্ভীর-জলধিবৎ সে প্রশান্ত দেহে উচ্ছ্বাসের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হইল না। গম্ভীর চিন্তাযুক্ত কণ্ঠে বীরেন্দ্র বলিলেন, "কোনও অবলা দস্যুহস্তে পড়িয়াছে।" স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় স্বামীর অন্তরের সর্ব্বভাব পত্নীর হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়াছে। রমণী অতিমাত্র আগ্রহে বলিলেন, "এখন উপায়!"

অচল উৎসাহময় বীরকণ্ঠে উত্তর হইল, "উপায় সাধন সঙ্গে সিদ্ধি। তোমার স্বামীর দেহে বিন্দুমাত্র রক্ত থাকিতে দস্যুহস্তে অবলার সর্ব্বনাশ হইবে! নৌকার হাল ধর।" সিদ্ধি হাল ধরিলেন। সাধন অসুর-বলে দাঁড় ধরিলেন। তরণী উজান

বাহিয়া নাচিয়া নাচিয়া তরঙ্গকে ব্যঙ্গ করিয়া তর্ তর্ শব্দে বায়ু-বেগে চলিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল, যে তরণী হইতে স্ত্রী-লোকের আর্ত্তনাদ শুনা গিয়াছিল তাহা কাননময় তীরে গিয়া লাগিল। সাধন দাঁড় ছাড়িয়া নৌকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সিদ্ধিকে বলিলেন, "নৌকা কূলে ভিড়াও।"

অল্পক্ষণ পরে যুবক বীরসাজে সাজিয়া গর্ব্বিত পদবিক্ষেপে তরণীর শিখরদেশে আরোহণ করিলেন। তাঁহার মস্তকের উষ্ণীষ, অঙ্গের বর্ম্ম, কোটীবদ্ধ কৃপাণ চন্দ্রকিরণে ঝলসিতে লাগিল। নিস্পলক-নেত্রে সিদ্ধি বীরভূষণবিভূষিত স্বামীর বীরমূর্ত্তির উপর চাহিয়া রহিলেন। প্রভাত-প্রফুল্ল পদ্মদলে শিশিরবিন্দুবৎ তাহার বিস্ফারিত নেত্রযুগলে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। দেখিয়া সাধন বিরক্তির সঙ্গে তাহার হস্ত হইতে কর্ণদণ্ড কাড়িয়া লইয়া বলিলেন "সিদ্ধি, এসময় চ'খে জল! কর্ত্তব্যে এমন অবহেলা!"

ভীতিবিনম্র স্বরে সিদ্ধি বলিলেন, "প্রভু, অমি স্ত্রীলোক সহস্র-বলেও অবলা; তাই ভয় হয় শত্রু অনেক, তুমি একা!"

সাধন। ধর্ম্ম এক, পাপ সহস্র। আমি স্থলপথে যাই, তুমি জল-পথে নৌকা লইয়া অগ্রসর হইবে।

বীরেন্দ্র সবলে নৌকা কূলের দিকে বাহিতে লাগিলেন। সিদ্ধি নৌকামধ্যে প্রবেশ করিলেন। অদূরবর্ত্তিনী তরণী হইতে পুনঃ পুনঃ স্ত্রীকণ্ঠে আর্ত্তনাদ শোনা যাইতে লাগিল। যুবক ওষ্ঠাধর দংশন করিয়া ভীমবলে তরণী চালাইলেন। হৃদয়ে আর ধৈর্য্য মানিল না, তীর হইতে অন্যূন পঞ্চদশ হস্ত দূরে থাকিতে সাধন তরী হইতে লম্ফপ্রদান করিলেন এবং বলিয়া গেলেন, "সিদ্ধি, সাধন অগ্রবর্ত্তী হইল।"

তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি তরণী-প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু একি বেশ!—কুসুম-প্রতিমায় পাষাণাভরণ! পতিসঙ্গে কেলিপরায়ণা সেই ষোড়শী যুবতী সিদ্ধি বীরসাজে সজ্জিতা। সেই আগুল্ফলম্বিত ঘনকৃষ্ণচিকুরজাল শিরস্ত্রাণে লুক্কায়িত, সেই পীনোন্নত কোমল বক্ষঃস্থল কঠিন কবচে আবৃত। সেই ক্ষীণ-কোটী কোটীবন্ধে সমাকৃষ্ট, তাহাতে রত্নজড়িত পিধান চন্দ্রকরে প্রভাসিত। সেই মৃণালকোমল করপল্লবে মৃত্যু-অবতার ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র! আহা কি সুন্দর! কি অপূর্ব্ব! কি ভয়ঙ্কর! বরাঙ্গের কোমল মাধুর্য্যের সহ অকস্মাৎ তীব্র তেজস্বিতার মিলন কি মনোহর! যেন শীতল চন্দ্রিকা সহ তীব্র রৌদ্রের মিলন হইয়াছে,—যেন স্থিরা সরস্বতী-প্রবাহে জাহ্নবীর খরস্রোত মিশিয়াছে! সাক্ষাৎ মধুর রসের সহিত দুর্দ্দান্ত রৌদ্র রসের সমাগম হইয়াছে!

সিদ্ধি বীরকিশোর সাজিয়া সবলে তরী পরিচালিত করিলেন।





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জাহ্নবীতীরে নিবিড় বনাভ্যন্তরে তৃণসমাচ্ছন্ন একখণ্ড ভূমি বৃক্ষলতাশূন্য পরিস্কৃত। তাহার চারিদিকে ঘনসন্নিবিষ্ট গগনস্পর্শী বনবৃক্ষসমূহ দৃঢ় দুর্গ-প্রাকারবৎ শোভা পাইতেছে। ঊর্দ্ধদেশে বিস্তীর্ণ বৃক্ষশাখা সকল পরস্পর জড়িত হইয়া হরীত-চন্দ্রাতপতুল্য সে স্থান আবৃত করিয়া আছে। বিশেষ মনোযোগ সহকারে দৃষ্টি না করিলে, এস্থানে কি ঘটিতেছে তাহা বাহির হইতে জানিবার সম্ভব নাই। আজ সেই স্থল মশালের আলোকে আলোকিত হইয়াছে। পার্শ্বে কলনাদিনী স্রোতস্বতী সৈকতজাত বেতসলতাকুঞ্জ সন্তাড়িত করিয়া খরস্রোতে বহিতেছে। নদী হইতে সেই ক্ষুদ্রভুখণ্ডে যাইবার জন্য একটী অপশস্ত ছিদ্রপথ। সাধন সেই ছিদ্রপথে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন, একটী অবগুণ্ঠনবতী বেপমানা কামিনীকে বেষ্টন করিয়া চারিজন পাষণ্ড বিকটস্বরে পৈশাচিক ভাষায় কোলাহল করিতেছে। কেহ গর্দ্দভ-কণ্ঠে বলিতেছে, "প্রেয়সি, আমায় প্রসন্ন হও।" কেহ মদিরা-বিকৃত পেচক-স্বরে বলিতেছে, "কুন্দদন্তে মুচকি হাসিয়া একটী কথা বল!"

ভীত নিরাশাপূর্ণ করুণকণ্ঠে রমণী বলিল, "পাপের দণ্ড আছে, তোমাদের কি সে ভয় কিছুমাত্রও নাই?"

এক পাষণ্ড বিকট মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "ভুজপাশে বাঁধি কর দণ্ড।"

মর্ম্মবিদারক আর্ত্তস্বরে রমণী ডাকিল, "হা জগদীশ্বর!" অমনি দস্যুগণ শ্রুতিবিদারক-স্বরে বলিয়া উঠিল, "হা জগদীশ্বর কবে তুমি প্রসন্ন হইবে? কবে সুন্দরী আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবে? মা কালী, তোমায় জোড়া নরবলি দিব, আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ কর!"

জগদীশ! তোমার কি মহিমা! তুমি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা বুঝিয় অতি পাষণ্ডজন পাপাভিলাষ সিদ্ধির জন্যও তোমার নাম স্মরণ করিতেছে। তোমারই নাম পরলোকে পরিত্রাণের সেতু ভাবিয়া মুমুক্ষু সাধু অবিচল ভক্তিতে ধ্যান করেন। ধর্ম্মপিপাসু সদাশয় ব্যক্তি পাপের প্রলোভন পরাজয় করিবার জন্য তোমারই কাছে বল প্রার্থনা করেন; পরদুঃখ-কাতর করুণ-হৃদয় মহাত্মা সবল হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য তোমারই নিকটে সিদ্ধি ভিক্ষা করিতেছেন। নিঃসহায়া দুর্জ্জন-নিগৃহীতা অবলা আততায়ী পাষণ্ডের ব্যভিচার হইতে ধর্ম্মরক্ষার জন্য তোমারই চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আবার তোমাকেই ইন্দ্রিয়দাস মহাপাপী স্বেচ্ছাসাধনের হেতু ভাবিয়া আহ্বান করিতেছে। সদসৎ সকল কার্য্যেই মানব তোমারই কাছে সিদ্ধির ভিখারী। কিন্তু হায় অবোধ নর! যিনি নিখিল-সিদ্ধি-সাধনী-শক্তিশালী, তিনি কি কৃপাবিতরণের পাত্রাপাত্র ভেদ করিতে অজ্ঞ!

অনিবার্য্য রোষভরে বীরেন্দ্রের সর্ব্বাবয়ব ভূমিকম্প-বিধূনিত মহীরুহবৎ কম্পিত হইতে লাগিল। দস্যু চতুষ্টয় সশস্ত্র, তাহাদের বিকট আকৃতি অসুর-বলে বলশালী। একাকী তাহাদের সম্মুখীন

হইয়া বিজয়লাভ অসম্ভব! কিন্তু জয় পরাজয়ের চিন্তার সময় এখন আর নাই। দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার দেখিয়া স্থির থাকিবার হৃদয় বিধাতা সে বীর যুবককে প্রদান করেন নাই। সাধন অগ্রসর হইলেন।

উৎপীড়িতা রমণী তখন নিরাশস্বরে ডাকিতেছিল, "জননী জাহ্নবি! তোমারই কোলে অবলার সর্ব্বনাশ হইল! তুমি কেমন করিয়া চক্ষে দেখিতেছ? তোমার ও খরস্রোতে কি এই নরকস্থল ভাসাইয়া দিতে পার না? কলিতে কি দেবতা নাই! ধর্ম্ম নাই! পাপীর দণ্ড নাই!"

তখন সমস্ত বনভূমি কম্পিত করিয়া, কামপ্রমত্ত দস্যুদিগের হৃদয় স্তম্ভিত করিয়া, বিবশা কামিনীকে চকিতা করিয়া অদূরে সিংহনাদ হইল, "আছে!!"

ভীত বিস্মিত হইয়া দস্যুগণ দেখিল, সম্মুখে ছিদ্রপথে একজন অমিততেজা সশস্ত্র বীরপুরুষ! তাঁহার একহস্তে সুতীক্ষ্ণ বর্ষা, অন্য হস্তে শাণিত কৃপাণ অমোঘলক্ষ্যে দৃঢ়বদ্ধ। তীব্রাগ্নিবর্ষী জ্বলন্ত নয়নে বীরপুরুষ বলিলেন, "পাষণ্ডদল, তোমরা পবিত্র মনুষ্য-জীবন লাভ করিয়া, পশু অপেক্ষাও ঘৃণিত কার্য্যে ব্রতী হইয়াছ। আজি হয় এই পশুভাব ত্যাগ করিয়া মনুষ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, না হয় এই শাণিত কৃপাণে তোমাদের পশুজীবন অন্ত হইবে।

পৈশাচিক হাস্যধ্বনি করিয়া দস্যুদল আগন্তুক বীরের সিংহনাদ মিলাইয়া দিল। দুইখানি তীক্ষ্ণধার খড়্গ সাধনের শিরোপরে উত্তোলিত হইল; অপূর্ব্ব কৌশলে বর্ষাদণ্ডাঘাতে দস্যুদ্বয়ের খড়্গ ভূপতিত করিয়া সাধন বলিলেন, "দস্যুগণ! বিধাতা কৃপাণ সৃষ্টি

করিয়াছেন, আমাদের করে সেই কৃপাণ ধরিবার শক্তিও দিয়াছেন, কিন্তু তাহা দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারের জন্য নয়, পাপের পথ পরিস্কৃত করিবার জন্য নয়,—সবল হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য;—পাপ হইতে ধর্ম্মের উদ্ধারের জন্য। জগদীশ্বর পাপীর শাস্তিদাতা; সৃষ্টির আদ্যন্ত তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অমিত-বলা দশানন অত্যাচারী ছিলেন; ভগবান্ বীরমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার অত্যাচার হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিলেন। কংস, শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান আততায়ীর কথা স্মরণ কর। তাহাদের কাছে তোমরা কি ছার! তাই বলি এখনও তোমরা সমস্ত পাপবাসনা পরিত্যাগ কর। আমি অনর্থক নরহত্যার কামনা করি না। তোমাদিগকে পশুভাবে হত্যা করা অপেক্ষা, পশুভাব-বিনষ্ট করিয়া মনুষ্য-ভাব প্রদান করিতে পারিলে আমি আপনাকে অধিকতর কৃতার্থ জ্ঞান করিব। ভ্রাতৃগণ, এই অবলা রমণীকে ত্যাগ করিয়া, এস আমরা নিত্যধন ধর্ম্মের জন্য কামনা করি। তোমরা যদি ধনের জন্য এই দুষ্কার্য্যে মন দিয়া থাক, এস জীবিকা নির্ব্বাহের উপযুক্ত ধন আমি তোমাদিগকে দিব।"

দস্যুদলের আসুরিক চীৎকারে সাধনের দৈববাণী নিষ্ফল হইয়া গেল। "শৃগালের মুখ হইতে ব্যাঘ্র শিকার কাড়িয়া লইয়াছে, কোন্ হতভাগা আবার ব্যাঘ্রের মুখ হইতে শিকার কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে?" বলিয়া জনৈক দস্যু সাধনের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রাঘাত করিল। ক্ষিপ্রহস্তে বীরবর তাহা নিবারণ করিয়া রোষকষায়িত-লোচনে বলিলেন, "পশুদল, তবে মরিতেই সাধ।" চক্ষের নিমিষে একজন বর্শাঘাতে ছিন্নবক্ষ ও আর এক জন কৃপাণমুখে ছিন্নশির হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইল। তন্মুহূর্ত্তে অন্য

দুইজন দস্যু প্রবলবেগে বীরেন্দ্রকে আক্রমণ করিল। অস্ত্রচালনায় দস্যুদল হীনবল বা অশিক্ষিত নয়। প্রবল সমর বাজিয়া উঠিল; নররক্তে ভূতল আর্দ্র হইল। সাধনের দেহের পঞ্চস্থান হইতে শোণিত ধারা ছুটিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত করিয়া ফেলিল। কিন্তু সে হৃদয় আপন দেহের যন্ত্রণা অনুভব করিতে জানে না। এখনও সেই অনাথা রমণী সংজ্ঞাহারা হইয়া দুর্দ্দান্ত দস্যুকরে নিপতিত, এসময়ে কি তিনি স্বীয় প্রাণের প্রতি লক্ষ্য করিতে পারেন? সাধন একজনের আক্রমণ উপেক্ষা করিয়া অন্যজনকে সবলে আক্রমণ করিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার ছিন্নমুণ্ড ভূতল চুম্বন করিল। কিন্তু অপর দস্যুর কঠোর আঘাতে বীরেন্দ্রের গ্রীবাদেশ ভিন্ন হইয়া গেল। কিছুই লক্ষ্য না করিয়া বীরেন্দ্র অবশিষ্ট দস্যুর উপর কৃপাণ উত্তোলন করিলেন, সে আক্রমণে দস্যু নিষ্কৃতি পাইল না। কিন্তু ওঃ! কি সর্ব্বনাশ!! পশ্চাদ্দিকে নদীতীর হইতে প্রচণ্ড গুলি আসিয়া মহাবীরের আপৃষ্ঠ বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। আকাশ-কানন নদী কম্পিত করিয়া "সিদ্ধি!" এই বাক্যটী মাত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অবসন্ন-দেহে বীরেন্দ্র ভূপতিত হইলেন।

তখন পশ্চাদ্দেশ হইতে বিকটাঙ্গ বিশালাকৃতি দস্যু নায়ক ছুটিয়া আসিল। ইহারই গুলিতে সাধন ভূপতিত হইয়াছেন। কিন্তু ঐ,—আবার পশ্চাতে বন্দুকের আওয়াজ হইল! পাপাবতার দস্যুনায়ক পলকের মধ্যে অনুচর দলের অদৃষ্টভাগী হইল। ভূলুণ্ঠিত মুমূর্ষু সাধনের মৃত্যু-যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে সহসা হাস্যচ্ছটা প্রকটিত হইল।

তখন নদী-প্রমুখ রন্ধ্রপথ হইতে বাণবিদ্ধ কুরঙ্গবৎ শত্রু-

সুশোভিত বীরকিশোর ছুটীয়া আসিয়া শোণিত-কর্দ্দমাক্ত সাধনের দেহ আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

বনস্থল নীরব নিস্পন্দ। এই বিরাট ব্যাপারে নিশাচর বন্যপশু পক্ষীও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে সাধন ক্ষীণ বাহু-যুগলে বক্ষোপতিত প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিয়া অতি স্নেহময় অতি সুকোমল, অতি মর্ম্মান্তিক ভাষায় বলিলেন, "সিদ্ধি। প্রাণাধিকে!"

চমকিয়া সিদ্ধি গাত্রোত্থান করিলেন, এবং বলিলেন "প্রভু! আমি আসিয়াছি, চল একত্রে শুভযাত্রা করি।"

সিদ্ধির অশ্রুধারায় সাধনের অঙ্গের শোণিত ধৌত করিতে লাগিল। সাধন বলিলেন, "সিদ্ধি! তুমিই আমার সিদ্ধি।" তিনি আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। মরণের বিকট ছায়া ক্রমশঃ তাঁহার দেহকান্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে দৃশ্যে সিদ্ধির হৃদয়ে সহস্র অশনির আঘাত বাজিল। সিদ্ধি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "প্রাণেশ্বর।"

বীরা রমণীর মনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সিদ্ধি যে রমণী, সেই রমণী। তিনি তখন বালিকার ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার জগৎ-সৌন্দর্য্যসার নিষ্কলঙ্ক হৃদয়-রত্ন মৃত্যুর করাল কবলে নিপতিত হইয়া নিস্তেজ কালিমাময় হইয়া আসিতেছে! যে স্নিগ্ধ তেজোময় অনিন্দ্য সুন্দর পবিত্র মূর্ত্তি সিদ্ধি এতকাল হৃদয়ে রাখিয়া মুহুবিলো-কনে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই, নিষ্ঠুর কাল তাহা বিকৃত করিয়া তুলিল। "হায়রে! কেন প্রাণ দেহে আছিস। কেন এখনও চৈতন্য রহিয়াছে? কেন নয়ন দর্শনক্ষম আছে?" কোটীবদ্ধ কৃপাণ নিষ্কোষিত করিয়া সিদ্ধি স্বীয় বক্ষের উপর সন্ধান করিলেন।

শ্লথকরে সিদ্ধির করধারণ করিয়া সাধন বলিলেন, "ছি সিদ্ধি এই কি এতকালের শিক্ষার পরিণাম! মৃত্যুযন্ত্রণায় আমাকে দগ্ধ করিতেছে; তদধিক যন্ত্রণা, তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছি বলিয়া।—কিন্তু তোমার এই বালিকার ন্যায় অধীরতা দর্শনে যেরূপ মর্ম্মপীড়া পাইলাম, তাহার কাছে এসব যন্ত্রণা অতি তুচ্ছ। তুমি আমাকে স্বর্গের সুপথ দেখাইয়া দিয়াছিলে, তুমিই আমার জীবন-ব্রত উদ্যাপন করিয়া দিলে। আমি এখন বৈকুণ্ঠের সোপানে আরূঢ়। তোমার এখন উৎসব করা কর্ত্তব্য, না সামান্য বালিকার ন্যায় অধীর হইয়া আমাকে এত মর্ম্মপীড়া প্রদান করিতেছ! আমায় একটু জলদাও, অনেক কথা আছে, বলিব।"

গঙ্গাজলে সিদ্ধি স্বামীর তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। সাধন ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়তমে! আমরা যে ব্রত অবলম্বন করিয়া সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা মনে আছেত? মনে আছে?—আমরা ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সবল হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইব না। আজ আমাদের ব্রত পালন সম্পন্ন হইল। তুমিই এ ব্রতের সিদ্ধি করিয়াছ। তোমার গুলিতে দস্যুনায়ক হত না হইলে আমার জীবন বিসর্জ্জন বিফল হইত, যে নিরাশ্রয় রমণীর উদ্ধারের জন্য আমরা এ পর্য্যন্ত করিলাম, তাহার উদ্ধার হইত না, অনর্থক জীবনাশ ও আত্মহত্যা হইত মাত্র। কিন্তু এখনও আমাদের কার্য্যের কিয়দংশ অবশিষ্ট আছে। যাহার জন্য এত করিলাম, ঐ দেখ সেই অনাথিনী বালিকা মূর্চ্ছিতা পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা এখন উহার জীবন মরণের জন্য দায়ী। আমি আর অধিকক্ষণ ধরাধামে অবস্থান করিতে পারিতেছি না।

তোমাকেই এ বালিকার সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। জানিও, তোমার প্রিয়তম আত্মজীবন বিনিময়ে এই বালিকার উদ্ধার করিয়াছে। আর এক কথা!—তুমি গর্ভবতী। আমাদের পবিত্র প্রণয়ের মধুময় পুষ্প তোমার গর্ভবৃন্তে মুকুলিত। নির্ব্বান্ধব সিদ্ধি সাধনের স্মৃতিচিহ্ন তোমার গর্ভে নিহিত। বংশ রক্ষা বিধাতার আদেশ। আর, জগদীশ্বর তোমার গর্ভাশয়ে যে জীবের সঞ্চার করিয়াছেন, তাহা নষ্ট করিতে তুমি আমি কে? আর অধিক বলিবার আমার সময় নাই। ঐ বালিকার যথাবিধি সেবাশুশ্রূষা করিয়া উহাকে তাহার যথাস্থানে প্রেরণ করিবে; আর জগতে সিদ্ধি সাধনের স্মৃতি রাখিয়া আসিবে। কার্য্যান্তে তোমায় আমায় মিলন হইবে,—সে মিলন অবিচ্ছেদী।"

সিদ্ধি। অবলার উপর এমন কঠোর আদেশ কেন প্রভু!

সাধন। আমার সিদ্ধি অবলা নয়, শক্তিময়ী; সে ভগবানের আদেশ পালন করিতে পারিবে। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি আরও শক্তিময়ী হইবে। আর সময় নাই, প্রাণাধিকে! আমার বক্ষের উপর তোমার হাত দাও। আমায় বিদায় দাও। এ সময়ে যদি আমার অনুচরদিগের সঙ্গে একবার দেখা হইত!"

সিদ্ধি স্বামীর হস্তের উপর হস্ত রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ নিশ্চলনেত্রে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে নয়ন মুদ্রিত করিলেন। তখন ধীরে ধীরে সিদ্ধি বলিতে লাগিলেন, "গুরুদেব! মহাপ্রস্থান করিলে? পদাশ্রিতা অবলাকে দূরে রাখিয়া শান্তিধামে যাত্রা করিলে। জানিনা কি অভিশাপে তুমি এতদিন এ মর্ত্ত্যধামে অবস্থান করিতেছিলে! জানিনা কোন্ পুণ্যফলে এ অভাগিনী এতদিন তোমার পদসেবা করিতে পাইয়াছিল? দয়াময়! স্নেহের

সাগর! কি অপরাধে এ দাসীর উপর এমন কঠোর আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলে? কি করিব?—গুরুদেবের আদেশ!—স্বামীর আদেশ!—দেবতার আদেশ! যাঁহার সাধনায় আমার স্বর্গ, তাঁহারই আদেশ! নইলে কি আমি সঙ্গ ছাড়িতাম! বুঝিলাম, আমার পাপের শেষ আছে, তাহারই প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রাণেশ্বর আমাকে ভুলাইয়া রাখিয়া গেলেন। যাও প্রাণাধিক কিন্তু দাসীকে ভুলিও না। এ দুর্ব্বল হৃদয়ে বলসঞ্চার করিও, যেন তোমার আদেশ পালন করিতে পারি। আর যখন পারের জন্য কূলে গিয়া দাঁড়াইব, তখন যেন পার করিতে ভুলিও না।"

সিদ্ধির মনে কত কথাই জাগিয়া উঠিতে লাগিল; মৃত স্বামীর মুখপানে চাহিয়া সে কত কথাই বলিল। তখন রজনী দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হইয়াছে; অষ্টমীর চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে। বনস্থল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। নিশাচর হিংস্র জন্তুগণ স্বচ্ছন্দে শিকার অন্বেষণে ইতস্ততঃ ছুটিতেছে। শাখাসীন পক্ষিগণ দুই একবার পক্ষ ঝাড়া দিতেছে, পক্ষাঘাতে দুই একটী গলিত পত্র তর্ তর্ তির্ তির্ করিয়া পড়িতেছে। অদূরে স্রোতস্বিনীর অবিরাম কলধ্বনি স্পষ্টই শ্রুত হইতেছে। সিদ্ধি এ সমস্ত কিছুই অনুভব করিতেছেন না। অবিশ্রান্তকণ্ঠে স্বামীর শব লক্ষ্য করিয়া কত কথাই বলিতেছেন!

অনন্তর আটজন অস্ত্রধারী পুরুষ ধীরে ধীরে সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া, চিত্রলিখিতবৎ নীরবে দণ্ডায়মান হইল। তাহাদের বীরজনোচিত প্রগল্ভ ভাব মুহূর্ত্তে স্তম্ভিত হইয়া পুনঃ দ্বিগুণিত তেজে জ্বলিয়া উঠিল। অষ্ট কণ্ঠের গগনবিদারী গর্জ্জনে বনস্থল কম্পিত হইল!—"কোন্ দুরাত্মা আমাদের সর্ব্বনাশ

করিয়াছে ?" আট জনের কোষমুক্ত অসি ঝনৎকার শব্দে বাজিয়া উঠিল। শোকের স্পর্শমাত্র-শূন্য-কণ্ঠস্বরে সিদ্ধি বলিলেন, "বন্ধুগণ, শোকে অভিভূত হইবার সময় এ নয়। আমাদের প্রভু মহাপ্রস্থান করিয়াছেন; এক্ষণে তাঁহার সৎকারের আয়োজন করিতে হইবে। তোমরা ঐ গঙ্গাতীরে চিতা প্রস্তুত কর। একজন এই মূর্চ্ছিতা স্ত্রীলোককে আমাদের নৌকা মধ্যে লইয়া শুশ্রূষা কর। তোমাদের গুরুর আদেশ জানিয়া আমার এই আদেশ পালন কর।"

নীরবে উচ্ছ্বসিত শোকাশ্রু নিরুদ্ধ করিয়া, প্রবল রোষাবেগ সংবরণ করতঃ আটজনে সিদ্ধির আদেশ পালন করিল। অবিলম্বে চিতা সজ্জিত হইল। নীরবে অবিচল-হৃদয়ে সিদ্ধি স্বামীর রক্তপ্লুত দেহ গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া চিতাশয্যায় শায়িত করিলেন; কিন্তু আর পারিলেন না,—সহস্র শিক্ষায়ও সিদ্ধি রমণী মাত্র,—বিংশতি বর্ষীয়া যুবতী মাত্র। চিতাকুণ্ডে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে সিদ্ধি হৃদয় অবিচল রাখিতে পারিলেন না। "হায়রে! যে অঙ্গের ক্ষুদ্র ধূলিকণা কুসুম স্তবকে বিমোচিত করিয়া শান্তি পাই নাই, আজ তায় অনল প্রজ্জ্বলিত করিলাম!" সিদ্ধির চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

চিতানলে শবদেহ ক্রমশঃ বিকৃত, খর্ব্ব, পরে ভস্মাবশেষ হইল। শস্ত্রধারী পুরুষগণ নিতান্ত ভীত ও উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল, কখন সিদ্ধি চিতানলে ঝাঁপ দিয়া পড়েন! তিনি সহমৃতা হইবেন, ইহা তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সিদ্ধি সেরূপ কিছু করিলেন না দেখিয়া সকলেই বিশেষ বিস্মিত হইল। সিদ্ধি স্বহস্তে জাহ্নবী জলে চিতা ধৌত করিয়া আর একবার কাঁদিলেন। "আজ আমার বিজয়া দশমী; সংসারোৎসবের

সাধের প্রতিমা আজ আমি গঙ্গাজলে ভাসাইলাম। আজ যাহা বিসর্জ্জন দিলাম, তাহা আর কত দিনে পাইব? মা জাহ্নবি! কবে তোমার বক্ষে মিশিয়া আমার হারাধন কুড়াইয়া লইব? প্রভু! মনে থাকে যেন, আমি বড় দুর্ব্বলা।"

অনন্তর চক্ষু মুছিয়া সিদ্ধি আগন্তুক পুরুষদিগকে কহিলেন, "তোমরা এদিকে কেন এসেছিলে?"

সর্দ্দার উত্তর করিল, "আমরা প্রভুর অনুসন্ধানে আসিয়াছিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বড় অসময়ে আসিলাম।

সিদ্ধি। তোমরা এখন কি করিবে?

সর্দ্দার। আমাদের পিতা গিয়াছেন, মাতা আছেন। মাতার আদেশ পালন করিয়া জীবন কাটাইব। বলুন জননি! কে আমাদের প্রভুহন্তা? প্রভু আমাদের কি আদেশ করিয়া গিয়াছেন?

সিদ্ধি। সে সব আর একদিন বলিব। তোমাদের প্রভুহন্তার নাম শুনিয়া কি করিবে?

সকলে একস্বরে বলিয়া উঠিল, "তাহার সর্ব্বনাশ করিব।"

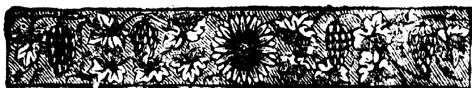
সিদ্ধি। ছি! কেন এ প্রতিহিংসা? তোমাদের স্বর্গীয় প্রভু ত তোমাদিগকে এমন শিক্ষা দেন নাই।

সর্দ্দার। মা! আমরা এই বনে নিতান্ত পশুর ন্যায় বাস করিতেছিলাম; চৌর্য্য, লুণ্ঠন, নরহত্যা প্রভৃতিই আমাদের ব্যবসায় ছিল। কোন্ আশ্চর্য্য কৌশলে সেই মহাত্মা যে আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। আমরা তাঁহার কৃপায় মানুষ হইয়াছিলাম; তাঁহারই কৃপায় ধর্ম্মজ্যোতি পাইয়াছিলাম। কি পাপে আবার তাঁহাকে হারাইলাম?

সিদ্ধি। বিলাপের সময় এ নয়। চল সবে মিলে এই নৌকা বাহিয়া যাই।

সকলে প্রস্থান করিলেন।





তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রজনীর অবসান হইয়াছে। প্রথম প্রিয়-সমাগমে প্রণয়িনীর সলজ্জ-প্রফুল্লভাব-সঞ্চারবৎ, নবারুণ-কিরিটিনী উষার স্নিগ্ধালোকে ধরণী অস্পষ্ট আলোকিত হইয়াছে। প্রভাত-প্রফুল্ল-কুসুম-গন্ধ-বাহী সমীরণের মৃদু-হিল্লোলে জগৎ স্নিগ্ধ ও শান্তিময়। ভাগী-রথী-তীরে গভীর অরণ্য মধ্যে একটী ক্ষুদ্র গৃহে একটী ক্ষীণাঙ্গী রূপসী শয্যাশ্রিতা। রমনী নীরব, তাহার সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চল, কেবল শ্বাস প্রশ্বাসের সঞ্চালনে বক্ষঃস্থল ঈষৎ স্পন্দিত হইতেছে। রমণীর অস্থিমাত্রাবশিষ্ট অঙ্গের বিষম বিবর্ণতা দেখিলে কিছুতেই প্রতীতি হইবে না যে, সে সুনিদ্রায় অভিভূত ; অমন শরীরে নিদ্রা সম্ভবে না। তাহার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, নিমীলিত নেত্রযুগল কোটর-প্রবিষ্ট, গণ্ডস্থল বিশুষ্ক ও বিবর্ণ, অবেণীবদ্ধ রুক্ষ্ম কেশ-কলাপ শয্যাপরে বিক্ষিপ্ত। পার্শ্বে একজন সৈনিক-বেশধারী অল্পবয়স্ক পুরুষ, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের বসন রুধির-রঞ্জিত, মুখমণ্ডল শায়িতা রমণীর অপেক্ষাও নিশ্চল। নয়ন উন্মীলিত, কিন্তু পলক-মাত্র বিরহিত। মুখভঙ্গিমায় হর্ষ বিষাদ কিছুই সূচিত হয় না,— প্রবল ঝঞ্ঝাবিপ্লবান্তে জগতের ন্যায় শান্ত অথচ উদাস। আবেগ উচ্ছ্বাস কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না, যেন কোনও মহাযোগী যোগে নিবিষ্ট!

উষ্ণর স্নিগ্ধানিল স্পর্শে পীড়িতা রমণী যেন সজীব হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল; পার্শ্ববর্ত্তী পুরুষের উপর দৃষ্টিমাত্র চমকিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। রমনীর সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল! ভয়ে ভয়ে আবার চক্ষু মেলিল। তখন প্রভাবতীর চৈতন্য সঞ্চার হইয়াছে, অন্তরে স্মৃতি জাগরিত হইয়াছে। গৃহের চারিদিকে দুই একবার দৃষ্টিপাত করিয়া প্রভা ভাবিল, আমি কোথায় আসিয়াছি? মুক্ত-বাতায়নপথে বাহিরে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিল চতুর্দ্দিকে নিবিড় অরণ্য নির্জ্জন, প্রভাত-প্রবুদ্ধ-পক্ষি-কলরবে শব্দায়মান। দূর হইতে কল্লোলিনীর মৃদুকলনাদ শ্রুত হইতেছে। বিস্ময়-পূরিত অন্তরে প্রভা ভাবিল, এ কোন্ স্থান? এ পুরুষ কে? ইনি কি কোনও দেব পুরুষ? একি কোনও দেবধাম?

প্রভার মনে হইল, সে সেই মহাবিপদে অন্য উপায় না দেখিয়া ধর্ম্মকে ডাকিয়াছিল; একজন দূর হইতে তাহার কথার উত্তর দিয়াছিলেন। তাহার পর আর কিছু মনে আইসে না। তবে স্বয়ং ধর্ম্ম আমাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন? ধর্ম্ম কি আমার কাতর প্রার্থনা কর্ণে স্থান দিয়াছেন? "আমার উদ্ধার কি হইবে?"

শরীর ও মন দুর্ব্বল থাকিলে অনেক সময়ে অন্তরের কথা অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া পড়ে। "আমার কি উদ্ধার হইবে?" একথাটী প্রভাবতীর অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ হইতে বাহির হইল। সে শব্দে পার্শ্ববর্ত্তী কিশোরের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন, "কোনও ভয় নাই, অচিরাৎ ভগবান্ তোমায় সুখী করিবেন।"

মুখের উপর কাপড় টানিয়া দিয়া প্রভা বলিল, "আমি কোথায়?"

অতি স্নেহময় আশা-সঞ্চারী স্বরে উত্তর হইল, "নিরাপদ স্থানে। নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম কর। আমি এখন স্থানন্তরে যাইতেছি; কাল প্রাতে আসিব। কোনও ভয় করিওনা। আমার পরিচারিকা তোমায় পানভোজন করাইবে। আহারাদি করিয়া সবল হও।"

কিশোর অন্তর্হৃত হইলেন। প্রভাবতীর অন্তরে নানা কৌতূহল জন্মিতে লাগিল। তাহার প্রাণে যথেষ্ট আশার সঞ্চার হইয়াছে। সে ভাবিল, "আমি ত স্বপ্ন দেখিতেছি না?"





চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বনের মধ্যে একটী স্থান অতি পরিষ্কার। তাহার একপার্শ্বে একটী মৃণ্ময়ী বেদিকা। বেদিকার উপরে সেই বীরবেশধারিণী সিদ্ধি উপবিষ্টা; সম্মুখে প্রায় শতজন শস্ত্রধারী বীরপুরুষ। তাহাদের প্রত্যেকেই রণসাজে সজ্জিত; প্রত্যেকের কোটীতে পিধান, এক হস্তে ঢাল, অন্য হস্তে বর্ষা; বক্ষে কবচ, মস্তকে উষ্ণীষ। প্রত্যেকের অবয়বই বীরমদে উদ্বেগপূর্ণ; নেত্রে রোষানল প্রজ্জ্বলিত। অমিত-বল-দর্পিত সে সকল বিশাল বীর-মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্বভাবতঃ অনুমিত হয়, যেন এই ক্ষুদ্র যোদ্ধৃদল মুহূর্ত্তে সহস্র অরাতিদলনে সমর্থ! সকলই নীরব, নিশ্চল; দুর্নিবার্য্য হৃদয়াবেগ সংবরণে অসমর্থ হইয়া মাঝে মাঝে কেহ অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনৎকার শব্দ করিয়া উঠিতেছে। তখন সিদ্ধি, বীরমণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "বন্ধুগণ! তোমাদের আকার প্রকার দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তোমরা সকলেই

প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়াছ। প্রবল জিঘাংসা তোমাদের চিত্ত অধীর করিয়া তুলিয়াছে। তোমরা সকলেই পরম প্রভুভক্ত, বর্ত্তমানে তোমাদের এভাব কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু কাহার উপর ক্রোধ করিবে? কাহার উপর প্রতিহিংসা লইবে? ভগবানের আদেশে স্বর্গীয় দূতগণ স্বর্গসিংহাসন সুশোভিত করিবার জন্য তোমাদের প্রভুকে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছেন। তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়া সংসারে আসিয়াছিলেন, সেই ব্রত উদ্যাপন করিয়া পরমানন্দে লীলাসংবরণ করিয়াছেন। তোমরা দেখিয়াছ, আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলে, পাষণ্ডদিগের সাধ্য কি যে তাঁহার জীবননাশ করে। তাঁহার প্রস্থানের সময় হইয়াছিল, তিনি গিয়াছেন। তায় প্রতিহিংসায় প্রয়োজন কি? আরও বলি, যাহাদের অস্ত্রাঘাত তাঁহার স্বর্গ গমনের কারণ হইয়াছিল, তাহাদের একপ্রাণীও জীবিত নাই, প্রতিহিংসা লইবে কাহার উপর? ও পাপ প্রবৃত্তিতে ক্ষান্ত হও। তোমাদিগের স্বর্গীয় গুরুদেবের প্রীতি কামনায় এখন যদি তোমাদের কিছু কর্ত্তব্য থাকে, তবে সবে মিলে তাঁহারই অনুকরণ করিও, তাঁহার ন্যায় দুর্ব্বলকে সবলের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিও। আর অধিক বলিবার আমার সময় নাই। সকলেই অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান কর। আশীর্ব্বাদ করি, সকলেই ধর্ম্মভাবে জীবনযাপন করিয়া পরিণামে তোমাদের প্রভুর সমীপে স্থান পাইবে। আমাকেও তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমিও পরিণামে সে চরণপ্রান্তে স্থান লাভ করিতে পারি। এক্ষণে বিদায় হও।"

সিদ্ধির কণ্ঠ বিরত হইবামাত্র শতকণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া উঠিল,

"আপনি এ বন রাজ্যের রাণী; আমাদের রাজা গিয়াছেন, আমরা রাণীর অধীন থাকিব।"

সিদ্ধি বলিলেন, "আমি সামান্যা অবলা মাত্র। যাঁহার বলে আমি বলশালিনী ছিলাম, তিনি এখন স্বর্গে, অনেক দূরে! এ মহা-রাজ্যের অধিকারিণী আমি হইতে পারিনা। এ ঐশ্বর্য্যভোগের রাজ্য নয়, উত্তরাধিকার-সূত্রে অধিকৃত হইবার রাজ্য নয়! ধর্ম্ম, বীরত্ব, মহাপ্রাণতায় যিনি অগ্রগণ্য তিনিই ইহার অধিকারী। আমি বিধবা রমণী; এ সময়ে চিতা শয্যাই যে আমার উপযুক্ত স্থান তাহা তোমরা সকলেই জান। প্রভুর আদেশে আমি তাহা হইতে নিবৃত্ত আছি। কিন্তু আমার অনেক কর্ত্তব্য আছে! আমাকে তোমরা আজ হইতে বিদায় দাও। তোমাদিগের মধ্যে যিনি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, বীরত্বে সর্ব্বপ্রধান, তাঁহাকে তোমরা রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া লও। এক্ষণে বিদায় লও; আমার আর বক্তব্য নাই।"

ক্ষুণ্ণমনে যোদ্ধ্-বৃন্দ করধৃত অস্ত্র অবনত করিয়া, অবনতমস্তকে অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে সিদ্ধিকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। সিদ্ধি বেদিকাপরে, নির্ম্মল নীলাকাশে নিষ্পলক নেত্র সমাবেশ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সুস্নিগ্ধ প্রভাত বায়ু আসিয়া তাঁহার অঙ্গ শীতল করিতেছিল। ক্রমে ধীরে ধীরে, অতি ধীরে কণ্ঠপথ দিয়া মর্ম্ম-গীতি স্ফুরিত হইল।

কোথা হে জীবন ধন, দাসীরে কি ভুলে আছ?
শান্তি নিকেতনে বসি, অভাগিনীর কি ভাবিছ!
সুধাকর সুধারাশি, কুসুমসৌরভহাসি,
সকলই সঙ্গে নিয়ে সদানন্দে কোথা আছ!
দে'খ প্রভু দয়াময়, দাসীর এ হীন হৃদয়,

স্ববলে করিও বলী, এতদিন যেমন ক'রছ।"
প্রাণেশ নিদেশ তব, বল কবে পূরাইব ?
কবে ও পদে মিলিব সে দিন কত গণিয়াছ ?

ক্রমে সঙ্গীতে তাল মানের সঙ্গতি রহিত হইল, ছন্দোবন্ধনের সামঞ্জস্য রহিল না। গায়িকার উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগের সহিত সঙ্গীত বিশৃঙ্খল ভাবে কাননস্থল সঙ্গীতময় করিয়া তুলিল। কখনও ধ্বনি উচ্চতম তারাগ্রাম স্পর্শ করিয়া উঠে, কখনও বা মুদারাগর্ভে মগ্ন হইয়া পড়ে, কখনও স্বর স্পষ্ট, কখনও কম্পিত ও অস্পষ্ট। ক্রমে পূর্ব্বাহ্ণ অতীত হইল; মধ্যাহ্ণ-রবির প্রখর কিরণে শরীর উত্তপ্ত করিতে লাগিল; সিদ্ধির সঙ্গীতের বিরাম হইল না।—সে মর্ম্মের গাথা ফুরাইল না। ক্রমে তাহা বালিকার রোদনে পরিণত হইবে। তন্ন তন্ন করিয়া, অতীত কাহিনীর বর্ণন করিয়া, সিদ্ধি কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত গাহিলেন, কিন্তু সঙ্গীতের বিরতি নাই! মধ্যাহ্ণ অতীত হইল, অপরাহ্ণ আসিল, তবু কণ্ঠ পরিশ্রান্ত হইল না। সায়াহ্ণ আসিয়া বনপ্রদেশ প্রথমে অল্প তিমিরাচ্ছন্ন করিল; তাহার পর ইন্দুকিরণে জগৎ প্রভাসিত হইয়া উঠিল। অরণ্যচারী পশুপক্ষীর কলরব নিবৃত্ত হইল, সিদ্ধি আত্মহারাচিত্তে তখনও গাহিতেছেন। কিন্তু হৃদয় আর সহ্য করিতে পারে না; দুদিন অনাহার; এত পরিশ্রম, এত মনঃকষ্ট! শরীর অবশ হইয়া আসিল! সঙ্গীত থামিল। চেতনাশূন্য হইয়া সিদ্ধি বেদিকাতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন!

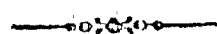
উষা আসিয়া স্নিগ্ধ ব্যজনে সিদ্ধির মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিল। তিনি এক স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলেন। স্বপ্নে সাধন আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন, "ভয় কি প্রাণাধিকে! আমি যে তোমার সঙ্গে থাকিব?"

প্রফুল্লচিত্তে ধীরে ধীরে সিদ্ধি উঠিয়া বসিলেন। অনাহারে শরীর বড় দুর্ব্বল। ধীরে ধীরে গিয়া স্নান করিলেন, কিছু বনফল তুলিয়া ক্ষুধার শান্তি করিলেন। তাহার পর আবার সেই বীরবেশ পরিধান করিয়া আশ্রম মুখে চলিলেন।





পঞ্চম পরিচ্ছেদ



কালের কি বিষম আবর্ত্তন! কি ছিল, কি হইল! কালের রীতিই এই। এইরূপ সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরমার করাই কালের চিরাগত অভ্যাস। কুসুম শুকাইবে, সৌন্দর্য্য পোড়াইবে, হাসি লুকাইবে, ইহাই কালের খেলা। মনোহর সৌধমালা-শোভিত ধন-জনপূর্ণ মহানগরী জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইবে, প্রখর স্রোতস্বিনীবক্ষে ভীষণমরুভূমির সৃষ্টি হইবে, প্রভাময় গগন অন্ধকারে ঢাকিবে, এইরূপ কালচক্রের নিত্যকর্ম্ম। কিন্তু কাল কি কেবল ভাল ভাঙ্গিয়া মন্দ করে?—তাহা নয়, মন্দ ভঙ্গিয়া ভালও গড়িয়া থাকে। কিন্তু সেটাতে মনুষ্যের দৃষ্টি বড় পড়ে না; মানবমন প্রধানতঃ দোষানুসন্ধিৎসু, গুণের দিকে বড় চায় না! আর কালচক্রে যে ছোট হইতে বড় হইয়াছে, অতীত কথা প্রায়ই তাহার মনে পড়ে না। বড় হইতে ছোট হইবার সময় কিন্তু এ নিয়ম খাটে না।

কালের কঠোরাবর্ত্তনে প্রভাবতীর দুর্দ্দশা নিরীক্ষণ করুন! অতীতসুখ-স্মৃতিমধ্যে মহাদুঃখের কালিমামূর্ত্তি,—কুসুম-শোভিত কোকিল-কূজিত মলয়স্নিগ্ধ-বসন্তান্তে তাপক্লিষ্ট দারুণ নিদাঘবৎ,—সুকুমার-যৌবনে কঠোর-নিরাশ-সন্ন্যাসবৎ, জীর্ণা শীর্ণা বিবর্ণা প্রভা

আজ দুইদিন এই অপরিচিত গৃহে আবদ্ধা! যে দিন বাসন্তী-কৌমুদী-বিস্তীর্ণ প্রাসাদ-শিখরে বিষাদ-স্পর্শ-শূন্যা ললিতা প্রভাবতীকে স্বামিসঙ্গে হাসিতে দেখিয়াছিলাম, সে দিন আমরা কি কেহ ভাবিয়াছিলাম প্রভার পরিণাম এই? প্রফুল্ল কুসুমদাম শোভিত উদ্যান-তরুতলে বসিয়া বিরহবিধুরা প্রভা যখন প্রবাস-গতস্বামিমুখ ধ্যান করিতেছিল, তখনও কি কেহ ভাবিয়াছিলাম, প্রভার পরিণামে এত হইবে? ইহাতেই বলি কালচক্র মনুষ্য-বুদ্ধির দুরবগম্য। মানব-বুদ্ধির এই সঙ্কীর্ণতাই মানবের সুখ-ভোগের হেতু। সুখ-সময়ে ভবিষ্যৎ দুঃখচিন্তা করিলে,—জীবনে মরণ চিন্তা করিলে, বৈরাগ্য আসিয়া সুখানুভূতি বিলীন করিয়া দেয়; তাই সুসময়ে দুঃসময় চিন্তা কেহ করে না।

এক দিনরাত্র চলিয়া গেল; প্রভা কোথায় আসিয়াছে বুঝিল না। কেহ তাহার পরিচয় চাহিল না, সেও কাহারও পরিচয় পাইল না। কেবল একজন পরিচারিকা আসিয়া প্রয়োজন মত অন্ন জল দিয়া গিয়াছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছু বলে না। প্রভার আহারে রুচি নাই; কিন্তু কষ্টে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু খাইল। না খাইলে যে জীবন থাকে না। আবার জীবনের প্রতি প্রভার মমতা জন্মিয়াছে। বর্ষণ-নিঃশেষিত-প্রায়-বারিদমধ্যে ক্ষীণবিদ্যুৎ-স্ফূরণের ন্যায় প্রভার ক্ষীণজীবনে আবার আশার সঞ্চার হইয়াছে। ঐযে সেই মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন, তোমার দুঃখ ঘুচিবে। ইনি দেবতা, মানুষ নন্। মানুষে কি মানুষকে এমন বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে? দেবতার কৃপায় আমার ধর্ম্ম বাঁচিয়াছে, এই দেবতার কৃপায় আমি আমার স্বামী পুত্রের মুখ দেখিতে পাইব। মরিব কেন?

আশার আশ্বাসনী শক্তির ইয়ত্তা নাই। আশা আসিয়া প্রভার দুর্ব্বল দেহে বলসঞ্চার করিয়া দিল। ধীরে ধীরে প্রভা গৃহের মধ্যে পদচারণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। গৃহের অলৌকিক শোভা দেখিয়া প্রভা মোহিত হইল। শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত হর্ম্ম্যতলে মলিনতার চিহ্নমাত্র নাই; কক্ষপ্রাচীর বিমল শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত। সর্ব্বময় বিমল শুভ্রতা ব্যতীত কুত্রাপি অন্যবর্ণের আভাস মাত্রও দৃষ্ট হইল না। কক্ষটী বিস্তৃত; তাহার এক পার্শ্বে বৃহৎপালঙ্কে শুভ্র সুপরিচ্ছন্ন শয্যা বিস্তৃত; সে শয্যা এখন প্রভাবতীর অধিকৃত। এক পার্শ্বে বন্দুক, তরবারী, ঢাল, বর্শা, তীর, ধনুক প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ সুসজ্জিত রহিয়াছে। একদিকে মৃদঙ্গ. পাখোয়াজ, ত্রিতন্ত্রী, বীণা, প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র পরিচ্ছন্নভাবে বিন্যস্ত; অন্যদিকে কয়েকখানা গ্রন্থ, কুশাসন মৃগচর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পুষ্পাধার, দীপাধার, ধূপাধার, কোষাকোষী, চন্দন প্রভৃতি পূজোপকরণ সামগ্রী রহিয়াছে। গৃহের তৈজসপত্রের সংখ্যা অতি অল্পই; তাহার অধিকাংশই প্রস্তরময়। প্রভা ভাবিল, এ যাঁহারই পুরী হউক; তিনি একাধারে বীর, রসিক, আবার সন্ন্যাসী! অরণ্য মধ্যে একি বনদেবতার আশ্রয়?

প্রভাবতী একটী গবাক্ষের উপর মস্তক রাখিয়া, নবারুণপ্রদীপ্ত অসীম বনরাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতে লাগিল, "আমি দেবতার আশ্রয় লাভ করিলাম, এখন কি আমার দুঃখ ঘুচিবে? কিন্তু অন্তরে যে আশা হয় না! আমার বুঝি সব আশার শেষ হইয়াছে। বোধ হয় এতদিনে স্বামী বাড়ীতে আসিয়াছেন। আমার নিরুদ্দেশ সংবাদ পাইয়া তিনি কি ভাবিতেছেন? ভাবিতেছেন, আমি পাপিষ্ঠা, অভিসারিকা হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছি।

একথা ভাবিতে তিনি কত মর্ম্মব্যথা পাইয়াছেন! তাঁহার চির-বিশ্বাসিনী প্রাণাধিকা প্রভাকে দ্বিচারিণী কলঙ্কিনী ভাবিতে তাঁহার হৃদয়ে কি বজ্রাঘাত বাজে নাই? এখন যদি দেখা হয়, তবে কি আর আমায় তিনি বিশ্বাস করিবেন? আর কি চরণে স্থান দিবেন? কেন দিবেন? হায়! কেন আমি গঙ্গাজলে ডুবিলাম না? কেন আমি এই সব অস্ত্রপ্রয়োগে এ পাপদেহ পরিত্যাগ করি না? আমার ভবচন্দ্র, বুকজুড়ান, মা-বলানিধি আর কি আমি দেখিব? আর কি সে চাঁদমুখ চুম্বন করিয়া, সে ননীর পুতুল বুকে লইয়া বুক জুড়াইতে পারিব? ভব কি আমার বাঁচিয়া আছে? স্তন্যপায়ী শিশু মা হারা হইয়া কেমনে বাঁচিবে? যদি বাঁচিয়া থাকে, পাপিষ্ঠার গর্ভজাত বলিয়া সকলে তাহাকে ঘৃণা করিতেছে! বুঝি আমার কথা মনে করিয়া স্বামীও তাহাকে ঘৃণা করিতেছেন! আমার মা বুঝি নাই, আর বুঝি তাঁহাকে দেখিব না? কে এমন শ্বাশুড়ী পাইয়া থাকে? তিনি যে আমায় সন্তান অপেক্ষাও ভাল-বাসিতেন? আর বৃদ্ধ রামকৃষ্ণ!—আমায় কত ভালবাসে! আমার জন্য তার প্রাণে কি করিতেছে! হায়! আমার সব ছিল, আমার যেমন ছিল, ভবে এমন কার আছে? দেবতার মতন স্বামী, কার্ত্তি-কের মত পুত্র, মায়ের মতন শ্বাশুড়ী, পিতার মতন পরিচারক এমন কার আছে? বিধাতা কেন আমায় ভোগ করিতে দিলেন না? কেন আমার কপালে এসব সহিল না? আমি নিজ কর্ম্মফলে সব হারাইলাম। কেন আমি স্বামীর প্রতি সন্দেহ করিলাম?—কেন আমি ইষ্টদেবের প্রতি ভক্তি হারাইলাম?—কেন আমি পাপিষ্ঠা যোগমায়ার মায়ায় মুগ্ধ হইলাম?

প্রভার চিন্তা অনন্ত, দুঃখ অনন্ত! ঘাত-প্রতিঘাতে বালিকার

ক্ষীণ হৃদয় ভাঙ্গিয়া আসিল। নিকটে জনমানব নাই, কাহার কাছে অভাগিনী মনের দুঃখ জানাইবে? অজস্রধারে অশ্রুবিমোচন করিয়া প্রভাবতী কাঁদিতে লাগিল। প্রভাত-প্রহ্লাদিত বনবিহারী বিহঙ্গমগণের কাকলী নিষ্ঠুর ব্যঙ্গধ্বনিবৎ প্রভাবতীর শ্রুতি স্পর্শ করিতে লাগিল।

তখন ধীর-পদবিক্ষেপে পূর্ব্বদৃষ্ট সেই কিশোর পুরুষ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অতি স্নেহ-সুকোমলকণ্ঠে বলিলেন, "কেমন আছ ভাই?"

প্রভা চমকিয়া উঠিল, ব্যস্ত হইয়া অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিল। অপরিচিত পুরুষের কাছে বঙ্গবালা কি অনাবৃতমুখে দাঁড়াইতে পারে। প্রভার কথা বলিতে বড় ইচ্ছা করিতেছিল। প্রভা মনে মনে বুঝিয়াছিল, ইনি পুরুষ হইলেও দেবতা, ইঁহার সঙ্গে কথা বলিতে দোষ কি? কিন্তু সহসা মুখে কথা ফুটিল না।

কিশোর অপেক্ষা না করিয়া স্বহস্তে প্রভাবতীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া বলিলেন, "ছি! আমায় এত লজ্জা! আমি তোমার জন্য এত করিলাম, তুমি আমার সঙ্গে কথাটীও বলিবেনা!"

প্রভার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল? একি? একজন অপরিচিত পুরুষের স্বহস্তে অপরিচিত কামিনীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন।—কি ভয়ানক ব্যাপার! প্রভার নবোদ্গত আশা-অঙ্কুরটী শুকাইয়া গেল; বালিকার দুঃখ-তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে আশা বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় জ্বলিয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল। প্রভা ভাবিল, ইহাকে আমি দেবতা বলিয়া মনে করিয়াছিলাম! এও যে পিশাচ। জগৎ কি তবে পিশাচের রাজ্য! আমি শৃগালের গ্রাস হইতে কি সিংহের

গ্রাসে পড়িলাম! বাত্যা-বিতাড়িত কদলী পত্রের ন্যায় প্রভার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল।

কিশোর আবার প্রভাবতীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "তোমার চাঁদমুখের একটী কথা কি শুনিব না সুন্দরি? আমি তোমায় বড় ভালবাসি!"

প্রভা অনুধাবন করিয়া শুনিলে বুঝিতে পারিত, কিশোরের কথাগুলি একটু বাধ বাধ, একটু অস্বাভাবিক রকমের; অঙ্গ ভঙ্গি চাহনী প্রভৃতিও যেন কিছু কৃত্রিমতাযুক্ত। কিন্তু তাহার ততটা অনুধাবন করিবার শক্তি ছিলনা। প্রভা অষ্টাদশ বর্ষীয়া অন্তঃপুর-বাসিনী বালিকা মাত্র। কিন্তু উপর্য্যুপরি বিপদে পতিত হইয়া তাহার বালিকা-সুলভ ভীরুভাব কতকাংশে তিরোহিত হইয়াছে। বিশেষ এমন সময়ে হিন্দু-রমণীর বীরত্বপ্রদর্শন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কম্পিত-কলেবরে রুক্ষকণ্ঠে একটু উচ্চস্বরে প্রভা বলিল, "তুমি কে?"

কিশোর। আমি তোমার বন্ধু। আমার উপর এমন রুষ্ট হইতেছ কেন সখি?

প্রভা। এ গৃহ তোমার?

কিশোর। আমার; তোমারও পরগৃহ নয়।

প্রভা। তুমিই কি আমায় দস্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছ?

কিশোর। আমি সর্ব্বস্ব দিয়া তোমায় উদ্ধার করিয়াছি। তুমি রাগ কর কেন ভাই?

প্রভা। কেন তুমি আমায় উদ্ধার করিয়াছিলে?

কিশোর। তোমারই জন্য; তোমার উদ্ধার-কর্ত্তা অন্য কামনা রাখেন না। তুমি কি আমার হইবে না?

দুই চারি বার কথা বলিয়া প্রভার সাহস আরও বাড়িয়াছে। অধিকতর তীব্রকণ্ঠে প্রভা বলিল, "তোমার ন্যায় রাক্ষস কর্ত্তৃক দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া, জীবনকে অতি কলঙ্কিত বোধ করিতেছি। আমি ভাবিয়াছিলাম, আমার ন্যায় নিরাশ্রয়ের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তুমি আমার উদ্ধার করিয়াছিলে, তাই তোমাকে দেবপুরুষ বিবেচনা করিয়া এতক্ষণ অন্তরে অন্তরে পূজা করিতেছিলাম। এখন দেখিতেছি, তুমি পিশাচ অপেক্ষাও ঘৃণিত, রাক্ষস অপেক্ষাও হিংস্র। তুমি বলিতেছ, তুমি আমার উপকার করিয়াছ। ব্যাঘ্রের গ্রাস হইতে দুর্ব্বল হরিণীকে উদ্ধার করা দয়ার কার্য্য বটে; কিন্তু তাহা মাংসলোলুপ ব্যাধের পক্ষে নয়; ব্যাধের পক্ষে তাহা ঘোরতর দস্যুতা। তুমি আমায় দস্যুকর হইতে উদ্ধার করিয়া যদি নদীস্রোতে ভাসাইয়া দিতে, তাহা হইলে স্বর্গের দেবতারা তোমায় পরোপকারী সাধু বলিয়া পুরস্কৃত করিতেন। কিন্তু এখন তোমার পুরস্কার নরক!"

ভয়ে, নৈরাশ্যে, রোষে প্রভাবতীর ক্ষীণ দেহের সংজ্ঞা পুনর্ব্বার বিলুপ্ত হইল। সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল; কিশোর বেশধারিণী সিদ্ধি অঙ্কোপরে প্রভাবতীর মস্তক রাখিয়া, ব্যাজন করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "এ সময়ে এরূপ করিয়া আমি ভাল করি নাই।"

অল্পক্ষণ পরে প্রভার চৈতন্য-সঞ্চার হইল; চক্ষুরুন্মীলন মাত্র ত্রস্তভাবে সিদ্ধির ক্রোড় হইতে মস্তক তুলিয়া লইয়া বলিল, "পাপিষ্ঠ! তোমায় আমি দেবতা মনে করিয়াছিলাম। বাস্তবিক তোমার আকৃতি দেখিলে দেবতা বলিয়া ভ্রম হয়। এমন সুন্দর দেহে এত কলঙ্ক! এইরূপই জগতের রীতি। চাঁদ সুন্দর, কিন্তু

কলঙ্কের আধার। ঐ শাণিত তরবারি সুন্দর, ওর স্পর্শে জীবনান্ত হয়। আর সুন্দর দেখিয়া বিশ্বাস করিব না। মানুষকে আর বিশ্বাস করিব না, মানুষের আশ্রয় আর লইব না। আমি চলিলাম; যদি স্ত্রীহত্যার ভয় থাকে, আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করিও না।"

সিদ্ধি প্রভার হাত ধরিয়া বলিলেন, "দাঁড়াও ভগিনী, এখান হইতে তুমি কি যাইতে পার?" কিশোর মস্তকের উষ্ণীষ উন্মোচিত করিলেন।—বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে প্রভা দেখিল, ভ্রমরকৃষ্ণ নিবিড় কুন্তলরাজি কিশোরের জানু পর্য্যন্ত স্পর্শ করিল! অপসারিত উরস্ত্রাণ-নিম্নে পীনোন্নত পয়োধর! কি প্রহেলিকা! ইনি কি স্ত্রীলোক! প্রভা বিস্মিত, ভীতিবিহ্বল জড়প্রায় নিস্পন্দনেত্রে সিদ্ধির দিকে চাহিয়া রহিল!

ধীরে ধীরে সিদ্ধি বীরবেশ ত্যাগ করিলেন। শুক্তির কঠিনাবরণোদ্ভিন্ন উজ্জ্বল রত্নসন্নিভ তাঁহার দেহপ্রভায় গৃহস্থল উদ্ভাসিত হইল! আপন কমনীয় কান্তির প্রতি চাহিয়া সিদ্ধির চক্ষে জল আসিল! তিনি আত্মহারা হইয়া গদগদকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন, "প্রাণেশ্বর! পরমেশ্বর! হৃদয়রাজ্যের সর্ব্বময় অধিপতি! আমি ত তোমায় আমার সর্ব্বস্ব দিয়াছিলাম; কিন্তু সে সর্ব্বস্ব তুমি লইয়াছ কৈ? আমার রূপ যৌবন সবই যে আমার রহিয়াছে। তুমি গিয়াছ, আমার ত কিছুই যায় নাই! এ যৌবন ত কিছুমাত্র শুষ্ক হয় নাই,—এ দেহ ত কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই! এই সমস্ত হেয় সম্পদ, নরকের সোপান সবই আমার অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। নাই কেবল তোমার কাছে যে অমূল্য স্বর্গীয় সম্পদ লাভ করিয়াছিলাম,—তোমার নিষ্কলঙ্ক-চন্দ্রমুখদর্শনের অনুপম

সুখ,—তোমার শ্রীচরণ সেবার অসীম শান্তি! প্রভু! আমি এই পিশাচ-ভোগ্য সামগ্রী লইয়া অনন্ত পিশাচের দেশে এত দীর্ঘকাল বিচরণ করিতে কি পারিব? তোমার আদেশ পালন করিতে কি পারিব? তোমারই বলমাত্র ভরসা!

প্রভা দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিল। মনে মনে ভাবিল, "ইনি যেই হউন; দেবতা তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু দেবতার অন্তরেও কি দুঃখ থাকে? দেবতারাও কি রোদন করেন?" প্রকাশ্যে বলিল, "আপনি কে?" সিদ্ধি আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "সতি! আমি তোমায় জানিতাম না, তাই এমন পরীক্ষা করিলাম। আমি সর্ব্বস্ব বিনিময়ে যে রত্নের উদ্ধার করিয়াছি, তাহা প্রকৃত রত্ন কি সামান্য কাচখণ্ড, তাহাই পরীক্ষা করিলাম। আমার প্রতি বিরক্ত হইও না। তুমি আমার ভগিনী। তুমি রমণীকুলের রত্ন, আমার সর্ব্বস্ব দান ব্যর্থ হয় নাই।

প্রভা। আপনি কে?

সিদ্ধি। আমি তোমার স্বর্গীয় উদ্ধারকর্ত্তার দাসী। তুমি কে ভাই?

প্রভা। আমি আপনার কথা বুঝিলাম না, আপনি কি এই বনরাজ্যের বনদেবী?

সিদ্ধি। আমার পরিচয় তোমায় আমি সময়ান্তরে বলিব। তুমি এখন নিজ পরিচয় দাও; জানিও তোমার দুঃখকষ্ট নিবারণ করিতে সাধ্যমত আমি ত্রুটী করিব না।

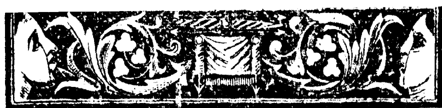
প্রভা সিদ্ধির পরিচয় না পাইলেও তাঁহার কথায় প্রাণে বড় আশ্বাস পাইল। তাঁহার আকার প্রকার ও কণ্ঠস্বরে সহজেই তাঁহার প্রতি বিশ্বাস জন্মিল। প্রভা আত্ম-পরিচয় গোপন

রাখিল না। স্বামীর্ নাম বলিল, স্বগ্রামের নাম বলিল, পূর্ব্ব-সৌভাগ্যের কথা বলিল, স্বামীর প্রবাস-যাত্রার কথা বলিল, পাপিষ্ঠা যোগমায়ার চাতুর্য্য, তাহার মোহ সকলই বলিল। পথে দস্যুগণ দুরাত্মা নায়েবকে হত্যা করিয়া তাহাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও বলিল। তারপর সিদ্ধির পায়ের উপর পড়িয়া বলিল, "মা! দেবি! আমার দুর্গতি কি ঘুচিবে? তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।"

সিদ্ধি সস্নেহে বলিলেন, "স্থির হও, ভগবান্, তোমার দুঃখ দূর করিবেন। তুমি সতী, সতীর দুঃখ চিরস্থায়ী নয়। আমি কল্যই তোমার স্বামি-পুত্রের অনুসন্ধানে যাইব। হঠাৎ তোমায় তোমার স্বামীর কাছে উপস্থিত করিলে তিনি তোমার প্রতি সন্দেহ করিতে পারেন। তোমার সতীত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া পরে তোমাকে লইয়া যাইব। এ পর্য্যন্ত তুমি এখানে নিশ্চিন্ত মনে থাক; এখানে কেহ তোমার অমঙ্গল করিতে পারিবে না।"

অনন্তর সিদ্ধি প্রভাকে লইয়া বনশোভা দেখিতে বন মধ্যে চলিলেন!





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধবয়সে তারাসুন্দরীর অদৃষ্টে বিধাতা অনেক দুঃখ লিখিয়াছিলেন। তারাসুন্দরী ভাগ্যবানের গৃহলক্ষ্মী ছিলেন; অকালে বিধবা হইয়া, অবস্থার পরিবর্ত্তনে বৈধব্যক্লেশের সঙ্গে অভাব-দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু সুশীল পুত্রের মুখ দেখিয়া তিনি কোনও দুঃখকেই দুঃখ মনে করেন নাই। তারপর চারুচন্দ্র উপার্জ্জনক্ষম হইলেন, সংসারে অভাব ঘুচিয়া গেল। তারাসুন্দরী ভাবিলেন, শেষ বয়স আমি সুখেই কাটাইব! আমার সোণার চাঁদ পুত্র, লক্ষ্মী পুত্রবধূ, সাতরাজার ধন মাণিক আমার ভবচন্দ্র,—আমার দুঃখ কি? কিন্তু বিধাতা তাঁহার এই বুকভরা আশায় বজ্রপাত করিলেন। পুত্রবধূ নিরুদ্দিষ্ট হইল; শোকে দুঃখে অধীর হইয়া তারাসুন্দরী পুত্রের কাছে সংবাদ পাঠাইলেন। তাহাতে যাহা প্রত্যুত্তর পাইলেন তাহাতে তাঁহার আশা প্রদীপটী নির্ব্বাণ প্রায় হইয়া আসিল। কিন্তু মনুষ্য সহজে আশা ত্যাগ করিতে চায় না। তারাসুন্দরী অনেকক্ষণ ধরিয়া রোদন করিয়া মনের বেদনার কথঞ্চিত লাঘব করিলেন। তাহার পর স্থির করিলেন চারুচন্দ্র নিতান্ত মনোদুঃখে এমন পত্র লিখিয়াছে। চিরদিন

তাহার মনোভাব এরূপ থাকিবে না। যাক বউ, ছেলে থাকিলে আমি আবার বউ পাইব। রামকৃষ্ণ প্রভার অনুসন্ধানে গিয়াছিল। সে বাড়ী আসিবামাত্র তারাসুন্দরী তাহাকে চারুচন্দ্রের কাছে পাঠাইয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন, যেরূপে হউক তাহাকে বাড়ী আনাই চাই।

রামকৃষ্ণকে পাঠাইয়া তারাসুন্দরী পথ চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বেই ডাকযোগে এক পত্র ও এক হাজার টাকা আসিল। চারুচন্দ্র লিখিয়াছেন;—

"মা! তোমার সে পুত্র আর নাই। আমি অধঃপাতে গিয়াছি। আমি বিদায় হইলাম। তোমাকে এই হাজার টাকা পাঠাইতেছি, ইহাতে তোমার দুই তিন বৎসর চলিতে পারে। আমার মতে তোমার আর গৃহবাসের প্রয়োজন নাই; সংসারের সুখ তোমার ঘুচিয়াছে। সত্বর কাশীবাসের আয়োজন কর। রামকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া যাইও। বাড়ীতে যে কিছু তৈজস পত্র আছে এবং বাড়ী ঘর সমস্ত বিক্রয় করিয়া অতি সত্বরই কাশী যাত্রা করিও।"

তারাসুন্দরী মূর্চ্ছিতা হইলেন! তাঁহার বার্দ্ধক্যজীর্ণ শোকতাপশিথিল দুর্ব্বল হৃদয় ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল! শিশু ভবচন্দ্র সংজ্ঞাহীনা পিতামহীর বক্ষে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছিল। সেই রোদনধ্বনিই তারাসুন্দরীর মূর্চ্ছাপনোদন করিল! শিশুর অশ্রুপরিপ্লুত ম্লান মুখপদ্মই বৃদ্ধার হৃদয়ে যথেষ্ট সান্ত্বনা প্রদান করিল। তারাসুন্দরীর সব গিয়াছে, কিন্তু যতদিন ভবচন্দ্র আছে ততদিন তাঁহার সংসারবন্ধন সম্পূর্ণ ছিন্ন হইতে পারে না। ভবচন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া তারাসুন্দরী মরিতে চাহিলেন না। হৃদয়ের দুর্নি-

বার্য্য শোকাবেগ প্রশমিত করিয়া তিনি ভবচন্দ্রকে কোলে তুলিয়া সান্ত্বনা করিলেন।

যে ডুবিতে যায় সে একগাছা তৃণ পাইলে তাহারও আশ্রয় লইতে চেষ্টা করে। আশার সামান্য ছায়া পাইলেও তাহা মানুষে ছাড়িতে পারে না। তারাসুন্দরী ভাবিলেন চারুচন্দ্র পত্রে যাহা লিখুন, রামকৃষ্ণ যখন গিয়াছে তখন তাহাকে লইয়া আসিবে। কিন্তু সময় চলিয়া গেল, রামকৃষ্ণ ফিরিল না, চারুচন্দ্রেরও আর কোনও সংবাদ আসিল না। তারাসুন্দরী কাঁদিলে ভবচন্দ্রও কাঁদে, তাই তিনি এত দুঃখেও কাঁদিতে পারিলেন না। কবি বলিয়াছেন, যে দুঃখে রোদন নাই, তাহা যমের দূত। প্রখর স্রোতের গতি অবরুদ্ধ করিতে গিয়া শৈলখণ্ড যেমন তদাঘাতে অল্প অল্প ক্ষীণ হইতে থাকে, অবরুদ্ধ দারুণ শোকের আঘাতে তারাসুন্দরীর বার্দ্ধক্যজীর্ণ শরীরও তেমনি অল্পে অল্পে ক্ষীণ হইতে লাগিল। তাঁহার চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া আসিল। কিন্তু ভবচন্দ্রকে কে খাওয়াইবে দাওয়াইবে? তাই বৃদ্ধা অতি কষ্টে চলিতেন ফিরিতেন। সব পারা যায়, কালের প্রতিকূলে দাঁড়ান যায় না। তারাসুন্দরী আর চলিতে পারিলেন না, শয্যাগত হইলেন! আজ সমস্ত দিন তিনি চলিয়াছেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর পারিলেন না। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এখন এমন শক্তিটুকুও নাই যে, পার্শ্বে ভবচন্দ্র বসিয়া কাঁদিতেছে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইবেন! তিনি বুঝিলেন, অবিলম্বে শমন আসিয়া তাঁহার সর্ব্বদুঃখের শান্তি করিবে! অজস্র অশ্রুধারা বৃদ্ধার গণ্ড-দেশ বাহিয়া তাঁহার শয্যা প্লাবিত করিতেছিল। কেন তারাসুন্দরী কাঁদিলেন?—যম কি তাঁহারও কাছে প্রিয় নয়? তারাসুন্দরীর জীবনে কি আরও বাঁচিবার সাধ আছে? কিন্তু ঐ যে শিশু তাঁহার

মুখপানে চাহিয়া কাঁদিতেছে! তাঁহার অভাবে উহার কি গতি হইবে? হায়রে সংসার, তোমার বন্ধন একটী নিশ্বাস থাকিতেও ছিন্ন হইবার নয়! পুত্র-শোক, পুত্রবধূ-শোক, সম্পদ শোকে কাতরা, নিরাশ্রয়া বৃদ্ধা জীর্ণশীর্ণা অভাগিনী তারাসুন্দরী!—তাহারও সংসারের কাছে বিদায় লইতে দুঃখ! বলিহারি সংসারমোহ! বলিহারি জগৎপাতার মানব-হৃদয়-সৃষ্টি-চাতুর্য্য!

ক্রমে রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, তারাসুন্দরীর অবস্থা ততই মন্দ হইতে লাগিল। শমন তাঁহার শিয়রে উপস্থিত। কিন্তু তিনি মৃত্যু যন্ত্রণা ভাবিতেছেন না, মরণের বিভীষিকা ভাবিতেছেন না,—সংসার—যে সংসার প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার কাছে অগ্নিময় ভীষণ যন্ত্রণাপ্রদ, সেই যে সংসার হইতে তাঁহাকে অচিরাৎ বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, তারাসুন্দরী তাহাই ভাবিতেছেন! "আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? আমার কি না ছিল! সোণার সংসার, পুত্র, পুত্রবধূ আমার সকলই ছিল, আমি মরণকালে কাহারও মুখ দেখিতে পাইলাম না। সর্ব্বশেষ আমার যাহা ছিল, আমার কাঙ্গালিনীর ধন ভবচন্দ্রকে আমি কোথায় রাখিয়া চলিলাম? রামকৃষ্ণও ফিরিল না; সময়ে সেও ত্যাগ করিল। আজ যদি তাহার দেখা পাইতাম, তাহা হইলে এই শিশুকে তাহার হাতে সঁপিয়া সুখে মরিতে পারিতাম! হায়! হায়! এতদিনে দেবগ্রামের রায়বংশের লোপ হইল! হা অনাথনাথ হরি! এ সময়ে আর কাহার আশ্রয় লইব? তুমিই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। নিতান্ত নিরাশ্রয় এ শিশুকে তুমিই আশ্রয় দিও! কাঙ্গালের ধন আমি তোমারই পদে সমর্পণ করিয়া বিদায় লইলাম?"

এমন সময়ে বৃদ্ধার কর্ণে মধুর "মা" সম্বোধন প্রবেশ করিল।

পুত্রহারা জননীর প্রাণ চমকিয়া উঠিল; তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন; দ্বারদেশে এক অপূর্ব্বসুন্দরী নবীনাযোগিনী দণ্ডায়মানা! গৃহে আলো নাই; বাতায়ন-প্রবিষ্ট চন্দ্ররশ্মি আসিয়া যোগিনীর কমনীয় কলেবর অস্পষ্ট প্রকাশিত করিতেছে। রমণীমূর্ত্তি দেখিয়াই তারাসুন্দরী ভাবিলেন, বুঝি প্রভাবতী আসিয়াছে। তিনি অতি ব্যস্তে বলিলেন, "কে? বউমা! এইত মা!" উল্লাসে তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল।

যোগিনী নীরবে প্রদীপ জ্বালিত করিলেন। বিস্মিতনেত্রে ভগ্নাশ অথচ আশ্বস্ত হৃদয়ে তারাসুন্দরী যোগিনীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিলেন এ প্রভাবতী নয়।—তবে কে? একাল পর্য্যন্ত তিনি অনেক সন্ন্যাসিনী ভিখারিণী দেখিয়াছেন, এমন অপূর্ব্বরূপ-লাবণ্যময়ী যোগিনী মূর্ত্তি কখনও দৃষ্টিগোচর করেন নাই! যোগিনীর বরাঙ্গে পূর্ণ যৌবন বিকসিত, কিন্তু সে যৌবনে প্রগলভ-বয়ঃসুলভ উদ্দাম চাঞ্চল্য কিছুমাত্রও লক্ষিত হয় না, প্রাবৃট্-পূর্ণ স্থিরসরোবরবৎ প্রশান্ত গম্ভীর। সে মুনিমনোহর রূপরাশিতে কঠোর সন্ন্যাস প্রভা অনুপমরূপে বিভাসিত! যোগিনী বয়সে নবীনা, সন্ন্যাস-ধর্ম্মেও যেন নবীনা। নিতম্বলম্বিত নিবিড় চিকুরজাল রুক্ষ, কিন্তু অচিরগত সৌষ্ঠব-চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, এখনও সে কৃষ্ণ-কেশরাশি যোগি-জনোচিত জটাযূটে পরিণত হয় নাই। এখনও সে মুখ সন্ন্যাসি-সুলভ নিঃসঙ্কোচ-ভাবাপন্ন হয় নাই, কুলললনা-সুলভ লজ্জাভাবের স্পষ্ট আভাস প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু সে গৈরিক পরিহিত, বিভূতি-চন্দন-চর্চ্চিত মনোহর কান্তিতে কেহ কপটতার সন্দেহ করিতে পারে না। তারাসুন্দরী ভাবিলেন, ইনি কোনও ছদ্মবেশী দেবী, ইনি হয়ত স্বয়ং হরপ্রিয়া-

গৌরী আমার নিরাশ্রয় ভবচন্দ্রকে আশ্রয় দিতে আসিয়াছেন। তারাসুন্দরী যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "মা! উঠিয়া প্রণাম করিব এমন শক্তি নাই। এ অনাথ শিশুকে দেখিও।"

অতি ব্যস্তে বৃদ্ধার পদপ্রান্তে বসিয়া সিদ্ধি বলিলেন, "ওকি মা! তুমি আমার মা, আমি তোমার কন্যা; আমাকে কি প্রণাম করিতে হয়? তুমি আশ্বস্ত হও, আমি তোমার পুত্র পুত্রবধূর সংবাদ বলিতে আসিয়াছি।

তারা। কে মা তুমি?

সিদ্ধি। আমি সিদ্ধি, তোমার পুত্রবধূ প্রভাবতীর প্রিয়সখী।

তারা। আমার বউমা কোথায়?

সিদ্ধি। নিরাপদে আছেন। সমস্ত পরে বলিব, আগে আমি তোমার কিছু পথ্য ও ছেলেটীর কিছু খাইবার যোগাড় করি।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় অযত্নে কাঁদিয়া কাঁদিয়া শিশু ভবচন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পরমাদরে সিদ্ধি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। আধ আধ স্বরে দুইবার "মা মা" বলিয়া শিশু সিদ্ধির মুখপানে তাকাইয়া রহিল। সন্ন্যাসিনী সিদ্ধির কপোল বাহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সিদ্ধি বুঝিলেন, শিশুমুখে "মা" কথা কি মর্ম্মস্পর্শী! কি মোহ-মদিরাময়! পরের সন্তানের 'মা' ডাকে প্রাণ এত মুগ্ধ হইল, না জানি নিজ সন্তানের 'মা' ডাকে প্রাণ কত মুগ্ধ হয়! এ মায়া কি আমি ছিন্ন করিতে পারিব?

সিদ্ধি ভবচন্দ্রকে কিছু দুগ্ধ পান করাইলেন. তারাসুন্দরীকে পথ্য প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তারপর প্রভা সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই তারাসুন্দরীকে আস্তে আস্তে বলিলেন, প্রভাকে সত্বর বাটী আনিয়া দিবেন এবং চারুচন্দ্রকে

প্রভার সংবাদ বলিয়া বাড়ীতে আনিবেন বলিয়া সিদ্ধি অঙ্গীকার করিলেন।

সিদ্ধির সমস্ত কথাই তারাসুন্দরী বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার মৃত্যুযন্ত্রণা অনেক পরিমাণে লঘু হইল। কিন্তু পুত্র, পুত্রবধূর মুখ নিরীক্ষণ করিবার জন্য বিধাতা তারাসুন্দরীকে আর সময় দিলেন না। পরদিবস মধ্যাহ্নে বৃদ্ধা সংসারের সমস্ত সুখ দুঃখ আশা নিরাশা অতিক্রান্ত করিয়া জীবন-সর্ব্বস্ব ভবচন্দ্রকে ভুলিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন। পাড়াপ্রতিবেশীরা আসিয়া তাঁহার সৎকার করিল।

তখন পাড়াপ্রতিবেশীরা কেহ কেহ শিশু ভবচন্দ্রের বিষয় ভাবিল। অনেক মাতা ভবচন্দ্রের লালনপালনের ভার লইতে চাহিলেন। বঙ্গ-রমণীর হৃদয়ে স্নেহের অভাব নাই। কিন্তু সিদ্ধি বলিলেন, ভবচন্দ্রের জন্য আপনাদের কোনও চিন্তার আবশ্যক নাই। আমি ইহার ভার লইলাম। কেহ সিদ্ধিকে চিনিত না, সিদ্ধিও কাহাকেও পরিচয় দিলেন না। কাহারও কাহারও মনে সন্দেহ হইল; কিন্তু অনেকেই বলিল, "ইনি যেই হউন, ইঁহাকে দেখিলে বড় ভক্তি হয়।"

সেইদিন রাত্রিতে সিদ্ধি ভবচন্দ্রকে লইয়া পলায়ন করিলেন, গ্রামের লোক আসিয়া রায়বাড়ী শূন্য দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। সকলেই ভাবিল, সন্ন্যাসী মাগীটা ডাকিনী, ছেলেটাকে চুরি করিয়া লইয়াছে। কেহ বলিল, ওরা নরবলি দিয়া সিদ্ধ হয়, তাই ছেলেটাকে চুরি করিয়া নিয়াছে। অনেক মায়ের চক্ষে জল পড়িল।



সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কয়েক দিন হইল সিদ্ধি প্রভার দেশের সংবাদ আনিতে গিয়াছেন। প্রভা সেই নির্জ্জন অরণ্যাশ্রমে আশাপথ চাহিয়া দিন কাটাইতেছে। প্রভা দিনরাত্রি বসিয়া ভাবে "আবার কি আমি তেমনি হইব?"

একদিন প্রখর-মধ্যাহ্ন-রবিকরদীপ্ত আরণ্য-তরুরাজির প্রতি চাহিয়া প্রভা তাহার সদা-সহচরী চিন্তার সেবা করিতেছে, এমন সময়ে ভবচন্দ্রকে কোলে লইয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবরে সিদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইলেন! পুত্রমুখ দেখিয়া জননীর প্রাণ নাচিয়া উঠিল। শিশুও মাকে চিনিল, ছুটিয়া গিয়া মায়ের বুকে লুকাইল! মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত ভুলিয়া আত্মহারা-প্রাণে প্রভা পুত্রমুখ চুম্বন করিল! কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই ভয় হইল,—তারাসুন্দরীর ক্রোড় হইতে সিদ্ধি কিরূপে ভবচন্দ্রকে কাড়িয়া আনিলেন? তিনি কোথায়? ব্যস্ত হইয়া প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায়!"

সিদ্ধি বলিলেন, "স্বর্গে!"

প্রভার মর্ম্মস্থল কাঁপিয়া উঠিল, অধরোষ্ঠ স্ফুরিত হইল,

অকস্মাৎ-জলদসঙ্কিত-গগনমণ্ডলবৎ প্রভার মুখমণ্ডল গম্ভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল! প্রভাকে সুর করিয়া কাঁদিবার সময় না দিয়া সিদ্ধি বলিলেন, "অধীর হইও না ভগিনী; তোমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর কালপূর্ণ হইয়াছিল, তাই তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। আজ আমি তোমাকে আমার পরিচয় বলিব। শোন আমি কে!"

প্রভা হৃদয়াবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিল না। বাষ্পাবরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "মা গিয়াছেন, তাঁহার সকল জ্বালা জুড়াইয়াছে। কিন্তু আমি তাঁহার মরণকালে তাঁহাকে একবিন্দু জলও দিতে পারিলাম না! আমায় তিনি কত ভালবাসিতেন! আমার জন্য কত কষ্টে তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়াছিল! ওঃ! কি অভিশাপে এমন ঘটিল! পুত্রমুখ দেখিয়া মরিতে পারিয়াছেন ত?"

সিদ্ধি বলিলেন, "শোকের কোনও কারণ নাই। শোন, আমার পরিচয় শোন।" সিদ্ধি কি যেন এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় দৃষ্টিতে প্রভার প্রতি চাহিলেন: সে মুখমণ্ডল ও নয়নের জ্যোতিঃ দেখিয়া প্রভা যেন পূর্ব্বমুহূর্ত্ত ভুলিয়া গেল। নিস্তব্ধভাবে সিদ্ধির মুখপানে চাহিয়া রহিল। সিদ্ধি বলিতে লাগিলেন;—

"কোথায় আমার স্বদেশ তাহা আমি জানি না। পিতা মুর্শিদাবাদে নবাবসরকারে চাকরী করিতেন, আমি তাঁহারই সঙ্গে থাকিতাম; আমার স্মৃতিশক্তি জন্মিবার পূর্ব্বেই জননী স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং মায়ের আদর কি তাহা জানি না। পিতার আমি একমাত্র সন্তান, তাঁহার সংসারবাসের একমাত্র অবলম্বন, সুতরাং পিতৃস্নেহ অপরিমিতরূপে পাইতাম।

পিতার ঐকান্তিক যত্নে রাজদুহিতার ন্যায় প্রতিপালিত হইয়া আমি জীবনের দশম বর্ষ অতিক্রান্ত করিলাম। পিতা আমার

লেখাপড়া শিক্ষার জন্য একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া দিলেন, একজন ওস্তাদ আমাকে গান বাজনাও শিক্ষা দিতেন। আমার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া স্বয়ং নবাব-পুত্র আমাকে তাঁহার অন্তঃ-পুর-শোভিনী করিবার মানস করিয়াছিলেন। পিতা মুসলমানের বেতনভোগী হইলেও, মুসলমান-নবাবের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিতে রাজি হইলেন না। জাতিনাশের ভয়ে তিনি আমাকে লইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্বদেশ কখনও দেখি নাই, স্বদেশ কেমন তাহাও জানি না, আজ পিতার সঙ্গে স্বদেশ দেখিতে যাইতেছি ভাবিয়া প্রাণে বড় আনন্দ হইল। শরতের প্রথমে পিতার সঙ্গে নৌকারোহণ করিয়া ভাগীরথী বাহিয়া চলি-লাম। শরতের পূর্ণায়তন-নদীবক্ষে মৃদুতরঙ্গান্দোলিত তরণীর উপরে পিতার কোলে বসিয়া চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক শোভায় সেই শৈশব-হৃদয় যেরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, স্মৃতির কোণে এখনও তাহা অস্পষ্ট প্রভাসিত হয়।

এই বনাশ্রমের অনতিদূরে আমাদের নৌকা যখন পৌঁছিল, তখন আকাশে মেঘ দেখা দিল। পিতা সভয়ে বলিলেন, "মাঝি! নৌকা কূলে ভিড়াও।" নাবিকগণ নৌকা কূলের কাছে লইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু দেখিতে দেখিতে প্রবলবেগে বাতাস উঠিল। অনেক চেষ্টা করিয়া নাবিকগণ হতাশ হইল। পিতা আমায় বক্ষে লইয়া ভগবানকে ডাকিলেন; তিনি তখন শারীরিক বড় দুর্ব্বল, অনেক দিন হইতে পীড়া ভোগ করিতেছিলেন। আমাকে লইয়া সে উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া কূলে যাওয়া অসম্ভব! তবু তিনি আমাকে বুকে লইয়া নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। সেই সময়ে একজন যুবক নদীতীরে দাঁড়াইয়া ঝটিকা-বিক্ষোভিত

তরঙ্গিণীর বিকট তরঙ্গ-ভঙ্গিমা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দেখিলাম, তিনিও সেই ভীষণ তরঙ্গ মধ্যে ঝাপ দিলেন।"

সিদ্ধির কণ্ঠ যেন কিসে চাপিয়া ধরিল। বর্ষণোন্মুখ মেঘখণ্ডের ন্যায় নেত্রযুগল ভারাক্রান্ত হইল। অপ্সরোগীতি-বিমুগ্ধবৎ প্রভা সিদ্ধির আখ্যায়িকা-বর্ণনে শোক তাপ ভুলিয়া গিয়াছে। যে মুখে, যে স্বরে এ কাহিনী বর্ণিত হইতেছিল, তাহাতে শোকদুঃখ থাকিতে পারে না। প্রভা সাগ্রহে বলিল, "তারপর ?"

চক্ষু মুছিয়া সিদ্ধি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "তারপর অনেক ক্ষণের কথা আমি জানি না। যখন আমার চৈতন্য হইল, তখন দেখিলাম, দীপালোক-সমুজ্জ্বল এই গৃহে আমি কোমল শয্যায় শায়িত, একজন গন্ধর্ব্ব পুরুষ আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আমার শুশ্রূষা করিতেছেন। চৈতন্যসঞ্চার মাত্রই আমি বাবার নাম করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। করুণার অজস্র ধারাবর্ষণ করিয়া, যিনি আমার কাছে বসিয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন, "বালিকে ! কোনও ভয় নাই। আমি তোমায় তোমার পিতা অপেক্ষা কম ভালবাসিব না।" তাঁহার মুখ দেখিয়া তাঁহার কথাটী শুনিয়া আমার প্রাণে যেন বড় সাহস হইল। আমি বলিলাম, "আমার পিতা কোথায় ?"

"তখন মহাপুরুষ পিতার মত আদর করিয়া আমায় কোলে তুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন, "তুমি একটু সুস্থ হও, পরে তোমার পিতাকে দেখাইব।" তিনি আদর করিয়া আমায় দুগ্ধ ও কতকগুলি সুমিষ্ট ফল খাইতে দিলেন। পানাহার করিয়া আমি বেশ সুস্থ হইলাম। তারপর তিনি আমায় কোলে লইয়া নিম্নে আসিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলাম একখানি শয্যার উপর

আমার পিতার মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিবামাত্র আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। সেই মহাত্মা আমায় অনেক সান্ত্বনা করিলেন, স্নেহময় মিষ্ট কথায় অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু দশম বর্ষীয়া বালিকাকে পিতৃশোক ভুলান সহজ নয়। বিশেষ পিতা ভিন্ন আমি যে আর কাহাকেও জানি না।

"মহাত্মা তাঁহার অনুচরগণকে ডাকিয়া আমার পিতার যথাবিধি সৎকার করিলেন। আমি কত কাঁদিতে লাগিলাম, সেই মহাপুরুষ আমায় কতরূপে সান্ত্বনা করিলেন। আমাকে কোলে লইয়া বনের শোভা দেখাইলেন, কতরকম ফল ফুল দেখাইলেন, নানাবিধ সুরস আহার্য্য আনিয়া দিলেন, কতরকম খেলার সামগ্রী দিলেন। তাঁহার যত্ন ও ভালবাসায় আমার বালিকাপ্রাণ অনেক মুগ্ধ হইল, পিতৃশোক কতক পরিমাণে প্রশমিত হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমরা দুজনেই ডুবিয়াছিলাম, আমায় বাঁচাইলেন, আমার পিতাকে বাঁচাইলেন না কেন? মহাত্মা বলিলেন, "তোমাদের দুইজনকে বাঁচাইতে আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমাকে যখন ধরিলাম, তখন তোমার পিতা তোমাকে ছাড়িয়া জলে ডুবিলেন। আমি অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে পাইলাম না, পরে অনেক অনুসন্ধান করিয়া আমার অনুচরেরা তাঁহার মৃতদেহ পাইয়াছে।" আমি বুঝিলাম, আমার জীবনরক্ষার জন্য পিতা নিজের জীবন ত্যাগ করিয়াছেন; দুইজনকে উদ্ধার করিতে গিয়া পাছে মহাত্মা কাহাকেও উদ্ধার করিতে না পারেন, এই ভয়ে পিতা এরূপ করিয়াছেন। শোক তাহাতে আরও বাড়িল। কিন্তু আমার জীবনরক্ষকের স্নেহসমাদরে আমি শোক করিবার তত অবসর পাইলাম না।

"দুই দিন পরে মহাপুরুষ আমায় বলিলেন, "তোমার আত্মীয় স্বজন কে আছেন ? কাহার কাছে তুমি এখন যাইবে ?"

"আমিও ভাবিতেছিলাম, আমি কোথায় যাইব ? সংসারে পিতা ভিন্ন আমিত আর কাহাকেও জানি না। সংসার তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলাম,—কোথায় যাইব ? মহাত্মাকে বলিলাম, "আমি কোথায় যাইব ? আমার ত আর কেহ নাই, যদি বাবার কাছে যাইতে পারি, তবে যাই।" বলিয়া কতকটা কাঁদিয়া বুকের ভার নামাইলাম। মহাপুরুষ বলিলেন, "তবে তুমি এইখানেই থাকিবে ? আমি তোমায় পিতার ন্যায় যত্ন করিব।"

"ভাবিলাম ক্ষতি কি ? বাবাকে ত আর পাইব না, তখন ইঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া কোথায় যাইব ? আর কি কেহ আমায় এমন যত্ন করিতে পারিবে ? আমি বলিলাম, "থাকিব।"

সেই হইতে আমি এই বনাশ্রমবাসিনী হইলাম। পিতা আমার কমলা নাম রাখিয়াছিলেন, আমার আশ্রয়দাতা সে নাম বদলাইয়া আমার নাম রাখিলেন বনলতা। তাঁহার মুখে শুনিলাম তাঁহার নাম বীরেন্দ্র, কিন্তু এখানে যে সমস্ত লোক আসিত, তাহারা সকলেই তাঁহাকে মহারাজ বলিয়া ডাকিত। আমিও তাঁহাকে মহারাজ বলিয়া ডাকিতাম। বাস্তবিক তিনি যে এই বনপ্রদেশের রাজা, আমি সেই দশ বৎসর বয়সেই তাহা বুঝিয়াছিলাম।

"অল্পদিন মধ্যেই মহারাজের অপরিমিত স্নেহে আমি অতীত জীবন বিস্মৃত হইলাম। অতীত স্মৃতি ডাকিয়া দুঃখ করিবার অবসর আমি পাইতাম না। আমি যাঁহার আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিলান, তিনি শিশু হইয়া আমার সঙ্গে খেলা করিতেন, মাতা হইয়া আমার পালন করিতেন, পিতা হইয়া আদর করিতেন,

গুরু হইয়া শিক্ষা দিতেন। তিনি আমায় এক প্রস্ত রত্নকাঞ্চনের অলঙ্কার দিলেন, আমার পরিচর্য্যার্থ একজন পরিচারিকা রাখিয়া দিলেন।”

“ক্রমশঃ আমার বিদ্যাশিক্ষার জন্য মহারাজ অধিকতর যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া আমাকে নিয়মিত লেখাপড়া, সঙ্গীতবিদ্যা গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি বিশেষ যত্নে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আমায় কিছু অস্ত্রচালনাও শিক্ষা দিতেন। যখন অবসর পাইতাম তখন মহারাজের সঙ্গে প্রফুল্ল-কুসুমসুরভিত বনপ্রদেশে ভ্রমণ করিয়া, জাহ্নবীশীকরবাহী সুশীতল-সমীর-সেবনে অতুল আনন্দ ভোগ করিতাম, বনবিহগের কলগীতি শুনিয়া তাহাদের অনুকরণে শব্দ করিতাম, রাশি রাশি ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতাম, পুষ্পমালায় মহারাজকে সাজাইয়া দিতাম, নিজের সর্ব্বাঙ্গ ফুলভূষণে সাজাইতাম। এই বনরাজ্যের স্বভাব শোভায় আমি এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, আমি যে কখন জনকোলাহলময় নগরে বাস করিয়াছি, তাহা আমার মনে আসিত না।”

“এইরূপে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। আমার ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইল। সরল শৈশব পথ অতিক্রান্ত করিয়া যৌবনের কুটিল সোপানে আসিয়া পঁহুছিলাম। আমার সাদা সরল মনে চিন্তা ও লজ্জার রেখা পড়িল। ক্রমে আমার বোধ হইল, মহারাজ পুরুষ, আমি স্ত্রীলোক। এখন আর তাঁহার সঙ্গে তেমন নিঃসঙ্কোচে খেলিতে পারি না, তাঁহার গলায় পুষ্পমালা পরাইয়া আর তেমন উচ্চহাস্য হাসিতে পারি না। তাঁহার প্রতি যখন তখন তেমন স্থিরচক্ষে চাহিতে পারি না। মাঝে মাঝে মনে হইত, এ বনরাজ্যে রাজা আছেন, রাণী নাই; মহারাজের রাণী হইবেন এমন

ভাগ্যবতী কি কেহ নাই? মহারাজ আমার আশ্রয়দাতা, পালনকর্ত্তা, শিক্ষাদাতা;—তিনি এ অনাথা বালিকার পিতা, মাতা, ভ্রাতা গুরু সকলই। কিন্তু সেই চতুর্দ্দশবর্ষীয় দুরাশাময় হৃদয় ইহাতেও সন্তুষ্ট নয়, মহারাজকে আরও আপন করিতে তাহার প্রবল বাসনা জন্মিল। আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় তাঁহারই পক্ষপাতী হইয়া পড়িল, আমার সমস্ত জগৎ তাঁহাতেই বিলীন হইয়া গেল।"

"এখন আর আমি তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিয়া, তাঁহার যত্ন আদর পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতাম না! তাঁহার সেবা করিতে বড় ইচ্ছা করিত, তাঁহার সুখ সুবিধার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিতে পারিলেও যেন শান্তি পাইতাম। মহারাজ বনভ্রমণে যাইতেন; আমিও তাঁহার সঙ্গে যাইতাম পথের উপর কণ্টক বা কোনও বিপদের কারণ দেখিলে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতাম, সূর্য্যতাপে তাপিত হইলে পল্লবব্যজনে তাঁহাকে ব্যজন করিতাম, ইচ্ছা হইত অঞ্চল দিয়া তাঁহার ঘর্ম্মাক্তমুখ মুছাইয়া দিই, কিন্তু সাহস হইত না। মহারাজ বনে গিয়া রাশি রাশি ফুল দেখিয়া ফুলের গান গাইতেন, আমি গন্ধর্ব্বগীতিবিৎ সে মধুরস্বরে আত্মহারা হইয়া যাইতাম।"

সিদ্ধির মুখমণ্ডল ক্রমশঃ গাঢ় রক্তিমাভায় রঞ্জিত হইতেছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "ইহার পর আমার পরীক্ষা আসিল। আমি যখন পঞ্চদশ বৎসর বয়সে পড়িলাম, তখন মহারাজ আমার সহিত আর তেমন মিষ্টভাবে কথা বলিতেন না। কাজের কথা ব্যতীত আদর করিয়া একটী কথাও আমায় জিজ্ঞাসা করিতেন না। আমায় আশ্রমের বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন, অঙ্গের সমস্ত আভরণাদি খুলিয়া লইলেন। আমার বিবিধ

সুখাদ্য আহারের পরিবর্ত্তে দৈনিক একমাত্র নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সুচিত্র পট্টবস্ত্রের পরিবর্ত্তে গৈরিক বসন পরিতে আদেশ করিলেন, সুকোমল শয্যার পরিবর্ত্তে কঠিন চর্ম্মাসন নির্দ্ধারিত করিলেন। প্রথমে দুই এক দিন বড় কষ্ট হইতে লাগিল, কিন্তু ভাবিলাম মহারাজ যাহা করিলেন অবশ্য আমার তাহাতে মঙ্গল আছে। আমি আনন্দের সঙ্গে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে লাগিলাম। এ সময়ে সর্ব্বদাই আমাকে কার্য্যে নিরত থাকিতে হইত। অধিকাংশ সময়েই মহারাজ আমাকে শাস্ত্রশিক্ষা দিতেন। একবৎসর মধ্যে আমি ভগবদ্গীতার শ্লোকগুলি মুখস্থ করিলাম, গুরুদেব হৃদয়গ্রাহীব্যাখ্যা করিয়া সেগুলি আমাকে অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতেন। দ্বিতীয় বৎসর শাস্ত্রশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ আমায় শস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষাগুণে তরবারিখেলা, বন্দুক চালনা প্রভৃতি কিছু কিছু শস্ত্রবিদ্যা আমি শিখিলাম। এসময়ে আমাদের দাস দাসী কেহ ছিল না। আমি নিজে কাষ্ঠাহরণ পর্য্যন্ত করিয়া মহারাজের খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিতাম, নিজের হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়া লইতাম। মহারাজের সেবা করিয়া আমি যে আনন্দ পাইতাম, সুধার আস্বাদনে সে আনন্দ হয় না।

দুই বৎসর পরে মহারাজ কোথায় চলিয়া গেলেন; আমাকে কিছুমাত্রও বলিয়া গেলেন না। আমি এই গৃহে একাকিনী যুথহারা কুরঙ্গিনীর ন্যায় অতি কষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে তাঁহার দুই একজন অনুচর আসিয়া আমার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী দিয়া যাইত, আমি তাহাদিগকে প্রভুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা "বলিতে পারি না" বলিয়া চলিয়া

যাইত। আমি কত ভাবিতাম, কিন্তু নিশ্চয় জানিতাম যে, যিনি আমায় এত ভাল বাসিতেন তিনি কিছুতেই চিরতরে আমায় ত্যাগ করিবেন না। মাঝে মাঝে তাঁহার অমঙ্গলাশঙ্কা হইত; আবার মনে হইত তিনি দেবপুরুষ, মহাবীর, তাঁহার অমঙ্গল হইতে পারে না। গুরুদেব আমায় কতকগুলি পুরাণ ইতিহাস ও ধর্ম্মগ্রন্থ দিয়া গিয়াছিলেন; অধিকাংশ সময় আমি তাহাতেই মনোনিবেশ করিয়া থাকিতাম।"

"একবৎসর পরে মহারাজ কোথা হইতে আসিয়া সহসা উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই অত্যন্ত আদরে আমার হাত ধরিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তিন বৎসর হইল, প্রভুর কাছে আমি এমন আদর পাই নাই। আমি আনন্দভরে কাঁদিয়া ফেলিলাম, প্রভুও কাঁদিলেন।"

সিদ্ধির গণ্ডযুগল বাহিয়া দুইটী ধারা গড়াইয়া পড়িল, শুনিতে শুনিতে প্রভারও চক্ষু ভার ভার হইয়া আসিতেছিল। সে কিন্তু নিজের শোক দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছিল।

"এ বৎসর মহারাজ পুনর্ব্বার আমাকে বস্ত্রালঙ্কার পরিবার এবং যথেচ্ছ শয়ন ভোজনের অনুমতি করিলেন। কিন্তু তখন অশনবসনের প্রতি আমার ততটা মনোযোগ ছিল না। মহারাজ আমায় যথেচ্ছ ভ্রমণের অনুমতি করিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে আবার বনভ্রমণ করিতে যাইতে লাগিলাম। পূর্ব্বে মহারাজকে আপন করিবার জন্য প্রাণে যে প্রবল বাসনা ছিল, তাহা আর এখন নাই; এখন যেন মহারাজ আপনই হইয়াছেন। তখন প্রভু কুমার, শকুন্তলা, কাদম্বরী, নৈষধ প্রভৃতি নানাবিধ সুমিষ্ট কাব্যগ্রন্থ আমায় পাঠ করাইতে লাগিলেন।"

ক্রমে আমার জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইল। এক দিবস গ্রীষ্মাপরাহ্ণে প্রভুর সহিত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আমি নিবিড় বনপ্রদেশে শিকার করিতে গিয়াছিলাম। তথায় প্রভু এক ভীষণাকার ব্যাঘ্রের অনুসরণ করিলেন। এমন সময়ে এক প্রকাণ্ড-বিষধর-সর্প-তাড়িত একটী ভেক প্রাণভয়ে দৌড়িয়া আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। গুরুদেবের কাছে শিক্ষা পাইয়াছি, "সবল হইতে দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য প্রাণবিসর্জ্জনও কর্ত্তব্য।" দুর্ব্বল ভেকের জীবনরক্ষার্থ আমি সেই রোষপ্রদীপ্ত শিকারচ্যুত বিষধরের ভীষণ ফণায় অসির আঘাত করিলাম। কিন্তু অস্ত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, সর্প ভেককে পরিত্যাগ করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে আমার উপর আক্রমণ করিল। আমি যতবার তাহার উপর অস্ত্রলক্ষ্য করিলাম, ততবারই সে আমার লক্ষ্য মাড়াইয়া আমাকে দংশন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অস্ত্রবিদ্যায় তখনও আমি ততদূর নিপুণ হইতে পারি নাই। সর্প আমায় দংশন করিবে, এমন সময়ে ফণাদেশে বাণবিদ্ধ হইয়া নিরস্ত হইল। আমি চাহিয়া দেখিলাম, ধনুর্ব্বাণহস্তে মহারাজ হাসিতে হাসিতে আমার দিকে আসিতেছেন। অতি মধুর মুখভঙ্গিমা করিয়া প্রভু আমায় বলিলেন, "বনবালে! আপনার শক্তি না বুঝিয়া এ কাল সর্পের মুখে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলে কেন?"

আমি বলিলাম, "আততায়ী সর্পের মুখ হইতে দুর্ব্বল ভেককে রক্ষা করিবার জন্য।"

প্রভু অন্য বাক্যমাত্র না বলিয়া অতি ব্যস্তে আমায় আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার আনন্দোজ্জ্বল নয়নযুগল হইতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। সে মুখের মাধুরী দেখিয়া

আমিও অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলাম না। অনন্ত শোভাসৌন্দর্য্যময় ব্রহ্মাণ্ডে তিনি বহুদিন এ নয়নে সুন্দরতমরূপে প্রভাসিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আজ তাঁহাকে যেমন সুন্দর দেখিলাম, তেমন সুন্দর আর কোনও দিন দেখি নাই। এমন পুলকিতচিত্তে আর কোনও দিন সে দিব্যারামস্থল বক্ষঃস্থলের স্পর্শসুখ অনুভব করিতে পাই নাই। পাষাণের শৈত্য, কুসুমের কোমলতা, অমৃতের মধুরতা, বসন্তের মনোহারিতা জগতের সর্ব্বরমণীয়তা একত্রে মিশ্রিত হইয়া সে বক্ষে যেন তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। সে মলয়ান্দোলিত মধুময় হৃদয়জলধিতে ডুবিয়া এ ক্ষুদ্রচন্দ্রিকা প্রতিবিম্ব যে কি আনন্দভোগ করিয়াছিল, তাহা কেমন করিয়া বলিব?”

সিদ্ধির কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিল; হৃদয়ের বদ্ধপ্রস্রবণের প্রবল উচ্ছ্বাসে তাঁহার বাক্‌শক্তি, বোধশক্তি পর্য্যন্তও বিকল হইয়া পড়িল। প্রভারও চক্ষে ধারা বহিতেছিল, সে হৃদয়ের আবেগে ক্রোড়স্থ শিশুপুত্রটীকে আরও কোলে টানিয়া বলিল, “আহা! তুমিই যথার্থ প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছ! এ অভাগিনীও একদিন এ সুখের অধিকারিণী ছিল। বল, তারপর?”

চক্ষু মুছিয়া সিদ্ধি বলিতে লাগিলেন “অনেকক্ষণ ছল ছল নেত্রে নীরবে আমার মুখপানে চাহিয়া প্রাণেশ্বর বলিলেন, “বনবালে! আর কেন এ দুরাবরোধ্য হৃদয়াবেগ অবরুদ্ধ করিয়া রাখি? আমার বাসনা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে। এতদিনে আমি সিদ্ধ হইলাম, তুমিই আমার সিদ্ধি! তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া, সংসারের কর্ত্তব্যসাধনপূর্ব্বক আমি পরমানন্দে সিদ্ধধামে যাত্রা করিব।” আনন্দে তাঁহার কণ্ঠস্বর কম্পিত ও জড়িত হইয়া

আসিতেছিল। আমায় বক্ষে ধরিয়া গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 'সিদ্ধি! আর তোমাকে বনবালা বলিয়া ডাকিব না; তুমি আমার সিদ্ধি, আজ হইতে তোমার নাম আমি সিদ্ধি রাখিলাম। শোন সিদ্ধি, কোনও বিখ্যাত রাজবংশে আমার জন্ম হইয়াছিল। নগরের লোকজনের বিসদৃশ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, আমার নিতান্ত শৈশব অবস্থায় পিতা আমাকে লইয়া এই অরণ্যপ্রদেশে আশ্রম স্থাপন করেন। অষ্টাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার শিক্ষায় আমি শিখিয়াছিলাম, সংসারে বিষয় বিভব লইয়া সুখ নাই, স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজনে সুখ নাই। তাহা হইতে অমিশ্রিত থাকাই সুখ। পিতা আমায় নানাশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে আমি শিখিলাম পরোপকার পরমধর্ম্ম; আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া পরের সুখ বর্দ্ধন করাই মনুষ্যত্ব। পিতার কাল হইলে আমি আর লোকালয়ে যাই নাই। এই বনরাজ্যে আমি রাজ্য স্থাপন করিলাম। এখানে অনেক দস্যুর বাসস্থান ছিল। আমি তাহাদিগের সঙ্গে মিশিয়া নানারূপ কৌশলে, ধনরত্ন দান করিয়া, সদুপদেশে তাহাদিগকে নিজ ধর্ম্মমতে আনিলাম। পিতা আমাকে অনেক ধনরত্ন দিয়া গিয়াছিলেন, আমি তাহা দিয়াই প্রথমে দস্যুগণকে বাধ্য করিয়াছিলাম। আমার অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়া তাহারা আমাকে গুরু বলিত। এক্ষণে তাহারাই আমার প্রজা বা অনুচর। এই সমস্ত অনুচরদলে পুষ্ট হইয়া আমি নানাস্থানের দুষ্ট লোকদিগকে বশীভূত করিয়া সাধু করিবার চেষ্টা করিতাম, দুর্ব্বলকে সবলের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতাম। ইহার পর যেদিন তোমাকে পাইলাম, সেই দিন হইতে আমার মানসিক গতি পরিবর্ত্তিত হইল। পিতা বলিয়াছিলেন,

স্ত্রীপুত্রে সুখ নাই, সে কথায় যেন অবিশ্বাস হইতে লাগিল। ভাবিলাম উপযুক্ত সহচরী পাইলে মানুষ কর্ত্তব্যসাধনে অধিকতর সুবিধা পাইতে পারে। তোমা হইতে আমার মনোমত সংসার-সঙ্গিনী গড়িয়া লইবার সঙ্কল্প করিলাম। আট বৎসরের চেষ্টায় আজ আমি কৃতকার্য্য হইলাম। এ বনরাজ্যের রাণী হইতে কি তোমার সাধ হয় না?"

"সেই গভীর অরণ্যে শান্তিময় তরুলতা-সমাজে বিহঙ্গের কলনাদে, মধুর মলয়হিল্লোলে, সুস্নিগ্ধ-কুসুম-সৌরভে শুভ মাহেন্দ্র-ক্ষণে আমি বনরাজের গলে মালা পরাইলাম! তারপর এই চারি বৎসর কাটিয়া গেল।"

"এ চারি বৎসর যে আমি কি আনন্দে ছিলাম, তাহা বুঝাই-বার শক্তি আমার নাই। এক কথায় বলি, আমি মর্ত্ত্যে ছিলাম না, স্বর্গে কল্পতরুর পাদদেশে বসিয়া চতুর্ব্বর্গ ফলের আস্বাদন করিয়াছি। ভোগ, বিলাস, কামনা, সুখ, সম্পদ কোন বিষয়েই প্রাণ অতৃপ্ত ছিল না। প্রাণেশ্বর আমায় সিদ্ধি বলিয়া ডাকি-তেন; সিদ্ধি সাধনের ফল, তাই আমি তাঁহাকে সাধন বলিয়া ডাকিতাম।"

তাহার পর প্রভাকে উদ্ধার করিতে গিয়া যাহা যাহা ঘটিয়া-ছিল, সিদ্ধি সংক্ষেপে সকলই বলিলেন। প্রভা এতক্ষণে কৌতূহলাবিষ্টমনে উপন্যাস-কাহিনীর ন্যায় সিদ্ধির আত্মকাহিনী শ্রবণ করিতেছিল। কাহিনীর শোচনীয় উপসংহারে সে চমকিয়া উঠিল। ভীত, বিস্মিত, শোকাকুল-হৃদয়ে প্রভা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "সেকি দেবি! আমা হ'তেই তোমার এই সর্ব্বনাশ! আমার এই পাপজীবনের জন্য সেই মাহাত্মার জীবন ত্যাগ! ধিক্ আমার

জীবনে! কেমন করিয়া এ পাপভার বহন করিব? এ পাপদেহের রক্তে আজি তোমার পদ ধৌত করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

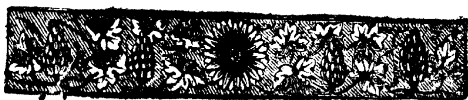
অনিবার্য্য মনের আবেগে প্রভা উঠিয়া দাঁড়াইল। সিদ্ধি তাহাকে, আলিঙ্গন করিয়া অতি স্নিগ্ধমধুরকণ্ঠে বলিলেন, "সখি! ভগিনি! ছি, এত অধীর হইতে কি হয়? চল গঙ্গাতীরে গিয়া আমরা বাতাসে জলের খেলা দেখিব। সেখানে তোমার শ্বাশুড়ীর মরণের বিশেষ বৃত্তান্ত বলিব।"

প্রভার হাত ধরিয়া, ভবচন্দ্রকে কোলে লইয়া সিদ্ধি বাহিরে গেলেন।



দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড।



তৃতীয় খণ্ড।



প্রথম পরিচ্ছেদ



যাঁহার নাম লইয়া আমরা এই আখ্যায়িকা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাঁহাকে ভুলিয়া, দেববালা সিদ্ধির চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া দীর্ঘকাল কাটাইলাম। এইক্ষণ চারুচন্দ্রের সংবাদ লইব। যুবতী বিনোদবালার রূপ-বহ্নিতে চারুচন্দ্র-পতঙ্গকে পড়িতে দেখিয়াছিলাম, তাহাতে ভস্মসাৎ হইল, কি তাপ অনুভূত করিয়া দগ্ধপক্ষে উড়িয়া গেল তাহা ত দেখিলাম না।

জীবন-সংগ্রামে বাসনার প্রতিকূলে দাঁড়াইতে দুর্ব্বল চারুচন্দ্র সমর্থ হইলেন না। যে দিন সংবাদ পাইলেন প্রভাবতী নিরুদ্দিষ্টা, সেইদিন তিনি বিনোদবালার যৌবন-বিনিময়ে আত্মবিক্রয় করিলেন। অভাগিনী প্রভাবতী ব্যাভিচারিণী কলঙ্কিনী বলিয়া চারুচন্দ্রের হৃদয় হইতে দূরে অপসারিত হইল। অধিকন্তু মূঢ় চারুচন্দ্র হৃদয় হইতে দুশ্চিন্তাকে দূরীভূত করিবার জন্য সেদিন

যে সর্ব্বনাশিনী মদিরা-রাক্ষসীর আশ্রয় লইয়াছিলেন, এক্ষণে সে তাঁহার সদাসহচরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নিন্দাবাদ বায়ুর সঙ্গে ছুটে। চারুচন্দ্রের পাপ দুদিনের জন্যও গুপ্ত রহিল না। তাঁহার পরমবন্ধু রামচরণ ঘটনার পূর্ব্বেই এ বিষয় অল্প অল্প প্রচারিত করিয়া আসিতেছিলেন। ক্রমে কথা বাটীর বাবুদিগের কাণে উঠিল। চারুচন্দ্রও জানিতে পারিলেন, তাঁহার দুষ্কৃতি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। বুঝিলেন এখানে থাকিলে অচিরাৎই তাঁহাকে অত্যন্ত অপদস্থ এমন কি জীবনান্ত পর্য্যন্ত হইতে হইবে! সুতরাং চারুচন্দ্র প্রথম সুযোগেই সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। যাহার জন্য যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাকে ত্যাগ করিলেন না। বিনোদবালাকে সঙ্গে লইয়া চারুচন্দ্র পাটনা অঞ্চলে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

কলিকাতায় থাকিতে পাটনার এক কুঠিয়াল সাহেবের সঙ্গে চারুচন্দ্রের পরিচয় ছিল। পাটনায় গিয়া অল্প চেষ্টায় তিনি উক্ত সাহেবের কুঠীতে বিশেষ লাভজনক একটী চাকরী পাইলেন। ভোগবিলাসে, রমণী-কাঞ্চনে, মদিরা-বিকারে চারুচন্দ্রের দিন স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল।

চারুচন্দ্র সাহেবের কর্ম্মচারী, একজন ক্ষুদ্র নবাব। তাঁহার সুরঞ্জিত দ্বিতল গৃহ। বহুমূল্য গৃহসামগ্রী, কারুকার্য্যখচিত নানাবিধ শয্যাস্তরণ। সুবাসিত গন্ধদীপে তাঁহার বাসস্থান আলোকিত। নানাবিধ স্নিগ্ধ-গন্ধদ্রব্যে তাঁহার গৃহ প্রমোদিত; সর্ব্বোপরি সর্ব্বাভরণ-বিভূষিতা সুন্দরী বিনোদবালার কলকণ্ঠে ও বীণা পাখোয়াজ হার্ম্মোনিয়াম প্রভৃতির সুস্বরে সে গৃহ সতত প্রতিধ্বনিত। মদিরাবিকৃত চারুচন্দ্রের হৃদয় হইতে জগতের সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে;

একমাত্র বিনোদবালার রূপরাশি সে নরকে একাধিপত্য করিয়া বসিয়াছে। জগতের সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র বিনোদবালার মনস্তুষ্টি সাধনই চারুচন্দ্র জীবনের সার ব্রত করিয়াছেন। কিন্তু কে কবে পারিয়াছে?—কামিনীর বিলাস-লালসা কে কবে পরিতৃপ্ত করিতে পারিয়াছে? হুতাশনে আহুতি দিয়া কে কবে তাহার আহুতি-ক্ষুধার লাঘব করিতে পারিয়াছে? কই, বিনোদবালার সন্তুষ্ট-মূর্ত্তিত কখনও দেখিলাম না।

সুশিক্ষিত সুপুরুষের সঙ্গে বিনোদবালার বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু দোষ ছিল, তিনি বড় জমিদার বা লক্ষপতি নন; বহুমূল্য রত্নালঙ্কার বা অপরিমিত বিলাতী-বিলাস-সামগ্রী সংগ্রহ করিবার তাঁহার শক্তি ছিল না। বিনোদবালা এমন দরিদ্রের প্রণয়ে সন্তুষ্ট হইল না; ধনবান্ মাতুল-গৃহে সাদরে আশ্রয় পাইল। ভাবিয়াছিল স্বামী যখন দরিদ্র তখন অবশ্যই তাহাকে তোষামোদ করিয়া ভালবাসিবেন। কিন্তু স্বামী তাহা করিলেন না; বিরক্ত হইয়া দ্বিতীয় দারগ্রহণ করিলেন। তখন বিনোদবালার যৌবনতৃপ্তির প্রয়োজন হইল; চারুচন্দ্রকে গ্রাস করিল; কিন্তু আশাত পূর্ণ হয় না। চারুচন্দ্র তাহার বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন। বিনোদবালার স্বর্ণাভরণে বিতৃষ্ণা জন্মিল, মণিমুক্তাজড়িত হীরক ভূষণে সাধ হইল; চারুচন্দ্র যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া দিলেন। কিন্তু প্রেয়সীর বাসনার শেষ হইল না, বিনোদবালা ভাবিল, মণিমুক্তা হীরা অপেক্ষা আরও সুন্দর সামগ্রী কি জগতে নাই?

চারুচন্দ্র স্বীয় দেবকান্তি দেখাইয়া বিনোদবালাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু সুধু দর্শনে যে আকর্ষণ তাহা পুরাতন হইলে

শিথিল হইয়া যায়। নিত্য দেখিতে দেখিতে চারুচন্দ্রের রূপ বিনোদবালার চক্ষে পুরাতন হইয়া গিয়াছে। চারুচন্দ্রের প্রণয়!— তাহা অগাধ অতুলনীয় ছিল; কিন্তু কামনা-কিঙ্করী বিনোদবালার হৃদয়ে সে প্রণয় অনুভব করিবার শক্তি ছিল না। হায়, চারুচন্দ্র! অতি তুচ্ছ কাচখণ্ডের প্রলোভনে সর্ব্বস্বান্ত হইলে!

চারুচন্দ্রের আয় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক, কিন্তু খরচে কুলায় না। কয়েক দিন ধরিয়া বিনোদবালা একগাছা হীরক-কাঞ্চির সাধ করিয়াছে। অর্থাভাবে চারুচন্দ্র তাহা দিতে পারিতেছেন না। একদিন তাহাই ভাবিতে ভাবিতে কার্য্যস্থান হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই দেখিলেন, প্রণয়িনী নিরাভরণা, মলিন বসনে ধূল্যবলুণ্ঠিতা। তিনি আদর করিয়া ডাকিলেন, "বিনোদ!"

কোনও উত্তর পাইলেন না। নিশ্বাসগুলি অধিকতর বেগে ঘন ঘন বহিতে লাগিল। চারুচন্দ্র অতি কাতরে, অতি আদরে বিনোদবালার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "বিনোদ! বিনোদবালা! প্রাণেশ্বরী আমার! এত মান কি জন্য ?"

বিরক্তিসূচক তীব্রভাবে চারুচন্দ্রের হাতখানি সরাইয়া বিনোদবালা শয্যা ছাড়িয়া মাটীতে গিয়া বসিয়া পড়িল।

চারুচন্দ্র আবার বলিলেন, "বিনোদ! আমি কি অপরাধ করিয়াছি ? তোমার হীরক কাঞ্চি অতি শীঘ্রই প্রস্তুত করিয়া দিব; আজকাল কিছু টানাটানিতে আছি বলিয়াই পারিতেছি না।"

এবারও কোন উত্তর পাইলেন না; অল্প রোদনোচ্ছ্বাস শুনিতে পাইলেন মাত্র। নিবিড়-ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন প্রাবৃট-গগনবৎ চারুচন্দ্রের মুখমণ্ডল গম্ভীর কালিমামণ্ডিত হইল। তাঁহার একটী

বহুদিনের পুরাতনস্মৃতি মনে পড়িল। বহুদিন হইল, একদিন প্রভা বাল্যচাপল্যে কি একটু দোষ করিয়াছিল। চারুচন্দ্র তাহাতে তাহাকে অত্যধিক পরিমাণে তিরস্কার করিয়াছিলেন। প্রভা তাহাতে মান করিয়াছিল। চারুচন্দ্র তাহার মান ভাঙ্গিবার জন্য, কি উপায়ে তাহাকে সন্তুষ্ট করিবেন, কি বলিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিবেন তাহা ভাবিতেছিলেন, ইত্যবসরে প্রভা আপনিই আসিয়া তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। চারুচন্দ্র তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন, প্রভা সেই অশ্রুসিক্তবদনেই হাসিয়া ফেলিল। চারুচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মান ভাঙ্গিল?" প্রভা বলিল, "মান করায় এত যাতনা জানলে কি মান করি? যে মান করে, সে পাপিষ্ঠা।"

আজ অকস্মাৎ বহুদিনের এই কথাটী বহুদিন-শ্রুত বিস্মৃত-প্রায় গীতিধ্বনিবৎ চারুচন্দ্রের হৃদয়ে জাগিল। বহুদিন পরে অকস্মাৎ অভাগিনী প্রভাবতীর সরলবালিকামূর্ত্তিখানি চারুচন্দ্রের মানসাকাশে প্রতিবিম্বিত হইল। বহুদিন পরে অতীত-জীবনোদ্দেশ্যে চারুচন্দ্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ চারুচন্দ্রকে নীরবে বসিয়া ভাবিতে হইল;—আমি কি ছিলাম, কি হইয়াছি, কি হইব!

অল্পক্ষণ পরে ঐ ভাবনা অন্তর হইতে বিদূরিত করিয়া চারুচন্দ্র বলিলেন, "বিনোদ! আর দুঃখ দিও না; অপরাধ করিয়া থাকি, প্রকাশ্যে শাস্তি দাও।"

ফণিনী-গর্জ্জনে উত্তর হইল, "অত ব্যঙ্গ কেন? তোমার অপরাধে আমি শাস্তি দিতে কে? আমি আমার নিজ পাপের শাস্তি ভোগ কচ্ছি।"

চারু। কেন বিনোদ! তোমার এত আঁক্ষেপ কেন?

বিনোদ। আমার ন্যায় পোড়াকপালী যদি আক্ষেপ না করিবে তবে আক্ষেপ করিবে কে? আমি রাজার ঘরের মেয়ে, আমার কি অভাব ছিল? আমি কেন এ দাসীত্ব করিতে আসিলাম? যে সুখের আশায় সব ত্যাগ করিলাম, তাহারত এই হইল।

চারু। আশা কাহারও পূরে না বিনোদ! কিন্তু আজ কোন্ আশা পূরণের জন্য এত অনুযোগ?

বিনোদ। আমার আবার অনুযোগ কি? আমি এখন দাসী হ'য়ে পড়েছি, নইলে এক আধখানা গয়না গাটির জন্য আমায় এত লাঞ্ছিত হ'তে হয়?

চারু। তোমার হীরার কাঞ্চির জন্য এত আড়ম্বর? আর আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। কল্যই তোমার অঙ্গে হীরককাঞ্চি শোভা পাইবে। বল আর তোমার কোনও প্রার্থনা আছে কি না; তোমার বাসনা পূরণই আমার ব্রত। যথাসর্ব্বস্ব দিয়া তোমার কামনা চরিতার্থ করিব; দেখিব পুরুষে রমণীকে সন্তুষ্ট করিতে পারে কি না।

এক্ষণে অল্পে অল্পে বিনোদলালার মান ভাঙ্গিল। সে কুন্দদন্তে ঈষৎ হাসিয়া আস্তে আস্তে অনেকগুলি সাধ ব্যক্ত করিল। চারুচন্দ্র সকলই পূরণ করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন; কিন্তু আজ আর তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল না।

আজ হইতে চারুচন্দ্রের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। ক্রমে সকল বিষয়ে তাঁহার অবনতি হইতে লাগিল। আফিসের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত না বলিয়া প্রভুর কাছে প্রায়ই লাঞ্ছিত হইতেন। যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহাতে ব্যয় কুলা-

হত না, সুতরাং অন্যায্য উপায়ে আয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহাতে চারিদিকে অপযশ ঘোষিত হইতে লাগিল। মন সর্ব্বদা অশান্তিময় বলিয়া মদিরার আশ্রয়ে প্রকৃতজ্ঞান লুপ্ত করিয়া রাখিতেন। যে সময়টুকু প্রকৃতিস্থ থাকিতেন, তখন ভূতবর্ত্তমানের কঠিন সংঘর্ষণে অস্থির থাকিতেন।

কাজেই বিনোদবালার কাছে চারুচন্দ্র বিরক্তিভাজন হইয়া পড়িলেন। যে প্রফুল্লমূর্ত্তি, কোমল স্বভাবে চারুচন্দ্র বিনোদ-বালার মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আর নাই। ফল কথা, এক্ষণে উভয়েই উভয়ের নিকট রোগীর শয্যার ন্যায় কণ্টকময় অথচ অত্যাজ্য হইয়া পড়িলেন।





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কয়েকদিন হইল একজন পূর্ব্বদেশীয় গায়ক চারুচন্দ্রের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছেন। গায়কের অল্পবয়স, অতুলনীয়রূপ; তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর মানবকণ্ঠে দুর্লভ। তাঁহার বহুমূল্য সুচিক্কণ বেশভূষা, অপ্সরোমনোমুগ্ধকর অঙ্গসৌষ্ঠব, সর্ব্বোপরি তাঁহার প্রশান্ত-সরল-মুখচ্ছবি দৃষ্টিমাত্রই তাঁহার প্রতি সংসর্গলিপ্সা বলবতী হইয়া পড়ে। অল্পদিন মধ্যেই অতি প্রিয়-পরিচিত আত্মীয়জনের ন্যায় চারুচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার সদ্‌ভাব স্থাপিত হইয়াছে। গায়ক পরিচয় দিয়াছেন তাঁহার নাম সিদ্ধি-সাধন, পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার নিবাস; গান করিয়া রসিকজনের মনস্তুষ্টিই তাঁহার ব্যবসায়।

গায়ক প্রত্যহ একবার চারুচন্দ্রের বাড়ীতে আসিতেন। এ সময়ে চারুচন্দ্রের মন অত্যন্ত চিন্তাব্যাকুলিত; নবীনগায়কের মধুময় সঙ্গীতে তিনি অনেক সময়ে মন প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা পাইতেন। ক্রমে মদিরা ও এই গায়কের কণ্ঠস্বরেই চারুচন্দ্র অবকাশকালের অধিকাংশ মগ্ন থাকিতেন; বিনোদবালার প্রতি এক্ষণে আর তত লক্ষ্য নাই।

গায়ক চারুচন্দ্রের নিকট কনিষ্ঠভ্রাতার ন্যায় বিশ্বাসী।

বাস্তবিক এ সরল কিশোর প্রতিমূর্ত্তিতে কলঙ্কের চিহ্ন থাকিতে পারে বলিয়া কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না। গায়ক নিঃসন্দেহে চারুচন্দ্রের অন্তঃপুরেও পরিচিত হইয়াছেন। বিনোদবালাও তাঁহার গান শুনিতে বড় ভালবাসে।

একদিন চারুচন্দ্র বাড়ীতে নাই, সাহেবের কুঠিতে। গায়ক আসিয়া একাকী বৈঠকখানায় গান ধরিয়াছেন।——

"হাসি হেরে প্রাণ ভুলিল,
নয়নে ললাটে অধরে, উছলিত হাসি লহরে,
প্রাণ মাতিল।
যে কুসুমে এত হাসি, এতই সৌরভ রাশি,
ভ্রমর মধুপিয়াসী,
ভাবে তার কি পরিমল॥
প্রাণ ভুলিল।"

বীণাবিমুগ্ধা কুরঙ্গিনীবৎ বিনোদবালা কুরঙ্গনয়নে কটাক্ষ হানিয়া গায়কের সম্মুখিনী হইল। নয়নে অধরে হাসির লহরী তুলিয়া জিজ্ঞাসিল, "একাকী গাইলে সুখ কি? গানের শ্রোতা চাই।"

গায়ক। গাইতে জান্‌লে শ্রোতা মিলে। তুমিই তাহার সাক্ষী।

বিনোদ। যথার্থ, ও গান যাহার কর্ণে প্রবেশ করে সে কি স্থির থাকিতে পারে? কিন্তু আজ কোন্ ফুলের মধুর আশে ভ্রমর এমন গুঞ্জরিতেছে।

গায়ক। শোন, আবার গাই।

"মুখ যার এত সরল, হাসি যার এত কোমল,
বুকে কি পাষাণদল,
বাঁধিয়াছে সে কমল।"
প্রাণ ভুলিল।"

বিনোদ। ভ্রমর কি ফুলের কাছে মধু চেয়ে পায় নাই।

গায়ক। "বহুদেশে দেশান্তর, পার হয়ে পারাবার।
যেই ফুলে ভ্রমর বাধিল,
সে ফুল তারে না চিনিল॥
প্রাণ ভুলিল।"

বিনোদবালা আর কিছু বলিল না; অনিমেষনয়নে বহুমূল্য-বেশ-বিভূষিত গায়কের সর্ব্বাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। দেখিল সে বরাঙ্গ সৌন্দর্য্যের অভাবমাত্র-পরিশূন্য। শারদসপ্তমীর বিমলচন্দ্রসম ললাটোর্দ্ধে সুচিক্কণ কুঞ্চিত-কেশদামের সমগামী সূক্ষ্মরেখা, নিম্নে তদধিক সুন্দর অনুপম অলকস্পর্শী ভ্রূযুগল ললাট-ভাণ্ডারের অমূল্য-সৌন্দর্য্য-রাশি-রক্ষী মনোহর প্রাচীররূপে শোভা পাইতেছে। তন্নিম্নে কৃষ্ণতার সরস বিশাল নয়নযুগল, কুঙ্কুম-রাগ-রক্ত সদাহাস্যময় অধরোষ্ঠ, চন্দ্রকলোজ্জ্বল কুসুমে গঠিত মনোহর কপোল-যুগল সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। সে মুখমণ্ডল বয়শ্চিহ্ন শ্মশ্রুগুম্ফাদির রেখা পরিশূন্য, অতি কোমল শোভাময়। বয়সে যখন ইহাতে শ্মশ্রুগুম্ফের রেখা পড়িবে, তখন না জানি এ মুখে ভিন্নরূপ কেমন শোভা প্রকটিত হইবে? বুঝি ফুল্লকমলে ভ্রমরপাঁতি সে শোভায় লজ্জা পাইবে। দেহের অন্যান্য অঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত, কিন্তু সেই বস্ত্রাবরণ ভেদ করিয়া যে স্নিগ্ধজ্যোতি বিকাশিত হইতেছে, তাহাতে কোন্ রূপসী আত্মবিক্রয় করিতে অভিলাসিনী না হয়?

পাপিষ্ঠা, বিমুগ্ধা বিনোদবালা ভাবিতেছিল, সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া এই গায়কের পদে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিলে কি হয়? দোষ?—পাপ?—তা একে পাপ শতেও পাপ, এ সাধ আমি পূরাইব। আমায় বাধা দিবে কে? যে বাধা দিবে, সেত এখন মদিরার দাস! কি দেখিয়া আমি তাহার ক্রীতদাসী হইয়া থাকিব? এমন রূপ কি তাহার আছে? সেকি আর আমায় ভালবাসে? যে ভ্রমরীর পক্ষ আছে, সে নির্ম্মধু কুসুম ছাড়িয়া মধুময় পুষ্পে উড়িবে না কেন?

ইহার পর বিনোদবালার সঙ্গে গায়কের অনেক কথা হইল। গায়কের সহিত তাহার গুপ্ত-প্রণয় স্থির হইল। আজ হইতে গায়ক এই বাটীতেই অতিথিরূপে রাত্রিযাপন করিবেন স্থিরীকৃত হইল।

অনন্তর গায়ক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উর্দ্ধমুখে যুক্তকরে বলিলেন, "গুরুদেব! আমার এ কপটতার ক্ষমার জন্য জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও। বোধ হয় দাসী অচিরাৎ তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিবে।"





তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্নে চারুচন্দ্র গৃহে আসিয়া দেখিলেন, সেই নবীন গায়ক তাঁহার বৈঠকখানায় গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট। চারুচন্দ্রকে গৃহে প্রবেশমাত্র তিনি বলিলেন, "আজ আপনার কাছে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা আছে, একটু বাহিরে চলুন।"

উভয়ে বাহিরে আসিলেন। গায়ক বলিলেন, "বিনোদবালা কি আপনার বিবাহিতা পত্নী?"

মুহূর্ত্ত মধ্যে চারুচন্দ্রের মুখমণ্ডলে একপ্রকার অস্বাভাবিক ভাব প্রকটিত হইল; বাধ বাধ কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "বল কি?"

গায়ক। বিনোদবালা তোমার বিবাহিতা পত্নী নয় তাহা জানি; কিন্তু বিনোদবালা তোমায় ভালবাসে?

চারুচন্দ্র কুপিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি বলিতেছ?"

গায়ক। আমি সব জানি, আমাকে কিছুই লুকাইতে পারিবেন না। আমা' দ্বারা উপকার ভিন্ন অপকারের আশঙ্কা করিও না। বল, বিনোদবালা তোমায় ভালবাসে?

চারুচন্দ্র কিছু সংযত হইলেন, বলিলেন "তুমি কে? এত কথা তোমার কেন?"

গায়ক। আমি যেই হই না কেন? বল বিনোদবালা তোমায় ভালবাসে?

চারুচন্দ্র উত্তর করিলেন, "বাসে।"

গায়ক। বিনোদবালার চরিত্রে তোমার বিশ্বাস আছে ?

চারুচন্দ্র। যথেষ্ট—বিনোদবালা এখন আমায় যেরূপ ভালবাসে তাহা যথেষ্ট নয়; কিন্তু বিনোদবালা বিশ্বাসঘাতিনী নয়। আমি মাতাল, অনুতাপে সর্ব্বদা পীড়িত, স্মৃতির দংশনে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত, তাই বিনোদবালাকে যথেষ্ট ভালবাসিতে পারি না; সেজন্য সে আমার উপর কিছু অসন্তুষ্ট, তাহা আমি বুঝি; কিন্তু সে আমার বিশ্বাসঘাতিনী নয়।

গায়ক। তাহার বিবাহিত স্বামী ছিল, তাহাকে ত্যাগ করিয়া তোমার উপপত্নীরূপে তোমার সঙ্গে আসিয়াছে। যে পতির প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী, সে যে উপপতির বিশ্বাসঘাতিনী হইবে না, ইহাই তোমার বিশ্বাস ?

চারুচন্দ্র। তুমি সব জান দেখিতেছি, তোমায় গোপন করিব না। বিনোদবালা স্বামী ছাড়িয়াছে, স্বামী তাহার মনোমত নয় বলিয়া। আমি তাহার মনোমত পুরুষ, সে আমার বিশ্বাসঘাতিনী হইবে কেন ?

গায়ক। তুমি মূর্খ; স্বামী যে স্ত্রীর মনোমত নয়, অন্য পুরুষ কি তাহার মনোমত হইতে পারে ? তুমি অন্ধ, তোমার অন্ধত্ব আমি ঘুচাইব। আগে বল, যদি দেখিতে পাও বিনোদবালা বিশ্বাসঘাতিনী, অন্য পুরুষে আসক্ত, তাহা হইলে কি করিবে ?

চারু। যেদিন তাহা দেখিব, সেদিন এ পঙ্কিল জীবন সাগরজলে ডুবাইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। কেবল বিনোদবালার জন্য আমি এ অনুতাপের অগ্নিকুণ্ড সংসারে বিচরণ করিতেছি। আমি মোহে মুগ্ধ হইয়া অবলার ইহকাল নষ্ট করিয়াছি, নিজের

ইহকাল পরকাল নষ্ট করিয়াছি, বিনোদবালার পরকাল নষ্ট করিয়াছি কি না বলিতে পারি না। এক্ষণে তাহাকে ত্যাগ করিলে তাহার দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না, তাই এ সংসার, এ গৃহবাস। নইলে, ভোগলালসা আমার তিরোহিত হইয়াছে।

গায়ক। ভাল, তোমার পত্নী প্রভাবতীকে যদি এখন পাও, তবে কি কর?

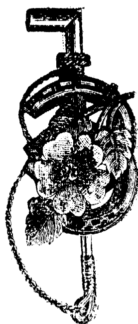
চারুচন্দ্র বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সে অভিসারিকা হইয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; তাহার মুখদর্শনও করিব না। স্ত্রীজাতি এমনি অসার বটে।"

গায়ক। মূর্খ, পরপত্নীকে উপপত্নীরূপে সম্ভোগ করিতে ঘৃণাবোধ কর না, স্বীয় সাধ্বী পত্নীকে মিথ্যা কলঙ্কে দূষিত করিয়া ঘৃণা করিতেছ! প্রভা ব্যাভিচারিণী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে, তুমি তাহা কিসে বিশ্বাস করিলে? যাক সেকথা পরে হইবে। আজ আমার কথা শুন; আমার অনুরোধে আজ মদ্যপান করিও না। রাত্রিতে অতি সাবধানে কপট নিদ্রা ও কপট-নেশার ভাণ করিয়া থাকিবে, দেখিতে পাইবে তোমার বিনোদবালা বিশ্বাসঘাতিনী কি নয়। বিনোদবালা রূপ চায়, তোমা অপেক্ষা আমি রূপবান্ দেখিতেছ না? আমার অনুরোধ রাখিবে?

চারু। অবশ্য রাখিব, আমি ইহাই চাই। আমি বিনোদবালার হস্ত হইতে,—সংসার হইতে মুক্তি চাই। বিনোদবালাকে বিশ্বাসঘাতিনী বা পরপক্ষপাতিনী দেখিতে পাইলে আমি মুক্তিলাভ করিতে পারিব?

গায়ক। তবে গৃহে যাও, আমি কার্য্যান্তর হইতে আসি।

চারুচন্দ্র গৃহে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। বিনোদবালা কয়েক-বার ডাকিল, বড় কথা বলিলেন না। সে ভাবিল, মদে উন্মত্ত বলিয়া একরূপ হইয়াছে। সে রাত্রিতে চারুচন্দ্র আহারাদি করিলেন না।





চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অষ্টমীর চাঁদ ডোব ডোব হইয়াছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিদ্রাভিভূত নীরব। কিন্তু সর্ব্বত্র নিদ্রার অনবরুদ্ধগতি সম্ভবে না। চারু-চন্দ্রের গৃহ নীরব, কিন্তু নিদ্রাভিভূত নয়। তাঁহার বহির্কক্ষে সেই নবীন গায়ক জাগ্রত, সে কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত। গায়ক চন্দ্রিকা-দীপ্ত গগনোপরি দৃষ্টি সমাবিষ্ট করিয়া ভাবিতেছেন, মানব-বুদ্ধি অধিকাংশস্থলেই ভ্রান্তি-পরাহত, অনেকস্থলেই মানব কৃতকর্ম্মে আশার বিপরীত ফলভোগ করিয়া থাকে। শাস্ত্রে বলে, কর্ম্ম করিবার অধিকার মানবের, ফল বিধাতার হস্তে; ভবিষ্যতন্ধ স্থূলদৃষ্টি মানবের কর্ম্মফলে আশা করা বৃথা। আজ আমি যে ফলের আশা করিয়া এ চাতুরী, এই বিষম কপটতা খেলিতেছি, তাহাতে যে বিষময় ফল ফলিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? হয়ত আমার এই চাতুরীতে স্ত্রীহত্যা, নরহত্যা কি তদধিক কোন ভীষণফল ফলিতে পারে। গুরুদেব, তোমারই আদেশে আমি কর্ম্ম করিতেছি; তোমারই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দুর্ব্বলা সতী প্রভার মঙ্গলের জন্য তাহার শত্রুদিগের নির্যাতন-মানসে এই চাতুরী খেলিতেছি! এর ফলে কি হইবে, তুমি জান। তুমি দেবলোকে গিয়া দেবত্ব

লাভ করিয়াছ, তোমার দৃষ্টি মানবের ন্যায় দুর্ব্বল নয়, তুমি কর্ম্মফল জানিতে পার। যদি কুফল ফলে, তবে দাসীকে এখনও নিবৃত্ত কর।”

তখন কক্ষদ্বারে ধীর-সিঞ্জন-ধ্বনি বাজিয়া উঠিল। হাস্যমুখে পাপিষ্ঠা বিনোদবালা গায়কের পবিত্রদেহস্পর্শ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিল। গায়ক বলিলেন, “আমি ভাবিতেছি, তুমি আসিবে না।”

বিনোদ। তোমার যেমন মন, তেমনি ভাবিয়াছ।

গায়ক। এখন যদি চারুচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হন।

বিনোদ। অসম্ভব, মদে উন্মত্ত; আসিলেই বা কি, আমি অত ভয় রাখি না।

গায়ক। কিন্তু আমি আমাদের এমন সুখে সন্দেহ রাখিতে ইচ্ছা করি না; চলনা আমরা এই রাত্রিতে এ স্থান হইতে চলিয়া যাই। চারুচন্দ্র অপেক্ষা আমি তোমার সহস্রগুণে সুখে রাখিতে পারিব।

বিনোদ। ক্ষতি কি। কিন্তু আজ কেন? যেতে হয় দুদিন বাদে প্রস্তুত হইয়া গেলেই হবে।

গায়ক। কিন্তু আমা’ অপেক্ষা সুন্দর পুরুষ দেখিলে তুমি অবশ্য সে সুবিধা ত্যাগ করিবে না।

বিনোদ। দেবতা সাক্ষী রাখিয়া শপথ করিতে পারি, তুমি না ছাড়িলে তোমায় ছাড়িব না।

গায়কের ভাবান্তর হইল; অতি রুক্ষ-মর্ম্মস্পর্শী সুস্পষ্টস্বরে কহিলেন, “পাপিষ্ঠা! নারীকুলে রাক্ষসি! বৃথা এ মায়াজাল বিস্তার করিতেছ। এ হৃদয় তোমার ওমায়াজালে মুগ্ধ হইবার

নয়। স্ত্রীলোকের সর্ব্বদেবময় আরাধ্য-দেবতা স্বামী ত্যাগ করিয়া দুর্ভাগ্য চারুচন্দ্রকে মুগ্ধ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছ; তাহার সোণার সংসার ছারখার করিয়াছ; একটী নিরপরাধা বালিকার মর্ম্মচ্ছেদ করিয়াছ; এখন হইতে কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। জানিও পুরুষ স্ত্রীলোকের ভোগের সামগ্রী নহে, আরাধ্য দেবতা। এক্ষণে নিজকৃত কর্ম্ম স্মরণ করিয়া আসন্ন নরকের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর।"

পশ্চাদ্দেশ হইতে রুদ্রমূর্ত্তিতে আসিয়া চারুচন্দ্র বজ্রমুষ্টিতে বিনোবালার হস্তধারণ করিলেন। গায়ক কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একটু দূরে দাঁড়াইলেন। বিনোদবালা নীরব, সংজ্ঞাহীন, প্রস্তরময়ীমূর্ত্তিবৎ অচঞ্চল। তাহার চক্ষে আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, জগৎ, গৃহ, বন, সমস্তই যেন বিশৃঙ্খল বিঘূর্ণিত হইয়া মহাপ্রলয় সংঘটিত করিতেছিল! কেন এমন হইল! বিভিন্নকুসুম-চারিণী ভ্রমরী, স্বাধীনা স্বৈরিণী বিনোদবালাত চারুচন্দ্রকে ভয় করে না। পানদোষ-ক্লিষ্ট ক্ষীণতনু চারুচন্দ্রত তাহা অপেক্ষা অধিকতর বলশালী নয়। তবে কেন এমন হইল? পাপী সহস্রবলেও দুর্ব্বল, ইহাই এ প্রশ্নের উত্তর।

মুষ্টিবন্ধন অধিকতর দৃঢ় করিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে চারুচন্দ্র ডাকিলেন, "বিনোদ!"

পশ্চাতে গায়ককণ্ঠে কোমল গম্ভীরধ্বনি হইল "স্ত্রীহত্যা করিও না, আত্মপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।"

চারু। আত্মহত্যা এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত?

গায়ক। পাপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। আত্মহত্যা পরহত্যা অপেক্ষা গুরুতর পাপ। স্বীয় কৃত দুষ্কর্ম্মে যাহা:

দিগকে পীড়িত করিয়াছ, তাহাদিগকে সুখী করিতে চেষ্টা কর। নিজ আত্মীয়জনের কাছে ফিরিয়া যাও।' মাতা পত্নীর কথা মনে কর।

চারুচন্দ্র ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বিনোদবালাকে বলিলেন, "বিনোদ! গায়ক মহাত্মা, উঁহার কথা অবহেলা করিব না, তোমার জীবন নষ্ট করিব না। কিন্তু সত্য কথা বলিও। বল, কিসের কামনায় তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া এই মহাত্মাকে কলঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলে?—বল কিসের অভাবে তুমি আমা হেন পদানত দাসকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইতেছিলে?"

বিনোদবালার দেহে সংজ্ঞা আসিল, কিন্তু মুখে কথা ফুটিল না। পাপের প্রতিফল আছে, দুষ্কর্ম্মের শাস্তি আছে, পাপিহৃদয়ে এ ভাবের দৃঢ়-প্রতীতি হইলে অগ্নিকুণ্ডে পতিত শলভের ন্যায় পাপী দিকহারা নিরুপায় হইয়া পড়ে। ভীত ব্যাকুলিত হৃদয়ে বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইয়া বিনোদবালা ভাবিতেছিল, এখন উপায়! চারুচন্দ্রের কথায় কি উত্তর দিবে? অনিমেষনয়নে চারুচন্দ্রের মুখের উপর তাকাইয়া কাঁপিতে লাগিল। চারুচন্দ্র অধিকতর তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "বল বিনোদবালা! কোন লোভে তুমি এই গায়কের অনুগামিনী হয়েছিলে?"

ভূতাবিষ্টামূর্ত্তির ন্যায় বিনোদবালা বলিল "রূপ!"

চারু। আমাতে তোমার সাধ মিটিয়াছে?

বিনোদ। অনেক দিন।

চারু। পবিত্রাত্মা এই বালককে কলঙ্কিত করিবে, এমন শক্তি ত তোমার নাই। তবে এখন কোথায় গিয়া রূপ-তৃষ্ণা মিটাইবে?

বিনোদ। যমালয়ে, নরকে !

চারু। সেত পরে, এখন ?

বিনোদ। এখনই যাইব, বিলম্বে প্রয়োজন ?

চারু। আমি তবে কোথায় যাইব ?

বিনোদ। তোমার, মাতা, পুত্র, পত্নী আছে।

চারু। আচ্ছা, তবে বিনোদ বিদায় হইলাম।

চারুচন্দ্র বেগে ছুটিতেছিলেন ; গায়ক তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া গতির প্রতিরোধ করিলেন এবং বলিলেন, "কোথায় যাইবে ? স্থির হও ; আমার সঙ্গে চল ; তোমার সাধ্বী পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব।"

চারু। বালক ! তুমি কে চিনি না ; কিন্তু তোমার কথায় বিশ্বাস করিলাম, আমার পত্নী নিষ্কলঙ্কা। কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার আর ইচ্ছা নাই। ভ্রান্তিবশে যে রত্নকে কণ্ঠ হইতে বিচ্যুত করিয়াছি, তাহাকে আর চাহি না। তোমার সহিত যদি সেই সরলা বালিকার পরিচয় থাকে, তবে বলিও বিশ্বাস-ঘাতক নরপশু চারুচন্দ্রের পাপের ফল ফলিয়াছে। আমি এ জগতে আর কাহাকেও এ মুখ দেখাইব না, এ মুখ দেখাইবার স্থান এসংসারে আর নাই। কেবল একবার মাকে দেখিব, মায়ের চরণে একবার শেষ প্রণাম করিব ! বলিতে পারি না, সে আশা সফল হইবে কি না। মা যে এত দিন জীবিত, তার বিশ্বাস কি ?

চারুচন্দ্র আর বাধা মানিলেন না ; কক্ষচ্যুত নক্ষত্রবৎ নৈশান্ধকার ভেদ করিয়া চারুচন্দ্র ছুটিলেন। তাঁহার জননী ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা গায়ক জানিতেন ; কিন্তু সে সংবাদ তিনি

বলিলেন না। এ সময়ে এ সংবাদে চারুচন্দ্র অত্যাহিত ঘটাইতে পারেন। দেশে যাইতে যে সময় যাইবে, তাহাতে তাঁহার মানসিক তীব্র উদ্বেগ কথঞ্চিৎ শান্ত হইতে পারে। সময়ে সকলই শিথিল করে। অনুতাপের বেগ হ্রাস হইলে চারুচন্দ্র পত্নীর প্রতি অনুরাগী হইতে পারেন। এই সমস্ত ভাবিয়া ছদ্মবেশিনী সিদ্ধি চারুচন্দ্রকে কিছু বলিলেন না।

তখন চন্দ্রদেব অস্তমিত হইয়াছেন। বিনোদবালা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। সিদ্ধি তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া বিনোদবালার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। মূর্চ্ছাবেশে বিনোদ-বালা প্রলাপ বকিয়া উঠিল। "চারুচন্দ্র! আমায় রক্ষা কর, মারিও না; আমি মরিতে পারিব না, মরিলে যে ঐ নরকে পুড়িব!"

অনেক যত্নে বিনোদবালার প্রকৃত জ্ঞান হইল। সে বলিল, "নিষ্ঠুর গায়ক! আমি পাপে ডুবিয়াছিলাম, তোমার তায় কি ক্ষতি হইতেছিল। কেন তুমি এ চাতুরী করিয়া আমার এ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিলে? কেন এ মত্ততা ঘুচাইয়া দিলে? কেন নরকানল জ্বালাইয়া দিলে? কেন ওমোহন রূপ লইয়া আমার সম্মুখে আসিয়াছিলে?

যে কণ্ঠে সিদ্ধি কথা বলিলেন, তাহাতে বনের পশুও মুগ্ধ হয়। তিনি বলিলেন, "ভগিনি! আমায় ক্ষমা কর; যে অগ্নি অবশ্য জ্বলিত, আমি তাহাই জ্বালিয়াছি। এখন শোন, আমি তোমায় আত্মপরিচয় প্রদান করি। যে রূপে তুমি মুগ্ধ হইয়াছিলে, তাহা পুরুষের নয়, রমণীর। তুমি এতদিন পুরুষের কামনায় সকল হারাইয়াছ, কিন্তু পুরুষ চিনিতে শেখ নাই। দেখ দেখি, আমি কি পুরুষ!"

সিদ্ধি ছদ্মবেশ ত্যাগ করিলেন। যে সিদ্ধি সেই সিদ্ধি হইলেন,

কেবল সেই লম্বিত কেশরাশি আর নাই। পুরুষ সাজিতে তাহা খর্ব্ব করিতে হইয়াছে। বিনোদবালা সিদ্ধির পদতলে লুটাইয়া বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তোমার উদ্দেশ্য কি জানি না। তুমি মানবী কি দেবী তাহাও বুঝিতে পারিতেছিনা। কিন্তু তোমার শক্তি অসীম। তুমি আমার হৃদয়ে আগুণ জ্বালাইয়াছ, এ আগুণ কিসে নির্ব্বাণ হইবে তাহাও তোমায় বলিতে হইবে। তুমি বলিতে পার, বল আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে?"

সিদ্ধি। বলিব বলিয়াই এখানে এখনও আছি; কিন্তু আমার কথায় বিশ্বাস করিবে ত?

বিনোদ। আমি রাক্ষসী, তুমি দেবী; তোমার কথায় বিশ্বাস করিব না কেন? তোমার কথায় বিশ্বাস না করিলে আমার যে অন্য উপায় নাই।

সিদ্ধি। তবে শোন, তোমার স্বামী আছেন?

বিনোদ। জানিনা, জীবনে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় অতি সামান্য। অনেক দিন তাঁহাকে ছাড়িয়াছি; তিনি ইহলোকে কি পরলোকে তাহা জানিনা।

সিদ্ধি। স্বামী স্ত্রীলোকের সর্ব্বোপরি আরাধ্য দেবতা, তুমি সেই দেবতার সেবা না করিয়া পাপকামনা-বশে উন্মত্ত হইয়াছিলে, এক্ষণে সর্ব্বকর্ম্ম, সর্ব্বকামনা ত্যাগ করিয়া অনন্যমনে সেই স্বামীর পদসেবা করাই তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তিনি যদি ইহলোকে না থাকেন, তবে জগতের আর্ত্তপীড়িতের সেবায় জীবন উৎসর্গ কর। পরসেবা স্ত্রীলোকের অন্যতম ধর্ম্ম।

বিনোদ। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। আমি স্বামীর দেশ চিনিনা; আপনি আমাকে সে দেশ চিনাইয়া দিবেন?

আমি তাঁহার দাসী হইব ; তিনি আমাকে চিনিবেন না, অনেক দিন হইল বালিকাকালে আমাকে দেখিয়াছেন মাত্র ; আমিও তাঁহার কাছে পরিচয় দিব না, দাসীভাবে তাঁহার সেবা করিব ; প্রাণপণে তাঁহাকে সুখী করিব। আমি তাহা পারিব ত ?

অনন্তর বিনোদবালা সিদ্ধির কাছে স্বামীর নাম বলিল, তাঁহার গ্রামের নাম বলিল। সমস্ত রজনী সিদ্ধি বিনোদবালাকে নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ দিলেন।





পঞ্চম পরিচ্ছেদ।



গভীর নিশীথ সময়; বিশ্বগ্রাসী ঘোর অন্ধকারজালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিরুদ্ধ, নিস্পন্দ, স্তম্ভিত—ভীত! অনন্ত গগনে অনন্ত-হীরকখণ্ডবৎ নক্ষত্ররাজি বিভাসমান হইলেও পৃথিবীর দুর্ভেদ্য অন্ধকার-স্তূপ কিছুমাত্র নিরাকৃত হইতেছেনা; বরং অনন্ত-তিমিরসাগরে অনন্ত ক্ষুদ্ররশ্মি মিশিয়া নৈশবিভীষিকা অধিকতর ভীতিময়ী করিয়া তুলিতেছে! স্থানে স্থানে অন্ধকারগর্ভ ভেদ করিয়া গাঢ়তর অন্ধকার মূর্ত্তি পল্লিগ্রামের বৃক্ষরাজি ও বাসভবন সকল ভীষণ অসুরাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নিবিড় তমসাচ্ছন্ন বৃক্ষগাত্রে খদ্যোতিকাকুল উড়িয়া পড়িয়া জ্বলিতেছে; তাহাতেও ভীষণ রজনী ভীষণতরা হইতেছে মাত্র। জগতে শব্দমাত্র নাই; কিন্তু বিশেষ মনোযোগ করিয়া শুনিলে একরূপ বিশ্বময় ঝিঁঝি ধ্বনিতে প্রাণ মন উদাস হইয়া উঠে।

অধিকতর বিভীষিকাময় ভগ্ন-ত্যাক্ত গৃহ!—হিংস্র জন্তুর বাসস্থান হইয়া দেবগ্রামের প্রান্তভাগে পথিকগণের ভীতিস্থল হইয়া রহিয়াছে। গৃহের ভগ্নদ্বার উন্মুক্ত, সেস্থলে অন্ধকার অপেক্ষাকৃত তরল;—বিকট

রাক্ষসের করাল-মুখব্যাদনবৎ প্রাণ কাঁপাইয়া তুলে। গৃহের স্তম্ভগুলির কতক ভগ্ন, কতক ছিন্নভিন্ন দেহে প্রেতভূমির প্রহরীবৎ দণ্ডায়মান! গৃহের ছাঁদে নানাবিধ উদ্ভিদ জন্মিয়াছে। তাহাতে বহুবিধ কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পক্ষী প্রভৃতির নিবাস; গৃহ মধ্যেও সরীসৃপ আরসোলা চর্ম্মচটিকা প্রভৃতির আরামস্থল। মাঝে মাঝে ইহাদের সঞ্চালন সন্তাড়নাদি শব্দে ভীরুজনের মনে ভূতের ভয় জন্মাইয়া দিতেছে।

সেই দ্বিপ্রহর রজনীতে চারুচন্দ্র দ্রুতবেগে গৃহদ্বারে আসিয়া মর্ম্মভেদী কণ্ঠে ডাকিলেন, "মা! ওমা! মাগো!"

নীরব গগনে সে ধ্বনি মিশিয়া গভীর নৈশনীরবতা অধিকতর গভীর করিয়া তুলিল। অবিলম্বে চারুচন্দ্র গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার ডাকিলেন, "মা! মা আমার! মা কই?"

প্রতিধ্বনি উত্তর করিল, "মা কই!" গৃহ মধ্যস্থ কীট, পতঙ্গাদি ভয়ে এদিক ওদিক ছুটিয়া পলাইল। চারুচন্দ্র গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন ভগ্নগৃহে অবসন্নদেহে বসিয়া পড়িলেন এবং বিষাদোচ্ছ্বাসিত কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আমি কি দেখিতে আসিলাম! এই কি আমার সেই গৃহ? সেই আমার শান্তির কুটীর, উৎসাহের দুর্গ, সুখের প্রমোদভবন, ধর্ম্মের পবিত্রাসন,—সেই গৃহ কি আমার এই?—এই বিভীষিকার নির্জ্জন গহ্বর! পূর্ব্ব বিভবের ধ্বংসাবশেষ!—সুরূপের চিতাভস্ম! এই আবাসে স্নেহময়ী জননীর—বাৎসল্যের মন্দাকিনীর বক্ষে অসীম অতুল সুধা ভোগ করিয়াছি। এই গৃহে আমার এই দগ্ধ বুকে (এক সময়ে এ বুক কুসুমবাসোপযোগী কোমল ছিল)—সারল্য-পরিমলময় প্রেমের শুভ্রশতদল প্রভাবতী হাসিয়া হাসিয়া ফুটিয়াছিল। সেই

পবিত্র-কুসুম-বৃন্তাশ্রিত আর একটী ক্ষুদ্র মুকুল এই গৃহে ধীরে ধীরে ফুটিতেছিল! সে সব কই? সে প্রমোদতরঙ্গ, সে ক্রীড়ারঙ্গ, সে গীতবাদ্য, সে পানভোজন এখন কই? সে দেবার্চ্চনা, ব্রাহ্মণভোজন, দরিদ্রপোষণ এখন কোথায় রহিল? হায়রে! কিছুই নাইরে! বিগ্রহশূন্য ভগ্নমন্দির, রত্নশূন্য অসার ভাণ্ডার, রোগিশূন্য রোগশয্যা পড়িয়া আছে। সব গেছে, কিছুই নাইরে; কিন্তু মা কই? মা কি নাই? হায়রে! আমি কি মূঢ়! আমি স্বেচ্ছায় স্বীয় সুধাভাণ্ড পদাঘাতে বিচূর্ণিত করিলাম! মদিরামত্ত হইয়া আপন প্রমোদ-কুঞ্জে আপনি অগ্নিসংযোগ করিলাম! এখন কোথায় দাঁড়াইব? কেন এ নেশা ভাঙ্গিল, কেন আবার স্মৃতি জাগিল? আমার জীবনের এই চারিটী বৎসর স্বপ্নময় করিয়া দিতে পারেন, অথবা স্মৃতির দ্বারে কবাট আঁটিতে পারেন, এমন দেবতা কি কেহ আছেন? মা আমার ধরাধামে নাই। তবে এখন কোথায় যাই? সেই যে নবীন গায়ক বলিল, প্রভা সাধ্বী; তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করাইবে। তাহার কথা তখন শুনিলাম না কেন? প্রভা সাধ্বী; এ কথা সত্য। সে সরল পবিত্র বালিকাহৃদয়ে কলঙ্ক অসম্ভব! সেই প্রভা কলঙ্কিনী! জীবনের এই ঘোর দুর্য্যোগে যাহার ক্ষীণস্মৃতি এ অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়েও প্রভা বিকসিত করিতেছে, সেই প্রভা কলঙ্কিনী! পারিজাতে দুর্গন্ধ! মন্দাকিনী স্রোতে বিষপ্রবাহ! বৈকুণ্ঠে পাপের আশ্রয়! প্রভা ব্যাভিচারিণী! তবেত জগৎ ব্যাভিচারময়! আমি কলঙ্কী, বিনোদবালা কলঙ্কিনী, প্রভাও কলঙ্কিনি! চন্দ্র কলঙ্কী, তারা কলঙ্কিনী, ধরাও কলঙ্কিনী! কি দুঃস্বপ্ন! মানুষ মরণের পূর্ব্বে বিভীষিকা স্বপ্ন দেখে; মূঢ় চারুচন্দ্র মরণের পূর্ব্বে প্রভার কলঙ্ক স্বপ্ন দেখিয়াছিল। হায়!

আর একবার জন্মের শোধ কি সে পবিত্রমুখ দেখিতে পাইনা! অসম্ভব দুরাশা আমার! আমার কৃতকর্ম্মের ফল সেরূপ নয়। প্রভাও যে ইহজগতে আছে তাহার বিশ্বাস কি? এ রাক্ষসের এই কঠোর অত্যাচার সহ্য করিয়া সে কোমলপ্রাণা কি এতদিন ধরাধামে আছে? কাহার কাছে জিজ্ঞাসা করি? কে আমায় সংবাদ দিবে? সে দেবাত্মা গায়কের দর্শন কি আর পাইব? সে শিশুটীও বুঝি মায়ের সঙ্গে লুকাইয়াছে। তবে কি লইয়া সংসারে থাকিবার সাধ হইতেছে? আছে, আমার বিনোদবালা আছে। আমার ন্যায় দগ্ধহৃদয়ে সে আমার প্রমোদবাসে বোধ হয় এখনও আছে। তাহার কাছে কি যাইব? ওঃ! প্রাণ যে কাঁপিয়া উঠে! বিনোদবালার মূর্ত্তি মনে হইলে প্রাণ যে কাঁপিয়া উঠে। বিনোদ! দূরে ক্ষীণালোকে গবাক্ষপথে, ধীর মলয়-সঞ্চালিত-কোকিলকূজিত লতাকুঞ্জে যৌবনের রঙ্গমঞ্চে তোমায় বড় সুন্দর সজ্জিতা দেখিয়াছিলাম, তাই মজিয়াছিলাম।—পবিত্রতা-পরিমলময়ী প্রভার কুসুমমূর্ত্তি ভুলিয়াছিলাম। আজ এ কি দেখতেছি? দুইটী মূর্ত্তি আজ কিরূপ দেখিতেছি? একটী স্নিগ্ধ, শুভ্র, সৌরভপূর্ণ, রসময়; আর একটী তীব্র, প্রখর অনলবর্ণ, উন্মাদক উগ্রগন্ধময়, বিলাসের কঠোর কটাক্ষে বিকৃত! হায় বিনোদ! তোমায় প্রভায় এত প্রভেদ! বিনোদবালা ঘোর ঝঞ্ঝাবাতবাহিত-বজ্রবর্ষী ভীষণ কাল মেঘ, প্রভা নিদাঘানিলসঞ্চালিত সুশীতলবারিবর্ষী স্থির নীরদ,—বিনোদবালা মহাসিন্ধুবিক্ষোভকারী করালবেগময় মহাঝটিকা, প্রভা প্রফুল্লকুসুমগন্ধবাহী ধীর মলয়মারুত। বিনোদবালা সংসারমরুক্ষেত্রে উদ্ভ্রান্তকারিণী ঘোরমায়ামরীচিকা, প্রভা সন্তাপহারিণী প্রসন্নসলিলা স্রোতস্বিনী,—বিনোদবালা প্রখর বিদ্যুৎস্ফূর্ত্তি, প্রভা

শরতের পূর্ণশশী। বিনোদবালা বিনাশ, প্রভা বিকাশ, বিনোদ কাম, প্রভা প্রেম! হায়! কেন চিনিলাম না? কেন ভাবিলাম না? কেন মরিলাম?

হায়রে স্মৃতি! কেন জাগিলি? কোথায় গেলে স্মৃতি ডোবে? যাই, যেস্থানে স্মৃতি নাই, রূপ নাই, মোহ নাই, অনুতাপ নাই, বিনোদবালা নাই, প্রভা নাই, সেই স্থানের অন্বেষণ করিব।

উন্মত্ত যুবক গৃহ ছাড়িয়া বেগে ধাবিত হইলেন।





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিপদ্ সুখের বিঘ্নকারক; সুখ জীবের জীবনের অবলম্বন। কিন্তু যাহার জীবনই অসুখের হেতু, তাহার বিপদে ভয় কি? চারুচন্দ্রের জীবন বিড়ম্বনাময়; মৃত্যুর করালকবল তাঁহার প্রীতিপ্রদ শান্তিভবন; রজনীর অন্ধকারে তাঁহার ভয় কি? ঘনতিমিররাশি ভেদ করিয়া, স্মৃতির দংশনে জর্জ্জরীভূত, অনুতাপানলে দগ্ধীভূত চারুচন্দ্র মরুভূচারী দিক্‌ভ্রান্ত মৃগের ন্যায় রুদ্ধশ্বাসে পথে অপথে ছুটিতেছেন। সহসা অদূরে পীড়িতের কাতরধ্বনি শ্রুত হইল। শৈলার রুদ্ধ খরপ্রবাহবৎ চারুচন্দ্রের গতি নিবৃত্ত হইল। মনে হইল, অদূরে যোগমায়ার গৃহ; সেই গৃহ হইতে কাতরধ্বনি আসিতেছে। চারুচন্দ্র দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন:—

"উঃ! আর কতদিন এযন্ত্রণা ভোগ করিব? এ যন্ত্রণার শেষ কি আমার হইবে?—এই দীর্ঘজীবনে কত পাপ করিয়াছি; ইহ-কালেই তাহার ফলভোগ আরম্ভ হইল, আরও পরকাল আছে; নরক আমার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। কই, আগে ত পরকালে বিশ্বাস্ হইত না! ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না, ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলাফল জ্ঞান ছিল না! এখন? এখন কে আমার উদ্ধার করিবে? কাহার

কাছে এ পাপের নিস্তার ভিক্ষা করিব! কে আমায় নিস্তার করিতে পারে? আমার নিস্তার নাই। আমার ন্যায় পাপিষ্ঠা কে আছে। আমি নিজে মরিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে কত নিরপরাধীকে মারিয়াছি; আমা হইতে দেবগ্রামের রায়কুল নির্ম্মূল হইয়াছে। সতী সাধ্বী সরলা প্রভাবতী আমা হইতে কি দুর্গতি ভোগ করিয়াছে! আমা হইতেই অভাগিনী তারাসুন্দরী সকল থাকিতে অনাথিনীর ন্যায় অনাহারে জীবন ত্যাগ করিয়াছে! হায়! কেন এসব করিয়াছিলাম? যাহাদের জন্য করিয়াছিলাম, তাহারা এখন কোথায়? যে ধনের আশার এত মহাপাপ করিয়াছি, সে ধনই বা এখন কোথায়! আজ যে এই ক্ষুধা তৃষ্ণায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত, ধন জন কিছুই ত আমার নাই!"

চারুচন্দ্র আর শুনিবার অপেক্ষা করিলেন না। রুদ্রবেশে যোগমায়ার ভগ্নদ্বার করাঘাতে অপসারিত করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভয়ে যোগমায়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বজ্রনির্ঘোষে চারুচন্দ্র কহিলেন, "চুপকর!"

কম্পিত কলেবরে যোগমায়া বলিল, "কে তুমি!"

চারুচন্দ্র। চারুচন্দ্র! তোমার এ অবস্থা কেন?

যোগ। ছয়মাস হইল, কুষ্ঠরোগে উত্থানশক্তি রহিত!

চারু। যা জিজ্ঞাসা করি, সত্য বলিবে?

যোগ। পাপে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, এখন মিথ্যা বলিব কেন!

চারু। তুমিই কি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ?

যোগ। আমিই।

চারু। বল, প্রভাসম্বন্ধে কি জান?

যোগমায়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিল।

রোষে দুঃখে চারুচন্দ্রের মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হইতেছিল। তি বলিলেন, "বল, আমার মা কোথায়?"

যোগ। শোকে দুঃখে অভাগিনী ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে।

চারু। আমার পুত্র?

যোগ। তোমার মায়ের মরণকালে কোথা হইতে এক যোগি আসিয়াছিল,—লোকে বলে, সে স্বর্গের পরী,—তোমার মায়ের মৃ হইলে সেই তোমার পুত্রটীকে লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

চারু। রামকৃষ্ণ?

যোগ। প্রভার অনুসন্ধানে গিয়াছিল, আর ফিরে নাই।

চারু। তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাতে তোমার এই ঘৃণি জীবন গ্রহণ করিলে কিছুমাত্র প্রতিফল দেওয়া হইবে না। থাব পচিয়া গলিয়া মর।

দ্রুতপদে চারুচন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হইলেন।





সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নিশাশেষে চারুচন্দ্র গ্রামপ্রান্তে নিভৃত শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে চিতাভস্ম, নরকঙ্কাল, অঙ্গাররাশি, শবশয্যা, মৃণ্ময়কলসী প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! স্থানে স্থানে দুই একটা নরমুণ্ড বিকটভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, তন্মধ্যে তীরপ্রবাহী খর-সমীর-প্রবাহ প্রবেশ করিয়া মধ্যে মধ্যে শাঁ শাঁ ধ্বনি করিতেছে। দূরে গ্রাম্য-তরু-পত্রে নৈশসমীরণের তর্ তর্ শোঁ শোঁ শব্দ হইতেছে, নিম্নে কলনাদিনী তটিনীর কুল্ কুল্ ধ্বনি। মধ্যে মধ্যে স্রোতোবাহী গলিত শবের বিকট দুর্গন্ধ আসিতেছে! শৃগালদলের কর্কশরবে শ্রবণ বধির হইতেছে। চারুচন্দ্রের হৃদয়ে শ্মশান,—শ্মশান তাঁহার কাছে বিরামস্থল বলিয়া বোধ হইল। শ্মশানে রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, সুন্দর কুৎসিৎ, সৎ অসৎ সকলই আসিয়া নিঃশেষিত হয়। জীব এই স্থানে আসিয়া চিরবিরাম লাভ করে। আমি কি এ স্থানে বিরাম লাভ করিতে পারিব না? বক্ষের চিতানলে প্রাণ পুড়িয়া খাঁক হইল; এ চিতানলে কি বুক পুড়িবে না! শ্মশান, আমায় পোড়াও, কেহ কাঁদিবে না, কেহ

দুঃখ করিবে না, কাহারও ক্ষতি হইবে না; পরন্তু আমি তোমায় বড় আশীর্ব্বাদ করিব।—দাবানল-বেষ্টিত মৃগ কাহারও কৃপায় দগ্ধবন হইতে বহিষ্কৃত হইলে তাহাকে যেমন আশীর্ব্বাদ করে, আমার এ প্রাণ তোমায় তেমনি আশীর্ব্বাদ করিবে, আমায় পোড়াও। পোড়াইতে পারিবে ত? বুঝি নয়!—আমার বুকে যে অনল, তাহাতে সংসার পুড়িয়া ছাই হয়, আমি ত ভস্ম হইলাম না। শ্মশান! তোমার আগুনে কি আমি পুড়িব! আমার মা পুড়িয়াছেন। প্রজ্বলিত শোকানলে জর্জ্জরীভূত হইয়া তোমার আগুনে পুড়িয়া মা আমার শান্তিলাভ করিয়াছেন। আমি সন্তান; সন্তান মায়ের মুখে আগুন দেয়; আমি তাঁহার বুকে আগুণ দিয়াছি; এই দীর্ঘকাল তাঁহার সেই স্নেহসিন্ধু কোমল হৃদয়ে চিতা-নল জ্বালিয়া স্তরে স্তরে দগ্ধ করিয়াছি। এখন মা জুড়াইয়াছেন, শ্মশানের আগুণে তটিনীর বুকে মা জুড়াইয়াছেন। আমিও জুড়াই না কেন? নদীগর্ভে ডুবি না কেন? অন্যে পাপী বলিয়া আশ্রয় না দিক্, মা জাহ্নবী উত্তমে অধমে সম দয়াশীলা, তিনি আমায় আশ্রয় দিবেন। ডুবিব কি? কিন্তু ঐ যে সেই দৈব গায়কের কথা মনে পড়ে, "আত্মহত্যা করিও না।" আরও মনে পড়ে, সাধ্বী প্রভার সহিত সাক্ষাৎ করাইবে। বড় ইচ্ছা হইতেছে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি। এ সময়ে তাহার সঙ্গে দেখা হইলে এ আগুন জ্বলে কি নেভে তাহা দেখিতাম।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, অনুতাপে দগ্ধীভূত, দীর্ঘ পর্য্যটনে পরিশ্রান্ত চারুচন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে সেই শ্মশানধামে তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন।—নিদ্রায়ও পীড়িতের শান্তি নাই; তন্দ্রাবশে স্বপ্ন দেখিতে লাগি-লেন!—ভীষণ বালুকাময় শ্মশানক্ষেত্রে অগণিত শৃগাল কুক্কুর বিকট

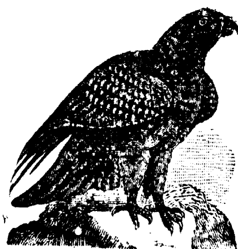
শব্দ করিয়া ইতস্ততঃ ছুটিতেছে! সেস্থানের বালুকারাশি এতাদৃশ উত্তপ্ত যে প্রতি পদক্ষেপে পদতল ঝলসিয়া যাইতেছে। অনল সদৃশ তীব্র সমীর স্রোতে নাশাদগ্ধকারী প্রখর দুর্গন্ধ আসিতেছে! সেই বালুকা-শয্যায় চারুচন্দ্রের বৃদ্ধা জননী অস্থিচর্ম্মমাত্রাবশিষ্ট হইয়া মর্ম্মান্তিক চীৎকার করিতেছেন। তিনি অবিরাম বলিতেছেন, "ক্ষুধা তৃষ্ণায় আমার প্রাণ বায়, কে আমায় একটু অন্ন জল দিবে? বাবা চারুচন্দ্র! কোথায় রইলে?" ক্রমে বৃদ্ধা অবসন্না, আসন্নকাল সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। তখন চারিদিক হইতে পালে পালে শৃগাল কুক্কুর শকুনী গৃধিনী আসিয়া বৃদ্ধার সেই জীবিত শব আক্রমণ করিল। তিনি বেদনায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই হিংস্র পশু-পক্ষিদল আকাশস্পর্শীমূর্ত্তি বিকট রাক্ষসাকারে পরিণত হইল। যাহার যেমন আকৃতি তেমনি রহিল, কিন্তু তাহাদের বর্দ্ধিত-কলেবরে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইল। তন্মধ্যের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ও ভীষণতম রাক্ষস বিকটস্বরে অন্যান্য সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বৃদ্ধার শুষ্ক মাংস আর কেহ ভক্ষণ করিও না, ঐ দেখ সেই দুরাত্মা চারুচন্দ্র আসিয়াছে, ঐ পাপিষ্ঠ কামিনীর রূপমদে মোহিত হইয়া বৃদ্ধা জননীকে অন্ন দেয় নাই; সতী সাধ্বী পত্নীকে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত করিয়াছে, এস আমরা সকলে মিলিয়া উহাকে লইয়া নরককুণ্ডে যাই, নরকের আগুনে পোড়াইয়া উহার মাংস ভক্ষণ করিব।" সকলে দলবদ্ধ হইয়া বিষময় দন্ত দ্বারা চারুচন্দ্রকে ধরিল। ধরিয়া আকাশে উঠিতে লাগিল। অনেক উর্দ্ধে উঠিল, চন্দ্রমণ্ডল নক্ষত্রমণ্ডল অতিক্রান্ত হইল। ক্রমে এমনস্থলে উঠিল, যে স্থানে আলোক নাই, অথচ অন্ধকারও নাই; এক প্রকার তীব্র জ্যোতি আছে, তাহাতে নয়ন অন্ধ হইয়া গেল,

দেহে অগ্নিশিখা জ্বলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে আরও নূতন নূতন রাক্ষসদল আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। তাহাদের লোমহর্ষণ চীৎকারধ্বনি ও বিষাক্ত দন্তাঘাতে চারুচন্দ্র আর্ত্ত-স্বরে অনেক দেবদেবীকে ডাকিতে লাগিলেন, কেহই তাঁহাকে কৃপা করিল না। অদূরে বজ্রনির্ঘোষ অপেক্ষা কঠোর, মুমূর্ষুর কাতরধ্বনি অপেক্ষা তীব্র, দাবানলবেষ্টিত বনভূমি অপেক্ষা কোলাহলময় গভীর গর্জ্জন শ্রুত হইল। রাক্ষসদল নাচিয়া উঠিল, "ঐ নরকের শব্দ শুনা যাইতেছে ; শীঘ্র চল, শীঘ্র চল।" মহাভয়ে চারুচন্দ্র ডাকিলেন, "কে আমায় এ নরক হইতে নিস্তার করিবে ? আমি নরকে পুড়িলাম, তাহা কেহ দেখিল না। যাঁহাদের নির্যাতন করিয়াছি বলিয়া আমার এই নরকভোগ, তাঁহারা আমায় ক্ষমা করিলে কি আমার পরিত্রাণ হয় না ? আমি সহস্র অপরাধ করিলেও যে তাঁহারা আমায় ক্ষমা করিয়া থাকেন। কোথায় মা জননী আমার! কোথায় প্রিয়ে প্রভাবতি! আমায় কি ক্ষমা করিবে না ?"

সহসা রাক্ষসগণের সে বিকটভাব যেন প্রশান্ত হইল। দূরে কে বলিল, "ওনি আমার প্রিয়তম ; উহাঁকে এমন লাঞ্ছিত করিতেছিস ?" রাক্ষসগণের দন্ত-বন্ধন যেন শিথিল হইয়া আসিল। মেঘমালা ভেদ করিয়া একটী দেববালা আবির্ভূত হইলেন। ও কে ?—ও যে প্রভাবতী! চারুচন্দ্র তাঁহার দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

তৎক্ষণাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইল। দেখিলেন রজনীর অন্ধকার তিরোহিত হইয়াছে। নবোদিত সূর্য্য-কিরণ তটিনীগর্ভে তরঙ্গ ভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া জলিতেছে। দুই চারিজন কৃষক অদূরবর্ত্তী

প্রান্তর প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া বিস্মিত নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে। তাঁহাকে সচেতন দেখিয়া তাহারা নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, কিন্তু তিনি আর দাঁড়াইলেন না। দেবগ্রামের লোকের কাছে তিনি আর কিরূপে মুখ দেখাইবেন? যে স্থানে মহান্ বলিয়া পূজিত ছিলেন, সেস্থানে ঘৃণিত পশুভাবে তিরস্কৃত হইতে তিনি আর অবস্থিতি করিলেন না। উন্মত্তবৎ তীরবেগে পলায়ন করিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, কিন্তু অন্নজল গ্রহণ করিলেন না। প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমার মা যখন আমারই জন্যে অন্নাভাবে মরিয়াছেন, তখন আমি আর অন্ন গ্রহণ করিব না। জীবন অনাহারেই পাত করিব। কিন্তু যদি পাই, প্রভাকে একবার দেখিব।"





অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পাঠক! অনেক দিন পরে আবার আমাদের বৃদ্ধ রামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। একটী ক্ষুদ্র বাজারে এক মুদীর গৃহে রামকৃষ্ণ রাত্রিতে আশ্রয় লইয়াছে। রামকৃষ্ণ প্রভাবতীর অনুসন্ধান করিয়াছে; চারুচন্দ্রের অনুসন্ধান করিয়াছে; কাহাকেও পাইল না, বিফল-মনোরথ হইয়া দেশে ফিরিয়া দেখিল তারাসুন্দরী ও শিশু ভবচন্দ্র গৃহ শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে, লোকের কাছে তাহাদের যে সংবাদ পাইল তাহাতে অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তারপর ভাবিল আর ঘুরিয়া কি হইবে, এখন স্বস্থানে যাই। রামকৃষ্ণ কাশীতে গিয়াছিল। সেস্থানে কিছু দিন ছিল; ভিক্ষা করিয়া দিন কাটাইল। কিন্তু প্রভার যে অলঙ্কারগুলি তাহার কাছে ছিল, তাহার এক টুকুও নষ্ট করিল না। কৃপণের ধনের ন্যায় তাহা বুকে বুকে রাখিত। কিন্তু অধিক দিন তাহার কাশীবাস ভাল লাগিল না। রামকৃষ্ণ পুণ্য ভূমি কাশী ত্যাগ করিয়া সেই আত্মীয় পরিজনশূন্য দেশে ফিরিল। কেন ফিরিল জিজ্ঞাসা করিলে সে বড় একটা কিছু বলিত না। সে মনে

মনে আপনাকে বুঝাইত, চারুচন্দ্র তাহার উপর যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারই তত্ত্বাবধানে প্রভুর সোণার সংসার ছার খার হইয়াছে; তাঁহার সোণার প্রতিমা প্রভাবতী অপহৃত হইয়াছে। তাঁহাদের অনুসন্ধান করাই তাহার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, তীর্থধামে সে কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইবে না, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। তার পর অন্যে যাহা বলুক, প্রভা যে কলঙ্কিনী একথা রামকৃষ্ণের মনে কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছে না। অমন দেবী প্রতিমায় কি কলঙ্ক থাকিতে পারে? প্রভার নিরুদ্দেশের কারণ রামকৃষ্ণ অনেক অনুসন্ধানে কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছে। সর্ব্বোপরি বিশেষ কথা, রামকৃষ্ণ যে সতী প্রভাবতীর হাতের জল পাইয়া মরিয়া স্বর্গে যাইবে ভাবিয়াছিল, সে সাধ ত তাহার পূর্ণ হইল না। তাই স্থূলবুদ্ধি ভৃত্য রামকৃষ্ণের কাশীবাস হইল না।

রামকৃষ্ণ মুদীর ঘরে নিজের পুটুলি ঠেশ দিয়া বসিয়া গুণ গুণ স্বরে রাম-প্রসাদী গাহিতেছিল আর ভাবিতেছিল, এত ঘুরিলাম তবু সেই পোড়াকপালী মেয়েটার দেখা পাইলাম না! সে বেঁচে আছে কি মারা গিয়াছে তাহাও ত বুঝিলাম না। পৃথিবীময় সকল লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই কি তাহাকে কোথাও দেখে নাই! ভাল, আমি যে তাহার জন্যে এত করিতেছি, সে কি আমাকে একটু মনে করে? অবশ্য করে, যে আমাকে অত ভালবাসিত, সে কি কখনও ভুলিতে পারে? আর নাই বা মনে করিল; আমি চাকর, তা'রা মুনিব, তা'রা আমায় মনে না করিলেই বা কি? থাক, আমি যদি চারুচন্দ্রেরও একবার দেখা পাইতাম, এ অলঙ্কারগুলি তাকে দিয়া এক ভার থেকে এড়াইতাম।"

এমন সময়ে মুদী আসিয়া বলিল, "বাপু! তোমার এ ঘরে

থাকা হইবে না। যদি দাওয়ায় থাকিতে পার তবে ভাল, নইলে অন্যত্র স্থান দেখ।"

বাহির হইতে অতি স্নিগ্ধস্বরে কে মুদীকে বলিল, "না না; আমাদের জন্য ওঁকে অন্যত্র যেতে হবে না। আমরাই না হয় দাওয়ায় থাকিব।"

মুদী বলিল, "তা কি হয়, তোমরা মেয়ে মানুষ, বাহিরে থাকিবে? ও ব্যাটা যেখানে পারে চলে যা'ক।"

রামকৃষ্ণ বাক্যব্যয় না করিয়া পুটলি হাতে লইয়া বাহিরে আসিল। দুইটী রমণী দাওয়ায় এক পার্শ্বে দাড়াইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ একটু দেখিয়া তাঁহাদের একটীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। যাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি ব্যস্ত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "ছি ছি! ওকি, আপনি ত্রিকালের বৃদ্ধ, আমরা কি আপনার প্রণামের যোগ্য? আমি আপনাকে প্রণাম করি।"

অপরা কামিনী বলিল, "আপনি আমাদের দুজনের মধ্যে ওঁকে প্রণাম করিলেন; আপনি কি করিয়া চিনিলেন?"

রামকৃষ্ণ কথা বলিল না। যদি সে পণ্ডিত হইত, তবে বলিত, "গিরিরাজ ভিখারী শঙ্করকে কেন প্রণাম করিয়াছিলেন? তাঁহাকে কে চিনাইয়াছিল?"

এই দুই জন রমনী সিদ্ধি ও বিনোদবালা। তাঁহারাও মুদীর গৃহে আশ্রয় লইতে আসিয়াছেন। সিদ্ধি রামকৃষ্ণের কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা থেকে আসিতেছ?"

রাম। কাশী থেকে।

সিদ্ধি। কোথায় যাইবে?

রাম। এখন একবার দেবগ্রামে যাইব।

সিদ্ধি। দেবগ্রামে কি তোমার বাড়ী ?

রাম। সে কথা বলিয়া আর কি হইবে ? তোমরা দেখিতেছি সন্ন্যাসিনী, অনেক স্থানে ঘুরিয়া থাক। প্রভা নামে কোনও বালিকাকে তোমরা কোথাও দেখিয়াছ কি ? সে খুব সুন্দরী, দেবগ্রামের প্রসিদ্ধ রায়বংশের কুলবধূ।

রামকৃষ্ণ লোক পাইলেই প্রভার কথা, চারুচন্দ্রের কথা জিজ্ঞাসা করিত। সিদ্ধি বলিলেন, "প্রভা তোমার কি হয় ?"

রাম। কিছুই না, আমি তাঁর বাড়ীর চাকর।

সিদ্ধি। তোমার নাম রামকৃষ্ণ ?

রামকৃষ্ণ সিদ্ধির মুখপানে নিষ্পলকনেত্রে তাকাইয়া রহিল। সিদ্ধি বলিলেন, "কি দেখিতেছ ?"

রাম। তুমি আমার নাম কি করিয়া জানিলে ? যেরূপেই জান, তুমি যখন আমাকে চিনিয়াছ, তখন প্রভাকেও চেন। বল মা, প্রভা কি জীবিত আছে ? তাকে কি আর দেখিব !

রামকৃষ্ণের নয়ন হইতে টস্ টস্ অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সিদ্ধি বলিলেন, "যে স্ত্রীলোক গৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছে, তাহার জন্য তোমার এত মমতা কেন ?"

রাম। গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া কি সে কলঙ্কিনী ? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি সে কখনও মন্দ অভিপ্রায়ে পলায়ন করে নাই। তুমি কি বল সে কলঙ্কিনী ? মিথ্যা বলিও না, সতীর নামে মিথ্যা বলিলে মাথায় বাজ পড়িবে। বল, তুমি সব জান, প্রভা কোথায় !

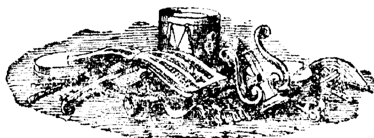
সিদ্ধি শান্তবাক্যে রামকৃষ্ণকে সান্ত্বনা করিলেন। প্রভা যে যথার্থ সাধ্বী তাহা রামকৃষ্ণকে বিশেষরূপে বুঝাইলেন। প্রভা

জীবিত আছে, অচিরাৎ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া রামকৃষ্ণকে প্রবোধ দিলেন। এতদধিক চারুচন্দ্রের সংবাদও যথাযথ রামকৃষ্ণকে বলিলেন।

রামকৃষ্ণ আনন্দে অধীর হইল! "আজ আমার কি সুপ্রভাত!" বলিয়া সে তাহার পুটলি খুলিয়া প্রভাবতীর সেই অলঙ্কারগুলি বাহির করিল এবং গদগদ কণ্ঠে বলিল "মা! স্বামীর ঋণদায় উদ্ধারের জন্য সতী এগুলি আমার কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছিল। এগুলি তাহাকে পরাইয়া কি আর দেখিতে পাইব?"

সিদ্ধি মনে মনে বলিলেন "যদি স্নেহ করিয়া কেহ সুখী হইয়া থাকে, তবে সে তুমি।"

তিনজনে সেই মুদীর ঘরে রাত্রি কাটাইলেন। তিনজনের কাহারও ঘুম হইল না। সিদ্ধি রামকৃষ্ণের সঙ্গে আলাপ করিয়া রাত জাগিলেন। বিনোদবালা নীরবে পীড়িত অন্তরে রাত্রি জাগিল। রামকৃষ্ণ অনেক দিন পরে সখীসম্বাদ গাইয়া রাত্রি ভোর করিল।





নবম পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে বিনোদবালা সজলনেত্রে সিদ্ধিকে বলিল "মা! তবে আমি বিদায় হই। আমার স্বামীর গৃহ নিকটে। আমি তাঁহার দাসীবৃত্তি করিয়া কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। কিন্তু মা! তোমার শিক্ষায় আমি সমস্ত প্রলোভন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি; কিন্তু তোমার-সংসর্গ সুখের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। আর কি কখনও ওচরণ দেখিতে পাইব?"

বিনোদবালা সিদ্ধির পদধূলি লইল। "ধর্ম্মবলে কৃত-পাপ হইতে মুক্ত হইবে" আশীর্ব্বাদ করিয়া সিদ্ধি তাহাকে বিদায় দিলেন; এবং রামকৃষ্ণকে লইয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন।

এমন সময়ে রাস্তার উপর তিন চারজন লোক বলাবলি করিতেছিল, "লোকটা আজই মারা যাইবে, অনাহারে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। কিছু খাওয়াইতে অনেক যত্ন করিলাম, কিছুতেই খাইল না। কেবল বলিতে লাগিল, "আমি মহাপাপী, আমি আমার মাকে অনাহারে মারিয়াছি; নিজে অনাহারে মরিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।" আহা! লোকটার দিকে চাইলে পাষাণও গলিয়া যায়। লোকটা বিশিষ্ট ভদ্রলোক হইবে।"

এককথা শুনিবামাত্র সিদ্ধি তাহাদের কাছে গেলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা কাহার কথা বলিতেছ?"

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "বাজারের ওপ্রশে একটা লোক অনাহারে মরিতেছে, খাইতে দিলে খায় না।"

রামকৃষ্ণকে ডাকিয়া লইয়া সিদ্ধি সেই দিকে ছুটিলেন। দেখিলেন, ধূলিকর্দ্দমিত দেহে মুমূর্ষু অবস্থায় চারুচন্দ্র ভূমিতলে লুণ্ঠিত! দৃষ্টিমাত্র রামকৃষ্ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া রোরুদ্যমানকণ্ঠে বলিল, "বাবা! এ কি?"

ক্ষীণকণ্ঠে চারুচন্দ্র বলিলেন, "রামাখুড়! এ আসন্নকালে তোমাকে দেখিয়া আমার পাপের কতকাংশ লাঘব হইল। দাও পদধূলি দাও। এই মরণকালে একবার যদি সেই বালিকাকে দেখিতে পাইতাম!"

রামকৃষ্ণ সিদ্ধির মুখপানে চাহিয়া কাঁদিয়া বলিল, "মা! এ কি দেখিলাম?"

সিদ্ধি বলিলেন, "ভয় নাই।" চারুচন্দ্রকে বলিলেন, "একি ভাই।" চারুচন্দ্র বলিলেন, "তুমি কে মা?"

সিদ্ধি। আমাকে কি কখনও দেখ নাই?

চারু। স্বর পরিচিত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু চিনিতে পারি না।

সিদ্ধি। ঐ যে গায়ককে সহোদরাধিক স্নেহ করিতে। মনে পড়ে?

চারু। তোমার কণ্ঠস্বর, তাহারই মত বটে; তুমি কে?

সিদ্ধি। আমি সেই গায়ক।

চারু। তুমি বহুরূপী, মায়াবী। তুমি বলিয়াছিলে, আমার প্রভাকে দেখাইবে। এখন দেখাইতে পার কি? সময় বড়

সঙ্কেপ; তোমার পায়ে ধ'রে বলি, একবার দেখাইতে পার কি?—জন্মের মতন একবার সেই পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া মরিতে পারি কি?—চরমকালে সে সরলার কাছে একটীবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিব কি?

সিদ্ধি। তুমি অবশ্যই তোমার পত্নীকে দেখিতে পাইবে,—পুত্র পত্নী লইয়া আবার সংসারসুখ ভোগ করিতে পাইবে, কিন্তু তুমি আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছ। বালিকা প্রভাবতী তোমারই জন্য এত কষ্টেও আপনার প্রাণ রাখিয়াছে, তোমার এরূপ ভাবে আত্মঘাতী হওয়া কি উচিত? তুমি যদি আত্মহত্যাই করিবে, তবে তাহাকে দেখিয়া আর কি হইবে?

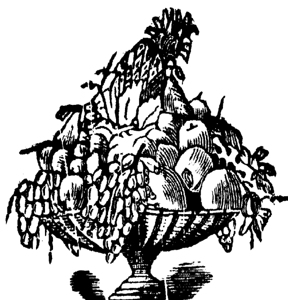
চারু। আমার মা অনাহারে মরিয়াছেন, আমি তাঁহাকে অন্নজল দেই নাই। আমি কি করিয়া অন্ন মুখে দিব। এ জীবন অনাহারে পাতিত করিয়া মাতৃহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

সিদ্ধি। তোমার মাতা অন্নবস্ত্রের কষ্ট পাইয়া মরেন নাই। তুমি তাঁহার খরচের জন্য টাকা দিয়াছিলে, তাইতেই তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে চলিয়া আরও কিছু অবশিষ্ট ছিল। মরণকালে সেবাশুশ্রূষার অভাবেও তিনি কষ্ট পান নাই।

চারুচন্দ্রের জননীর যে ভাবে মৃত্যু হইয়াছিল, যে ভাবে তাঁহার মরণকালে সিদ্ধি তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাঁহার সৎকারাদি সম্পন্ন করিয়া শিশু ভবচন্দ্রকে লইয়া নিরাপদ স্থানে রাখিয়াছেন, সিদ্ধি যথাযথরূপে সমস্তই চারুচন্দ্রকে বিবৃত করিলেন। সিদ্ধির কথায় অবিশ্বাস হইতে পারে না; চারুচন্দ্র সমস্তই বিশ্বাস করিলেন। প্রভাকে দেখিতে পাইবেন, এই আশায় বাঁচিতে সাধ হইল। সিদ্ধি কিছু দুগ্ধ আনিয়া দিলেন, চারুচন্দ্র পান করিয়া

একটু সবল হইলেন। তাহার পর রামকৃষ্ণ বাজার হইতে দ্রব্যাদি আনিয়া দিল, সিদ্ধি পাক করিলেন। সকলে পরিতোষের সঙ্গে ভোজন করিলেন।

অনন্তর প্রভাবতীর উদ্ধারকাহিনী বলিতে বলিতে সিদ্ধি রামকৃষ্ণ ও চারুচন্দ্রকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।





দশম পরিচ্ছেদ।

নিভৃত অরণ্যাশ্রমে নিদাঘ-শুষ্ক, মেঘোদয়-মলিনা ক্ষীণা স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রভাবতী কত দিন হইল একাকিনী বাস করিতেছে। দুইটী শিশু মাত্র তাহার সদা-সহচর। একটী সদ্যোজাত শিশুকন্যা প্রভার ক্রোড়ে থাকিয়া হস্তপদ সঞ্চালন করিয়া অল্প অল্প হাসিতেছে; মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর বিস্ফারিত করিয়া অব্যক্ত মধুর শব্দ করিতেছে। পার্শ্বে শিশু ভবচন্দ্র মাতৃ-ক্রোড়স্থিত শিশুর সঙ্গে কত কথা বলিতেছে, তাহাকে চুম্বন করিতেছে, তাহার হস্তপদ লইয়া খেলা করিতেছে, আর মধুর হাস্যধ্বনিতে গৃহস্থল আমোদিত করিতেছে। প্রভা অসংখ্য চিন্তা বক্ষে লইয়াও শিশুদ্বয়ের ক্রীড়াকৌতুকে বড় প্রীতিলাভ করিতেছে। দুঃখের সময়ে প্রাপ্তবয়স্কের হাস্যকৌতুক বড় নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু শিশুর সরল হাসিতে প্রাণ শীতল হয়।

যে কন্যাটী প্রভার ক্রোড় শোভিত করিয়া রহিয়াছে, সেটী সিদ্ধির গর্ভজাত,—সিদ্ধিসাধনের পবিত্র প্রণয়স্মৃতি। সিদ্ধি কন্যাটীকে প্রসব করিবামাত্র প্রভাবতীর ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়াছেন; নিজে কন্যার মুখে একবার মাত্রও স্তনদুগ্ধ দান করেন নাই। প্রভাই শিশুর সমস্ত মাতৃকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। প্রসবগ্লানির কথঞ্চিৎ

শান্তি হইবামাত্রই সিদ্ধি এই তিন মাস হইল, কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। প্রভা নিজের সমস্ত ভাবনা হৃদয়ের এক প্রান্তে রাখিয়া অনেক দিন ধরিয়া সিদ্ধির বিষয়ই ভাবিতেছে। সিদ্ধি কি মানবী! মানবহৃদয়ে কি এত মহিমার সম্ভব! এমন সোণার চাঁদ কন্যা,—এর মুখের দিকে চাহিলে স্বর্গের পারিজাতে বিতৃষ্ণা জন্মে। আমি এই হতভাগিনী,—কিন্তু এর মুখের দিকে চাহিলে আমার সকল দুঃখ যেন্ ভুলিয়া যাই। যে রমণী এমন অমূল্য রত্নে অনুরাগবিহীন, তিনি কি মানবী! কেন তিনি এধন ছাড়িয়া গেলেন?—আমারই জন্য। আমারই জন্য তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন; আমারই জন্য দেবপুরুষ স্বামী হারাইয়াছেন, আমারই জন্য সংসারের সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন! হায়! আমি কেন তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিলাম? আমার ন্যায় হতভাগিনীর দস্যু করে জীবনান্ত বা ধর্ম্মনাশ হইলে সংসারের কি আসিয়া যাইত? এই দেবদম্পতির অস্তিত্বে সংসার পবিত্র হইয়াছিল। এবার দেবীর সাক্ষাৎ পাইলে আমি তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিব, আমি আর স্বামিসহবাস সুখ চাহিনা, সংসারের সুখ সম্ভোগ চাহি না; তাঁহারই পদতলে থাকিয়া তাঁহার পদ সেবা করিয়া এপাপ নারীজীবন শেষ করিব।

এমন সময়ে দূরে বনপথে দুই ব্যক্তি প্রভার নয়নপথে পতিত হইল। যিনি অগ্রে, তিনি সিদ্ধি; পশ্চাতের ব্যক্তিকে চিনিতে না পারিয়া প্রভা তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিতে পাইল, সে রামকৃষ্ণ। উল্লাসে প্রভাবতীর সর্ব্বাঙ্গ নাচিয়া উঠিল। ব্যস্তপদে প্রভাবতী গৃহ হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইল। রামকৃষ্ণ কাছে আসিয়াই দীর্ঘনিশ্বাস

পরিত্যাগপূর্ব্বক, "মাগো!" এই কথাটী মাত্র বলিয়া বসিয়া পড়িল। প্রভা তাহার সম্মুখে ভুমিষ্ঠ হইয়া একটী প্রণাম করিল। রামকৃষ্ণ কাঁদিয়া ফেলিল এবং গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "মা! পাষাণি মা! এমন করিয়া নিষ্ঠুর হইয়া কি ভুলিয়া থাকিতে হয়? মা! তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, আমায় একটু জল দাও। অনেক দিন তোমার হাতের জল পাই নাই।"

প্রভা সিদ্ধির ক্রোড়ে কন্যাটীকে রাখিয়া জল আনিতে গেল। কন্যা কোলে লইবেন না, সিদ্ধির প্রতিজ্ঞা ছিল; আজ সে প্রতিজ্ঞা টলিল। সিদ্ধির অজ্ঞাতসারে একটী চুম্বন শিশুর কমলমুখে মিলিয়া গেল! বীরারমণী যে মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়াছিলেন, আজ সেই ছিন্ন রজ্জুতে আবার যেন তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিল!

অল্পক্ষণ মধ্যে সুশীতল বারি, কিঞ্চিৎ সুমিষ্ট বনফল আনিয়া রামকৃষ্ণের সম্মুখে রাখিয়া প্রভাবতী বলিল, "সংবাদ কি ঠাকুর!"

"সকলই মঙ্গল।" বলিয়া রামকৃষ্ণ একটী ফল মুখে দিয়া জল-পান করিল। ইত্যবসরে ভবচন্দ্র "দাদা দাদা" বলিয়া রামকৃষ্ণের কোলে আসিয়া বসিয়াছে। রামকৃষ্ণ দুইটী পাকা পিয়ারা তাহার হস্তে দিয়া, পুটলি খুলিয়া সেই অলঙ্কারগুলি বাহির করিল এব স্নেহাশ্রুপরিপ্লুত মুখে বলিল, "মা! সোণার অঙ্গে এই গুলি পরিয়া বৃদ্ধের চক্ষু সার্থক কর। তোকে এমন কাঙ্গালিনীর বেশে দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।"

তখন সিদ্ধি বলিলেন, "ধর প্রভা, কন্যা কোলে লও; আমি তোমাকে অলঙ্কার পরাইয়া দিব। আমিও তোমায় সাজাইয়া একবার দেখিব।"

প্রভা বলিল, "দেবি! অনেক আশার পরে গগনের শশী

গগনে শোভা পাইতে দেখিলাম; কিছুক্ষণ থাক, সাধ মিটাইয়া দেখিয়া লই। তোমার ক্রোড়ে আজ যে রত্ন শোভিত, কোন্ রত্নে এত মাধুরী আছে?"

"আর না; যথেষ্ট হইয়াছে।" বলিয়া সিদ্ধি অশ্রুভারাক্রান্ত-নেত্রে কন্যাকে প্রভার কোলে দিলেন এবং একখানি অলঙ্কার হাতে লইয়া বলিলেন, "ভগিনী! এই অলঙ্কারগুলি পর। এই বৃদ্ধ তোমাকে যেমন ভালবাসে, কোনও পিতা স্বীয় কন্যাকেও এত ভাল বাসিতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। তোমারই জন্য ইহার কাশীবাস ভাল লাগিল না; বোধ হয় তোমারই চিন্তায় ইহার ইষ্ট চিন্তাও হয় না।"

প্রভা অলঙ্কারগুলি পরিল; পরিয়া সিদ্ধি ও রামকৃষ্ণকে এক একটী প্রণাম করিল।

অনন্তর সিদ্ধি বলিলেন, "প্রভা! তোমার স্বামীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি।"

অতিব্যস্ত হইয়া প্রভা বলিল, তাঁহাকে আমার কথা কি বলিয়াছেন?"

সিদ্ধি। তোমার কথা তাঁহাকে বলিয়া কি হইবে? তিনি অন্য এক রূপসী যুবতীর প্রেমে আসক্ত; তোমাকে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। তুমিও তাঁহাকে ভুলিয়া যাও।

প্রভা। তিনি আমাকে ত্যাগ করেন, আমি না হয় এ জীবনে তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। কিন্তু তাঁহাকে ভুলিব কেন? (প্রভার চক্ষু ছল ছল করিতেছিল)

সিদ্ধি। তবে একজন ব্যাভিচারী বারাঙ্গনাসেবী পাষণ্ড বলিয়া মনে রাখিও।

প্রভা। আপনি তাঁহাকে যতগুলি কলঙ্কে কলঙ্কিত করিতে-ছেন, তাঁহাতে এত কলঙ্ক আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। হইতে পারে,—মানব-মন সদা চঞ্চল; ঘটনা ক্রমে তিনি কুপথে পদার্পণ করিয়াছেন। কিন্তু সে হৃদয় হইতে ধর্ম্ম একবারে অন্তর্হিত হইতে পারে না। যাহা হউক, তিনি ইষ্টদেব, আমি তাঁহার সেবিকা; তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিব কেন? ইহকালে আমার এই হইল, আবার স্বামীকে ঘৃণা করিলে আমার পরকালে কি হইবে?

প্রভার চক্ষু হইতে ধারা ছুটিতেছিল। সিদ্ধি অতি যত্নে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "ভগিনি! কাঁদিও না, তোমার দুঃখের শেষ হইয়াছে। তোমার স্বামী কুপথগামী হইলেও এক্ষণে তিনি সুপথে আসিয়াছেন। জগদীশ্বরকে ডাক, তোমার শুষ্ক-মালঞ্চ আবার ফুটিবে। এস, তোমার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে।"

প্রভা। আপনি যথার্থই সিদ্ধি, আপনার কৃপায় আমার দুঃখ দূর হইবে, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু এ সময়ে তাঁহার সঙ্গে অলঙ্কারে সাজিয়া সাক্ষাৎ করা ভাল নয়।

প্রভা অঙ্গের ভূষণ উন্মোচন করিতে ছিল। সিদ্ধি নিষেধ করিলেন। বলিলেন, "তুমি আমার ভাগিনী। ভগিনীকে ভগিনী-পতির কাছে কাঙ্গালিনীবেশে লইয়া যাইব কেন? আজ শ্যামের বামে রাধাকে সাজাইয়া নয়ন-মন চরিতার্থ করিব। আমি এত কষ্টে মথুরা হইতে শ্যামসুন্দরকে বৃন্দাবনে আনিলাম; একবার ভাল করিয়া যুগলমিলন দেখিব না?"



একাদশ পরিচ্ছেদ।

নির্জ্জন তটিনীতটে সৈকতাসনে বসিয়া, তরঙ্গিনীর রবিকরদীপ্ত চঞ্চল তরঙ্গরাশির উপর দৃষ্টি সমাবেশপূর্ব্বক, জীর্ণ শীর্ণ-ভগ্ন-হৃদয় চারুচন্দ্র চিন্তা করিতেছেন। যথার্থই কি প্রভার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে? কেমন করিয়া তাহাকে এ দগ্ধ মুখ দেখাইব? যাহার কাছে আমি দেবতা অপেক্ষা পবিত্র ছিলাম, আজ কেমন করিয়া তাহার সম্মুখে এ ঘৃণিত জীবন লইয়া উপস্থিত হইব? অন্ত-রের অতি সামান্য কথাটীও যাহার কাছে না বলিয়া স্বস্তি পাই-তামনা, কেমন করিয়া এ পাপ-কাহিনী তাহার নিকট বিবৃত করিব? প্রভা সাধ্বী, সে আমায় পূর্ব্বমত ভক্তি করিলেও করিতে পারে; কিন্তু আমার পাশবিক কার্য্য শ্রবণ করিলে তাহার অন্তরে কষ্টের সীমা থাকিবে না। তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কাজ নাই। জীবনে আর তেমন সুখ ভোগ করিবার আশা নাই; এখন যতদিন সংসারে থাকিব, কেবল পাপের আগুণে গুমরে গুমরে পুড়িব। তবে কাজ কি?—আর সংসারে, পুত্র বনিতায় কাজ কি? সব ভুলিনা কেন? ঐ তরঙ্গিনীর স্বচ্ছবক্ষে মিশিয়া সব ভুলিনা কেন? মরিলে নরক আছে, সেই ভয়। কিন্তু মরিতেত

হইবেই, নরকভোগেরত পরিত্রাণ নাই। তবে দুদিন আগে যাইতে ভয় কি? যে কদিন পৃথিবীতে থাকিব, সেকদিন কি নরক অপেক্ষা কম যন্ত্রনা ভোগ করিব! এক্ষণেই আমার মরা মঙ্গল। আর প্রভার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। মাগো! মা স্নেহময়ী জননী আমার! আমায় নাও।

চারুচন্দ্র নদীগর্ভে ঝাপ দিলেন। পশ্চাৎ হইতে দ্রুতবেগে সিদ্ধি ও রামকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। প্রভা স্বামীকে দৃষ্টিমাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। উভয়ে প্রকৃতিস্থ হইলে সিদ্ধি বলিলেন, "প্রভা! এতদিন পরে স্বামীর সাক্ষাৎ পাইলে, বারেক সম্ভাষণও করিলে না।"

কাঁদিয়া প্রভা বলিল, "চারি বৎসরের অনন্ত সংবাদে হৃদয় পরিপূর্ণ, কি বলিব?"

চারুচন্দ্র বলিলেন, "বল দেখি প্রভা, নদীতে ঝাপ দিয়াছিলাম কেন?"

প্রভা। দাসীকে দুঃখ দিয়া তৃপ্ত হও নাই, আরও দিতে সাধ আছে।"

চারু। না প্রভা! শোন বলি, তোমাকে দেখিব বলিয়াই এতক্ষণ প্রাণ রাখিয়াছিলাম। কিন্তু তোমাকে এ ঘৃণিত মুখ দেখাইতে বড় ভয় হইল, তাই নদীগর্ভে লুকাইতে ছিলাম। কেন এঁরা আমায় বাধা দিলেন? প্রভা! আমি তোমার সে স্বামী নই। অতি ঘৃণিত হিংস্র পশুমাত্র।

প্রভা স্বামীর পদতলে পতিত হইল এবং অতি কাতরকণ্ঠে বলিল, "বহুদিন পরে এই মিলন সময়ে দাসীকে এইটী ভিক্ষাদাও, ওরূপে আর আত্মনিন্দা করিও না! এই চারিবৎসরে আমাদের

যাহার যাহা ঘটিয়াছিল, কেহ কাহাকেও বলিব না। আমরা যেমন ছিলাম তেমনিই রহিয়াছি। তেমনিই থাকিব।"

তখন রামকৃষ্ণ বলিল, "মা! এখন আর কাঁদাকাটী কেন! বড় ক্ষুধা পেয়েছে। এ বনে কি চা'ল ডা'ল আছে? না থাকে বল আমি বাজার করে আনি। তুমি মা তেমনি ক'রে পাক করবে। আমি আজ এক পাথর খাইব।"

সকলে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রভা রন্ধন করিতে গেল।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত



পরিশিষ্ট।

পরদিবস অতি প্রত্যূষে সিদ্ধি চারুচন্দ্র ও প্রভাকে বলিলেন, "আমার আর বিলম্ব করিবার অধিকার নাই। যাত্রাকালে তোমাদের দুটা কথা বলিয়া যাই। মানব জীবন লাভ করিয়া কেহই সমভাবে দিন কাটাইতে পারে না। ঈশ্বর জগতের সকলকেই পরিবর্ত্তনশীল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি পুণ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, পাপও সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ ঘটনাবশে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, আবার ঘটনাবশে পাপ সঞ্চয় করে। কিন্তু পাপী পুণ্যবান্ হইবে না, বা পাপের মুক্তি হইবেনা বিধাতার এরূপ ইচ্ছা নয়। তোমরা স্ব স্ব কর্ম্মবশে কিছুদিন দুঃখ পাইলে; এক্ষণে কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে; আবার তোমরা সুখলাভ করিতে পারিবে। অতীত বিষয়ের চিন্তা করিয়া আর বৃথা মনঃপীড়া ভোগ করিও না। কিছুদিন দুঃসপ্ন দেখিয়া তোমরা আবার জাগ্রত হইলে। এক্ষণে সংসারের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ধীরে ধীরে পরলোকের প্রতি অগ্রসর হইতে থাক। তোমরা একবার যে উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিলে, সময়ের তরঙ্গে তাহা ডুবাইয়া দিয়াছে; আবার নূতন করিয়া প্রস্তুত কর। আজ যেন তোমরা আবার নূতন দাম্পত্য বন্ধনে বদ্ধ হইলে। অধিক বলিবার অবকাশ নাই; ঘাটে নৌকা সজ্জিত আছে, অবিলম্বে স্বদেশে যাত্রা কর। যে কন্যাটী তোমাদিগকে দান করিয়া যাইতেছি, যদি সুবিধা বোধকর, তবে তোমাদের পুত্রের সঙ্গে যথা সময়ে তাহাকে পত্নীসম্বন্ধে মিলিত

করিও,—না হয় ভগিনী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিও। আমি বিদায় হইলাম।”

সাগরোদ্দিষ্টা গিরিতরঙ্গিনীবৎ সিদ্ধি দ্রুতপদে ছুটিলেন। পশ্চাতে প্রিয়জনের গগন-প্লাবী মর্ম্মান্তিক রোদনোচ্ছ্বাসে অথবা সদ্যোজাত সুকুমারী দুহিতার ক্ষুদ্রনেত্রের করুণদৃষ্টিতে সে পাষাণী পশ্চাতে দৃষ্টিমাত্রও করিলেন না।

সেইদিন হইতে ইহজগতের আর কেহ সিদ্ধির করুণা লাভ করিতে পাইল না!

সপ্তাহকাল প্রভাবতী শোকাশ্রুতে সিদ্ধির আশ্রমপ্রদেশ ধৌত করিয়া স্বামী পুত্র ও ভৃত্যসহ স্বদেশে যাত্রা করিল।



"লক্ষ্মীমেয়ে", "লক্ষ্মীবউ", "লক্ষ্মীমা" সম্বন্ধে মতামত।

তোমার প্রণীত, "লক্ষ্মীমেয়ে" "লক্ষ্মীবউ" ও "লক্ষ্মীমা" পড়িলাম। ভাল লাগিল বলিয়া নিতান্ত অসুস্থ শরীরেও আগ্রহপূর্ব্বক পড়িলাম। * * * এদেশে প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থে যে সকল উপাদান থাকা আবশ্যক, তোমার গ্রন্থে তাহার অনেকগুলি দেখিয়া বড় সুখী হইলাম। তোমার লেখা সরল ও হৃদয়গ্রাহী।

শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন।

* * * গ্রন্থগুলি জ্ঞানপ্রদ ও অতি সুন্দর সরল ভাষায় লিখিত। * * *—জষ্টিস্ শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমি বিধুবাবুর পুস্তক কয়খানি আদ্যোপান্ত পড়িলাম। আজকাল স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন দেখিয়া গ্রন্থকার স্ত্রীলোকের পাঠ-কৌতুক পূরণচ্ছলে প্রকৃত শিক্ষার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহা আমার অনুমান। ইদানীন্তন কৃতী বাঙ্গালা গ্রন্থ লেখকগণের পুস্তকগুলিতে যাহার অভাব আমি এতাবৎকাল দেখিয়া আসিতেছি, গ্রন্থকার বিধুবাবু বোধ হয় তাহার হৃদয়ঙ্গম করিয়াই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থত্রয়ের অবতারণা করিয়াছেন। ইহার তিন লক্ষ্মীর অন্যতমাও যদি কোন বঙ্গসংসারে উপস্থিত হন তবে অসার সংসার সসার হইবে। *** গ্রন্থকারের দীর্ঘজীবনসহ তাঁহার গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীনন্দগোপাল সরস্বতী,

হেড পণ্ডিত, টি, এন, জুবিলি কলেজ,—ভাগলপুর।

লক্ষ্মীমেয়ে, লক্ষ্মীবউ, লক্ষ্মীমা—তিনখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস। * * * হিন্দুর মেয়ে এখন বিলাতী ধরণের শিক্ষায় অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে; তাহাদের সুশিক্ষার্থই এই উপন্যাসত্রয়ের সৃষ্টি। বিধুবাবুর লিপিনৈপুণ্য প্রশংসনীয়। তাঁহার সরল গার্হস্থ্য উপন্যাস আড়ম্বর হীন, * * * কবি প্রতিভায় রসময়। এরূপ উপন্যাসের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। বঙ্গবাসী—১৭ই ভাদ্র ১৩০৬ সাল।

লক্ষ্মীমেয়ে—ইহাতে বঙ্গ সংসারের শিক্ষার অনেক কথা আছে। নায়িকার নাম ইন্দুমতী। ইন্দুমতী যথার্থই লক্ষ্মীমেয়ে। ইন্দুমতীর চরিত্র অনুকরণে অনেক দুষ্ট মেয়ে লক্ষ্মীমেয়ে হইতে পারে।

বসুমতী ২৮শে আশ্বিন ১৩০৫।

লক্ষ্মীবউ, লক্ষ্মীমা—* * * * এই প্রকারের পুস্তকের বহুল প্রচার আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি। মেয়েদের পড়িবার জন্য এ প্রকার সরল ও সুন্দর বহিরই দরকার। লেখকের লিপিকুশলতা আছে ও প্রাণে আগ্রহ আছে।

বসুমতী—২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৬ সাল।

লক্ষ্মীমেয়ে—ইহা একখানি ক্ষুদ্র অথচ অতি উৎকৃষ্ট গার্হস্থ্য গল্পপুস্তক। সচ্চরিত্রতা ও সাধুতা ঈশ্বর কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হয়, গ্রন্থকার তাহা অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

অমৃতবাজার—২১শে অক্টোবর ১৮৯৮ সাল।

লক্ষ্মীবউ—* * * মোটের উপর পুস্তকখানি আমরা সুপাঠ্য বলিয়া অনুমোদন করি।

লক্ষ্মীমা—* * গ্রন্থকার এরূপ চরিত্র এরূপ সরলভাবে চিত্রিত করিয়া গৌরবভাজন হইয়াছেন। অমৃতবাজার—১০ই জুলাই ১৮৯৮।

লক্ষ্মীমা, লক্ষ্মীবউ, লক্ষ্মীমেয়ে—তিনখানি স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক.

গ্রন্থের ভাষা সরল ও রুচিমার্জ্জিত। দেশ কালের অতীত কোন অস্বাভাবিক চিত্র অঙ্কণে গ্রন্থকার প্রয়াস পান নাই। * * * বিধুবাবু মহিলাদিগের উপকারার্থেই এই গ্রন্থত্রয় প্রণয়ণ করিয়াছেন, আমরা বলিতে পারি তাঁহার যত্ন সফল হইয়াছে। * * * গ্রন্থত্রয় স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

সঞ্জীবনী—২৯শে ভাদ্র ১৩০৬ সাল।

লক্ষ্মীমেয়ে—পুস্তকখানি কোন পারিবারিক গল্পে গঠিত। * * * গল্পের "প্লট" সরল হইলেও নায়িকার চরিত্রে পাঠকের মন প্রাণ মুগ্ধ হইবে। হিন্দু-বালিকার শিক্ষার জন্য এরূপ একখানি পুস্তক এক "ডজন" সাধারণ পাঠ্যপুস্তকের তুল্য।

ইণ্ডিয়ন্ মিরার—২১শে জুলাই ১৮৯৮ সাল।

লক্ষ্মীবউ, লক্ষ্মীমা—* * * * ইহাদের ভাষা সরল ও কৃত্রিমতার চিহ্ন মাত্র বিরহিত। ইহার "প্লট" সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কিন্তু পাঠকের মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়া হঠাৎই করুণার উদ্রেক করে। গ্রন্থকারকে সাহিত্য সমাজে অপরিচিত বলিয়া বোধ হয় কিন্তু তিনি এই আড়ম্বর শূন্য, হৃদয়গ্রাহী পুস্তকপ্রণয়ণ করিয়া সাহিত্য-সমাজে প্রবিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ অধিকারী—অন্ততঃ বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রকৃতনেতা বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ হইবেন। যদিও মুরুব্বির অভাবে তাঁহার পুস্তকগুলি বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হইতে না পারে, তাহারা নিশ্চয়ই বঙ্গপরিবারে আন্তরিক আদর পাইবে এবং রমণীদিগের বুদ্ধি বৃত্তি মার্জ্জিত ও চরিত্র দৃঢ় করিতে ইহারা অতি শক্তিশালী উপাদান হইবে সন্দেহ নাই।

ইন্‌ডিয়ন্ মিরার—২১শে জুলাই ১৮৯৯।

লক্ষীমেয়ে— * * গল্পটী বেশ সুপাঠ্য ও উপদেশপ্রদ।

বামাবোধিনী—১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ

লক্ষীমেয়ে—হিন্দু সংসারে হিন্দুরমনীর যে সকল জ্ঞাতব্য বিষ থাকিতে পারে, ইহাতে তৎসমুদায় গল্পচ্ছলে নিহিত আছে গ্রন্থের ভাষা সরল মিষ্ট ও নির্দ্দোষ। আমাদের গৃহিনীগণ নায়িকা ইন্দুমতীর অনুকরণ করিলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

লক্ষীমা— * * * দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদিগের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহার বর্ণনা পাঠ করিয়া আমরা অশ্রু সংবরণ করিতে পারলাম না, গ্রন্থকার যথার্থই একজন সহানুভুতি সম্পন্নলোক, তাঁহার চরিত্র-বর্ণন-শক্তি বিশেষ বলবতী, কিরূপ চরিত্র আদর্শ স্থান নয় তাহা তিনি সুন্দররূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষাটুকু বেশ সরল ও সুন্দর; * * * *।

বঙ্গভুমি ২৮শে চৈত্র ১৩০৬

প্রাপ্তি স্থান।—কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের লাইব্রেরী। ২০৩।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মনোমোহন লাইব্রেরী। ম্যানেজার দেবেন্দ্র লাইব্রেরী,—চিরুলিয়া, খুলনা এবং ১২৯ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে প্রকাশক শ্রীনলিনীন্দ্রনাথ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।